সূচিপত্র

অনীক

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১২
বর্ষ ৪৮ ❑সংখ্যা ৭-৮

❑যোগাযোগ, লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
❑দূরভাষ : ৯৪৩২৮৭৭৫৬০
❑গ্রাহকদের যোগাযোগ :
. ৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২
❑বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
❑ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
❑ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

❑*কার্যালয় :*
১১, রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা ৭০০ ০০৯
(মঙ্গলবার : সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা)

❑*সম্পাদকমণ্ডলী :*
দীপংকর চক্রবর্তী রতন খাসনবিশ
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

টুইডিলডি আর টুইডিলডাম

আমাদের দেশে বিশ্বায়নের দুই দশক পূর্ণ হলো। মনমোহন সিং তথা কংগ্রেস দলই যে ভারতে বিশ্বায়নের জনক, তা নিয়ে কারও বিতর্ক নেই। তই বলে অন্যরা বা অন্য দলগুলিও কিন্তু কেউ পিছিয়ে নেই, কে বিশ্বায়নের রথকে কতোটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলছেই। বিশ্বায়নের প্রথম পর্ব চলতে চলতেই কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন বিজেপি তাতে যোগ দিয়েছে। এবং বিভিন্ন রাজ্যে যে দলই ক্ষমতায় আসীন হোক না কেন, প্রত্যেকেই সে লড়াই চালিয়ে গেছে। ফলত মুষ্টিমেয় মানুষের বিত্ত ও বৈভব এবং ব্যাপক সাধারণ মানুষের শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনা বেড়েছে। তবুও কী বিস্ময়কর অধ্যবসায়, ক্ষমতার আসনে বসলেই সবাই নতুন উদ্যমে সেই প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বায়নের রথ উদ্বোধনের ও প্রাথমিক কাণ্ডারী হিসেবে যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণের কৃতিত্ব ও গৌরব কিন্তু প্রাপ্য বামফ্রন্ট সরকার তথা সিপিআই(এম)-এর। এবং মূলত সে কারণেই বিপুল মানুষের মনে সঞ্চারিত ঘৃণা ও ক্রোধের আগুনে তাদের দীর্ঘ ৩৪ বছরের সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে। কিন্তু এদেশে গণস্বার্থরক্ষাকারী শক্তির অনুপস্থিতিতে প্রতিনিয়তই তো চলে টুইডিলডি আর টুইডিলডামের লড়াই! তইই এতোদিন যে মমতাময়ী তৃণমূলীরা এ রাজ্যে সিপিআই(এম)-নিয়ন্ত্রিত সরকারের বিশ্বায়নের কর্মসূচির বিরোধিতা করে জনসমর্থন পেয়েছে, তারা যেমন ক্ষমতায় বসেই বিশ্বায়নের বিকল্প সারথির ভূমিকা পালন করতে এবং নিজেদের স্বৈরতন্ত্র কায়েম করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে; ঠিক তেমনি তাদের বিপরীতে বিশ্বায়নের এতোদিনের কাণ্ডারী ক্ষমতাচ্যুত সিপিআই(এম) স্বৈরতন্ত্রীরা এখন রাতারাতি জনগণের জন্য কুমির-কান্নার প্রহসন শুরু করেছে।

এরই এক চমৎকার প্রতীকী ব্যঞ্জনার প্রকাশ কয়েকদিন আগে ধরা পড়েছে ডুয়ার্সের চা-বাগানে অনাহারে মৃত শ্রমিকের প্রতি সমবেদনা জানাতে গিয়ে জনরোষের মুখোমুখি বিধানসভার দল-নেতা সূর্যকান্ত মিশ্রের হেনস্থার মধ্যে দিয়ে। তাদের জমানাতেও এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে এই রাজ্যে— ডুয়ার্সের চা-বাগানেই মারা গেছেন প্রায় দু'হাজার চা-শ্রমিক, তাছাছা মারা গেছেন জঙ্গলমহলের আমলাশোল প্রভৃতি এলাকাতেও। তখন বামফ্রন্ট সরকার তাদের আগেকার কংগ্রেসি শাসকদের অনুসরণ করে নির্লজ্জের মতো সেগুলিকে 'মিথ্যে প্রচার' বলে অভিহিত করেছে, এবং বিরোধী পক্ষে থেকে সেই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন তৃণমূল নেতারা। ঠিক একই ভাবে সেই প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিকতাতে আজকের শাসক তৃণমূল সরকার মাত্র আট মাসের শাসনেই অনাহারী কৃষকদের আত্মহত্যার ধারাবাহিক মিছিলকে বা মৃত্যুকে 'কুৎসা' বলে অভিহিত করছেন, এবং বিপরীতে সূর্যকান্তরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সমবেদনা জানিয়ে পরবর্তীকালে ভোটবাক্সকে ভরাট করার প্রচেষ্টা শুরু করেছেন। কিন্তু মানুষেরও আজ নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তববুদ্ধি হয়ে উঠছে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও গভীরতর। ডুয়ার্সের বঞ্চিত শ্রমিকেরা তাই সূর্যকান্তকে প্রশ্ন ছুঁড়ে মেরেছেন : এতদিন কোথায় ছিলেন! কেননা তাঁদের অনুসৃত বিশ্বায়ন কার্যক্রমের পরিণতিতেই সেখানে শুরু হয়েছিল মৃত্যুর এই মিছিল, তখন তাঁরাই তাকে আজকের শাসকদের মতো 'অপুষ্টিজনিত' বলে দাবি করেছিলেন, সেখানে একবার পা রাখারও প্রয়োজন অনুভব করেন নি। অবশ্য একইভাবে আমরি হাসপাতালে ৯২জন রোগীর মৃত্যুতে শোকাহত বামফ্রন্ট নেতাদের কেউ প্রশ্ন তোলেন নি, কিন্তু তুলতেই পারতেন— কেননা এই হাসপাতালের বেসরকারিকরণের ও মুনাফাবাজদের রাজত্বের সুযোগ করে দিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারই। কিংবা 'মাওবাদী' নেতা কিষেনজির হত্যা-পরবর্তীকালে সমালোচনামুখর সিপিআই(এম) নেতাদের প্রশ্ন করতে পারতেন তাঁর কমরেডরাও— কেননা বামফ্রন্ট আমলেও একইভাবে মৃত্যু ঘটেছে লালমোহন টুডু বা সিধু সোরেনদের। আশার কথা এটাই যে এই সব অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ মানুষ শাসক ও বিরোধী দলের এই পারস্পরিক স্থান-পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ক্রমশ আরো দ্রুত অনুভব করতে শিখে অবশ্যই যথাযোগ্য ভূমিকা নিতে তৎপর হয়ে উঠবেন।

বস্তুত কংগ্রেস বা সিপিআই (এম) বা তৃণমূল— কাউকেই আলাদাভাবে দোষ দেবার কোনো মানে হয় না, কেননা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সাথে বিশ্বায়নের মিলিত রসায়নেরই ফল এ সব। যতদিন না বিশ্বায়নের প্রকৃত বিরোধী এবং শোষিত মানুষের প্রকৃত স্বার্থরক্ষাকারী বিপ্লবী রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুদয় ঘটবে, ততোদিন এই খেলাই চলবে। ১২০ কোটি মানুষের এই দেশে মাত্র শ'খানেক মানুষ সমস্ত মানুষের মোট সম্পদের এক-চতুর্থাংশের মালিক হয়ে বসবে; ২৫ কোটি বিশ্বায়নের ফলভোগী সংস্কার-উত্তর ধনী ও মধ্যবিত্ত মানুষ বিনা সংকোচে আড়াই লক্ষ আত্মহত্যাকারী কৃষকের মৃত সত্তার স্মৃতি ভুলে গিয়ে দারিদ্র্যের করালবন্ধনে আবদ্ধ ৯০-৯৫ কোটি মানুষের সাথে সহাবস্থান করবে। এর দায়ভাগ বহন করে চলতে হবে সচেতন প্রতিটি গণতান্ত্রিক মানুষকেই।

এষণা ২১

সাংস্কৃতিক আত্মকর্ষণে আর্থ-সমাজ গবেষণায়

আমিত্ব সংগ্রামী ত্রৈমাসিক

প্রথম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ◆ প্রথম প্রকাশ ◆ মার্চ-এপ্রিল ২০১২

লেখক, পাঠক এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি —
নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর-সহ
প্রবন্ধ / গল্প / কবিতা / নাটক / অণুগল্প /গল্পচিত্র /
সঙ্গীত / চিঠি / সমালোচনা / পরামর্শ পাঠান

এষণা ২১ চায়

লেখা হোক শৈল্পিক, জীবনরস-সম্পৃক্ত,
সমকালীন জীবনসংকট-সম্পর্কিত, পিনপয়েন্টেড —
অর্থাৎ আবদ্ধতা থেকে মুক্তধারার সংস্কৃতি নির্মাণের সংকল্পঋদ্ধ

লেখা পাঠানোর ও সমস্ত যোগাযোগের ঠিকানা :

মহম্মদ ফিরোজ হোসেন
সম্পাদক, এষণা ২১
বর্ষাতিগোলা। ভগবানগোলা
মুর্শিদাবাদ জেলা - ৭৪২ ১৩৫

ফোন : ৯৯৩২৬১১৩২৯ / ৯০০২৪২৭৯৮৫ / ৯৯৩২৮৩৭১৮৫
ই-মেল : *eshona21@gmail.com*

গ্লোবালাইজেশন

সুবিমল চক্রবর্তী

নিপুণ দর্জি তুমি   যাদুফিতে হাতে
ইঞ্চি ইঞ্চি করে মেপে নিচ্ছো আমার আদল
মেপে নিচ্ছো করোটির লাল
রসনার স্নায়ু
আগোড়ালিনাভিমূল
মেপে নিচ্ছো ভাঁজ বাঁক স্ফীতি
তর্জনি কোন্ দিকে হেলে
লোমে-ঢাকা বুক বুকের পাঁজর
কোন্খানে ভালোবাসা থাকে   কোন্খানে ঘৃণার সলিতা
মেপে নিচ্ছো সেই হাত   যেই হাত জ্বালাবে আগুন
গজ-ফিতে হাতে মেপে যাচ্ছো মেরুদণ্ড কতোখানি খাড়া
পাঞ্জার জোর কতোখানি প্রসারিত হয়
মেপে নিচ্ছো মুষ্টির জোর   কতোটুকু জোর ধরে তাতে

আমি তো উলঙ্গ হবো

তারপর প'রে নেবো তোমার বানানো
বাহারি পোষাক।

❑ *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত 'অগ্রবীজ' পত্রিকার আগস্ট: ২০১১ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত*

আগুন খেলা

অচিন্ত্য সুরাল

এক

এককাট্টা হতে হবে ডাক দিয়েছে কেউ
করাত মাকু হাপর ঘুণি অবোধ মালসাকেও
দুশমনেরা রাঘব বোয়াল
তীক্ষ্ণ দাঁত শক্ত চোয়াল
ধূর্ত চোখে মুচকি হেসে লাগিয়ে দিল ফেউ
জমায়েতে ফিসফিসানি, খানিক পরে দোকাট্টা
উড়লো হাওয়ায় অট্টহাসি : ভোঁকাট্টা ভোঁকাট্টা ভোঁকাট্টা!

দুই

লাঙল কোদাল ফিরলো মাঠে
শিল আর নোড়া মশলা বাটে
একতারা আর খোলবাঁশিরা ভুলেই গেল হাসতে।
এমন হবে জানাই ছিল
জোটবাঁধা তো মানাই ছিল—
চালের থেকে মারলো উঁকি ফোকলা দাঁতের কাস্তে,
আগেই আমি বলেছিলাম —ঝন্ঝনালো খুন্তি,
তখন যদি ঢেঁকির কথা একটু তোরা শুনতি !
তোরা না সব বড্ডো বোকা
দুশমন তো দেবেই ধোঁকা
ভয়ের আগেই ভয় পেয়ে যাস মনটা বলে পালাই।
এককাট্টা হওয়াই চাই
সবাই আমার সঙ্গে আয়
দেখবি খেলা — আগুন রেগে বললো দিয়াশালাই।

কাঙাল

সব্যসাচী দেব

কাঙালের মতো পাত পেতে আছি, ভাঙা সানকির কিনারায়
এক কণা ভাত পড়েনি কখনো, কেবল ছুঁড়েছ অপমান
তাই চেটেপুটে দিন গুজরান, ফুটপাথে শোব সে উপায়
নেই সেখানেও ছাপ লাগে কোনো, আমার তো কোনো দাদা নেই

রাঙা সন্ধ্যায় নিয়নের আলো মায়াবী গরল ঢেলে যায়
আমার শরীরে জড়ানো তানির ছেঁড়া ফুটোফাটা খুঁজে নিয়ে
শীতের বাতাস নিষ্ঠুর স্নেহে আদরে আদরে ভরে দেয়
রাত্রি এমন রূপসী, ঠোঁটের বিভঙ্গে ছায়া চেটে নেয়

ছায়া নেই, নেই আমিও আসলে, তবুও ভোটের আগে ঠিক
আমাদের হাতে কারা গুঁজে দেয় দিনবদলের জলছবি
দুদিন না যেতে রং মুছে যায়, ডাস্টবিনে জমে জঞ্জাল
আমরা আবার যেরকম সেই, দিনের আলোয় শুনশান

কাঙালের পাতে কুয়াশা ঝরেছে, তাতে মেখে নিই দুরাশার
স্বপ্ন খানিক, সে স্বপ্নে কিছু কাঁকর মেশানো, তাই সই...

এই যে সময়— মার খাওয়া রক্তাক্ত···

বিশ্বজিত সেন

চাল দু'টাকা কেজি হবে
কল্পপুরে—
তদ্দিন কি বুড়ো আঙুল চুষতে হবে ?
অন্ধকারের নক্‌শাগুলো ছিঁড়ে খুঁড়ে
আলো আনার চেষ্টা থেকে
সরিয়ে রাখবো এই নিজেকে?
প্রশ্ন করি

কল্পপুরে সুধার বারি
ঝরছে শুধু ঝরছে
শিশুরা সব অ-রাজনীতির কতো শিক্ষা পাচ্ছে
মানুষজনে ভিড় জমিয়ে আমোদপ্রমোদ
করছে এবং করছে
তা দিয়ে কি যায় বা আসে
আমার তোমার
আমরা তো সেই অন্ধকারেই;
গোঁত্তামারা ক্ষিদের বক্র ক্রুর নখরে
বিদ্ধ হচ্ছি
প্রতিটি দিন যাচ্ছে যেমন
ফুরিয়ে যাচ্ছি
অকালে ও আকালে, যা
অন্তবিহীন!

ওহে স্বাধীন, ঝুটা স্বাধীন
এই যে সময়
মার খাওয়া রক্তাক্ত তোমার
জেগে ওঠার দাবি জানায়
তাকে শোনার চেষ্টা করো
কল্পপুরের চালের দামের
প্রসঙ্গ তো পরেও তোলা
যেতেই পারে!

আগুন

অশোক চট্টোপাধ্যায়

সে এক শূন্যতা রেখে চলে গেছে

এখন দারুণ শীতে
কাঁপতে থাকে জঙ্গলের মাটি

একটু আগুন বড়ো দরকার হে

মাঝেমধ্যে গুলির আওয়াজ
নিশাচর পাখিরা
ডানা ঝাঁপটায়

খসে পড়ে
দু'চারটি পাতা
নীরবে

কে যায়?   হুকুমদার?

রাত্রির হাড়ের ভেতরে ঢুকে যায় শীত
একটু আগুন বড়ো দরকার হে

শোকার্ত সময়
দু'চোখের জল মুছে   নীরবে

জড়তা মাটির বুকে
সুষুপ্ত আগুনের বীজ

বুনে যায় . . .

ঘটনা প্রবাহ

সরকার আছে সরকারেই

পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বয়স আট মাস। এই আট মাসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু কিছু জনমোহিনী পদক্ষেপ যেমন তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে, অপরদিকে কিছু কিছু ঘটনা ঘটেই চলেছে, যা থেকে গতানুগতিকতার ইঙ্গিত মেলে, পরিবর্তনের নয়। কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেসের জোটসঙ্গী হয়েও 'জমি অধিগ্রহণ বিল', 'খুচরা ব্যবসায়ে বিদেশি বিনিয়োগ' বিলের বিরোধিতা কিংবা রাজ্যে পেট্রল ও জ্বালানি গ্যাসের কর হ্রাস তৃণমূলের ভোটবাক্সে বাড়তি ভোট যেমন যোগ করেছে, তেমনই গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মৃত্যু-মিছিলের প্রতি উদাসীনতা, বন্দীমুক্তি প্রশ্নে অগণতান্ত্রিক মনোভাব, গণতান্ত্রিক অধিকার ও আন্দোলনের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং আমলাতন্ত্র-নির্ভর প্রশাসন ইতিমধ্যেই পরিবর্তনের স্বরূপ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তন এই প্রথম নয়। কুড়ি বছর কংগ্রেসি শাসনের পর, বাম ও কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলির জোট যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্থায়িত্ব বেশিদিন ছিল না। তবু এই রাজ্যের নির্বাচনী ইতিহাসে বামপন্থীরা সেবারই প্রথম ক্ষমতার আস্বাদ পেয়েছিল। আরও দশ বছর পর ক্ষমতায় এসে, সাড়ে তিন দশক ক্ষমতাসীন থেকে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, 'ইতিহাসের এটাই শেষ'। ইতিহাস কিন্তু তার চলমানতা বজায় রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে আরও একবার পরিবর্তন এসেছে। আগেকার পরিবর্তন এসেছিল "বিয়োগান্ত নাটকের রূপে", এটা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে দ্বিতীয়বারের পরিবর্তন "প্রহসন" হিসাবে এলো কিনা, তা ইতিহাসই বলবে।

চেহারা এবং চরিত্রে তফাত থাকলেও, দুই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ প্রেক্ষাপট ছিল— রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাস। সাতাত্তরের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য যেটা ছিল, সেটা হলো রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি প্রসঙ্গে ঘোষিত পৃথক এক ভাবাদর্শ ভিত্তিক কর্মসূচি। ভূমি সংস্কার, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পুনর্জাগরণ ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে বিরোধী রাজনৈতিক বাধা অতিক্রম করে নিজেদের শক্তিকে দ্রুত প্রতিষ্ঠা করতে সিপিএম নেতৃত্বাধীন সরকারের বিশেষ অসুবিধা হয় নি। তদানীন্তন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, কর্মচারী, মধ্যবিত্তদের মননে সমাজ-তান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ প্রভাব থাকার ফলে সরকারি প্রশাসনের ভিতরে বা বাহিরে, দায়িত্ব নেওয়ার মতো অনুগত মানুষ খুঁজে পেতেও সিপিএম-এর অসুবিধা হয় নি। বিশেষত, ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী সমাজে সিপিএম-এর সংগঠিত প্রভাব এ রাজ্যে বামফ্রন্টের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে বাড়তি সুবিধা দান করেছিল।

কিন্তু শাসক দলের সাজ সিপিএম-এর দেহে যত বেশি চেপে বসেছে, সিপিএম দল থেকে বামপন্থী মূল্যবোধ তত বেশি অপসৃত হয়েছে। বৃহৎ এবং বহুজাতিক পুঁজির বিরোধিতা ছেড়ে সিপিএম ক্রমশ তাদের অনুরাগী হয়েছে, নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির শরিক হয়েছে এবং পরিশেষে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের স্বখাত সলিলে নিমজ্জিত হয়েছে। অপরদিকে সিঙ্গুর আন্দোলনের পর্যায় থেকে মমতা সাবেক পোষাক ছেড়ে বামপন্থার পোষাকে নিজেকে আবৃত করার চেষ্টা চালিয়েছেন। সিপিএম উর্বর কৃষি জমি ছিনিয়ে নিয়েছে, মমতা অধিগ্রহণের বিরোধিতা করেছেন। সিপিএম *সেজ* চালু করেছে, মমতা *সেজ* বাতিলের দাবি করেছেন। সিপিএম প্রান্তিক মানুষদের উচ্ছেদ করেছে, মমতা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বাম আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে গেল অ-বাম ব্যক্তিত্বের হাতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এলেন দক্ষিণপন্থী বনে যাওয়া 'বামপন্থীদের' বিরোধিতা করে।

প্রশাসক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্যা হলো, সিপিএম-এর মতো সমাজের সর্বস্তরে তাঁর সংগঠন নেই। তাঁর ভরসা প্রশাসনিক আমলারা। তাঁর ক্যাবিনেট টিমও তৈরি হয়েছে প্রাক্তন আমলা, পুলিশ অফিসার, কর্পোরেট কর্তাব্যক্তিদের সমন্বয়ে। আর যাই হোক, এদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আশা করা অন্যায় হবে। এখনকার নব্য উদারনৈতিক অর্থনীতি ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শের প্রতি তারা অনুগত। বামফ্রন্ট বিরোধিতার থেকে বামপন্থা বিরোধিতায় শরিক হতে এদের উৎসাহ বেশি। তাই নিয়মতান্ত্রিকতা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা প্রতিষ্ঠার নামে সর্বত্র আমলাশাহী কায়েম হচ্ছে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমলাতন্ত্র প্রাধান্য পাচ্ছে। বিকেন্দ্রিকতার জায়গা নিচ্ছে কেন্দ্রিকতা। পঞ্চায়েতের কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রশাসনিক কমিটির হাতে। ভূমি সংস্কার করবেন জেলা শাসক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবদ্ধ কমিটিগুলিতে খবরদারি করবে সরকারি আধিকারিকরা। প্রশাসনের সাহায্যে সমালোচনার কণ্ঠরোধ করার প্রচেষ্টা চলছে। বিগত দিনের মতো প্রতিবাদহীন এক পশ্চিমবঙ্গ আবার যেন অবয়ব দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

আমরা ভাবি, ভালো ফলন হলে কৃষকের সুদিন। পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের হাসি কিন্তু মিলিয়ে গেছে। আলু চাষিরা আলু রাখার জায়গা পাচ্ছেন না, ধান চাষিরা ধান বিক্রি করতে পারছেন না। ধার-দেনা করে কৃষকেরা চাষ করেছিলেন। কিন্তু দাম না ওঠায় মহাজনি ঋণের ভার তাঁদের আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে। সংবাদপত্র সূত্রের খবর, আট মাসে কম করেও চব্বিশ জন কৃষক দেনার দায়ে আত্মহনন করেছেন। চালকলগুলির উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, সরকারি সংস্থাগুলির অপদার্থ, ফলত সহায়ক মূল্যে সরকারের ধান কেনার কর্মসূচি ব্যর্থ।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আত্মহত্যা নতুন কিছু নয়। ২০০০ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ১২০৬১ জন কৃষকের

আত্মহত্যা সরকারি স্তরে স্বীকৃত (সূত্র: জাতীয় অপরাধ তথ্য সংস্থা বা এনসিআরবি)। অর্থাৎ এই রাজ্যে বছরে গড় কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল ১০৯৬। সারা ভারতের নিরিখে নেহাৎ কম নয়। বিদর্ভে কৃষক আত্মহত্যা নিয়ে সোরগোল তুললেও, বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যের মৃত্যুগুলিকে অভাবী মৃত্যু বলে স্বীকার করে নি। বিরোধী তৃণমূল কৃষক মৃত্যু নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে তুলোধনা করলেও, ক্ষমতাসীন তৃণমূলের দৃষ্টিতে এগুলি নিছকই পারিবারিক গোলযোগ। যেখানে সরকারকে রাজনৈতিক দায় নিতে হয় না, সেখানে মৃত্যু ঘটলে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ ঘোষিত হচ্ছে আর কৃষকের আত্মহত্যা, বন্ধ চা-বাগানে অনাহারে মৃত্যু স্রেফ অস্বীকার করেই দায় এড়ানো চলছে। গরিবের জগতে পরিবর্তন কোথায়? নয়া সরকার বামফ্রন্টীয় পথেই চলছে।

'রেগা' (MGNREGA) কর্মসূচি রূপায়ণেও একই রকম অবহেলা। এই প্রকল্প রূপায়ণে বামফ্রন্ট সরকারের সুনাম ছিল না। গ্রামাঞ্চলে বামফ্রন্টের প্রভাব কমাতে এই প্রকল্প নয়া সরকারের ভালো হাতিয়ার হতে পারত। কিন্তু নয়া সরকার এই রিলিফ কর্মসূচি প্রয়োগে এতটাই অমনোযোগী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ চিঠি দিয়ে এই প্রকল্পে প্রদত্ত ৯০০ কোটি টাকা অব্যবহৃত থাকার কারণ জানতে চেয়েছেন। প্রকল্পটি বছরে মাথাপিছু ১০০ দিন কাজের। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সম্প্রতি জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন, বছরে মাথাপিছু ৫০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করতে। ১০০ দিনের টার্গেট করে সারা ভারতে গড় কাজ দেওয়া গেছে ৪৬ দিন (২০১০-১১)। বামফ্রন্ট বছরে গড়ে ৩১ দিনের বেশি কাজের ব্যবস্থা করতে পারে নি। ৫০ দিনের টার্গেটে মানুষ কী রিলিফ পাবে, তা সহজেই অনুমেয়।

একই প্রশ্ন তোলা যায় ভূমি-নীতির ক্ষেত্রে। রাজ্যের ভূমি-নীতি নির্ধারণের জন্য নতুন সরকার দুই সদস্যের (দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোমেন্দ্রনাথ বসু) একটি কমিটি গঠন করেছিল। কমিটিকে তড়িঘড়ি এক পক্ষকালের মধ্যে সুপারিশ পেশ করতে বলা হলো। ১৫ জুন ২০১১ কমিটি রিপোর্ট পেশ করল। তারপর সাত মাস কেটে গেল, আজ পর্যন্ত কেউ জানল না, কমিটি কী সুপারিশ করেছে। মাঝেমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা শোনা যায়, 'কৃষিজমি জোর করে অধিগ্রহণ করা হবে না', 'বেসরকারি কোম্পানির জন্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করবে না' ইত্যাদি। রাজারহাটে জমি অধিগ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছে, এটা যেমন ঠিক, তেমনই ভিন্নপথে বৃহৎ পুঁজিকে সস্তাদরে সরকারি জমি সমর্পণের প্রক্রিয়াও চলছে। বামফ্রন্ট সরকার প্রসূন মুখার্জিকে নয়াচরের জমি দিতে পারে নি নন্দীগ্রামের মানুষের বিরোধিতায়। এখন সেই একই ব্যক্তি নয়াচরে ১১৮০০ একর জমি পেয়ে গেলেন একর প্রতি মাত্র ২৫০০০ টাকা (৪১৬ টাকা কাঠা) দরে। কেমিকাল হাবের পরিবর্তে গড়ে উঠবে পর্যটন কেন্দ্র এবং তাপবিদ্যুৎ শিল্প। যে বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায় অতীতে নয়াচরে দূষণের অভিযোগ তুলেছিলেন, জানতে ইচ্ছা করে, তাঁরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে দূষণমুক্ত সার্টিফিকেট দিয়েছেন কী না। বারুইপুরের মতো জনবহুল স্থানে এই একই ব্যক্তিকে মাত্র ১৩ হাজার টাকা কাঠা দরে ১০০ একর জমি দেওয়া হচ্ছে টাউনশিপ গড়ে তোলা অর্থাৎ সাদা বাংলায় প্রোমোটারির জন্য। সম্প্রতি শালবনিতে জিন্দালকে এবং হাওড়া জেলায় প্যাটন কোম্পানিকে বেআইনিভাবে ক্রীত অতিরিক্ত জমিতে সিলিং ছাড় দেওয়া হয়েছে। আরও অনেক কোম্পানি, যারা এইভাবে প্রচুর জমি দখলে রেখেছে, তাদেরকেও ছাড় দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। এই কোম্পানিগুলি বামফ্রন্ট আমলে তাদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় বিপুল জমি বিভিন্ন কৌশলে দখল করেছিল। নির্বাচনের দু-তিন মাস আগে, বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় বাজারমূল্যের মাত্র দুই শতাংশ দরে এইসব নিয়ম-বহির্ভূত দখলদারিকে বৈধতা দানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাম আমলে গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যকর করা হচ্ছে পরিবর্তনের পর। পুঁজিপতিদের নিশ্চিন্ত করে 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে'।

পরিবর্তন বলতে শাসনের নয়া ছক। কিন্তু পুঁজির তোষণ আর কৃষক শোষণের ছক কিছু পাল্টালো কি?

পরিচয় কানুনগো

বিশ্ব-পুঁজিবাদ কি গভীরতর সংকটের মুখোমুখি?

বিশ্ব-পুঁজিবাদ কি গভীরতর সংকটের মুখোমুখি? অন্তত বিশ্বব্যাংকের ভবিষ্যৎবাণী কিন্তু সেরকমই। তাদের গত ১৮ জানুয়ারি'১২-র গ্লোবাল ইকনমিক ফোরকাস্ট রিপোর্টেই রয়েছে সেই সতর্কবাণী। রাষ্ট্রসংঘের প্রাসঙ্গিক একটি রিপোর্ট এবং আইএমএফ-এর ২৫ জানুয়ারির রিপোর্টেও প্রতিফলিত হয়েছে একই সতর্কবাণী।

বিশ্বব্যাংকের ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে : ২০১১-তে ইউরো অঞ্চলের আর্থিক সংকটের সূচনা থেকেই এই সংকট ঘনীভূত হতে শুরু করেছে। ফলত ঋণসংকট বৃদ্ধির আশংকা সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলির বাজারেও জুলাইয়ের পর থেকে ৮.৫ শতাংশ মূল্য কমে গেছে। তার সঙ্গে উচ্চ-আয়বিশিষ্ট স্টক-এক্সচেঞ্জের ৪.২ শতাংশ মূল্য যোগ করলে সব মিলিয়ে সমগ্র বিশ্বের আয়ের (GDP) সমান সম্পদ হ্রাস পেয়েছে। রিপোর্টে তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে গত বছরের পর পর দু'টি অর্ধে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিনিয়োগকারীদের পুঁজি রপ্তানি কমিয়ে দেবার উপর। ২০১০-এর দ্বিতীয়ার্ধে এর পরিমাণ ছিল ৩০৯ বিলিয়ন ডলার— ২০১১-র দ্বিতীয়ার্ধে এর পরিমাণ ৫৫ শতাংশ কমে হয়েছে ১৭০ বিলিয়ন ডলার।

ইউরোপের আর্থিক সংকট এখন অন্যান্য উন্নত দেশে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ছে, এবং তার ফলে, বিশ্বব্যাংকের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে, ''বিশ্ব-অর্থনীতি এখন এক বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।''

এই রিপোর্টে ২০১২ ও ২০১৩-তে বিশ্ব-অর্থনীতির সম্ভাব্য

এর পর ২১ পৃষ্ঠায়

ঘটনাপ্রবাহ

সিঙ্গুর — ফিরে দেখা

গার্গী সেনগুপ্ত

'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'— এই শ্লোগান নিয়ে একদিন যারা উন্নয়নের ধ্বজা তুলেছিল সেই বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম উর্বর চার-পাঁচ-ফসলি কৃষি জমিকে শিল্পপতি রতন টাটার হাতে তুলে দিতে সিঙ্গুরের মাটিতে বৎসরকাল-ব্যাপী এক লড়াই-এর ময়দান তৈরি করেছিল। জমি ছাড়তে নাছোড় সিঙ্গুরের কৃষক এবং মেয়েরা গোপালনগরের মাটিতে জমি পরিদর্শনকারী টাটার প্রতিনিধিদের গাড়ি আটকে প্রথম লড়াই এর ঝান্ডা পুঁতে ছিল। এটা ২০০৬-এর গোড়ার কথা। সেদিন এটা ছিল সূচনা। সিঙ্গুরের মানুষদের জোরালো প্রতিবাদে প্রথম সারিতে ছিল না ডান-বাম-প্রথম-দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারির কোন রাজনৈতিক নেতৃত্ব। এটা ছিল জমির সাথে নাড়ির টানে যুক্ত সিঙ্গুরের কৃষক ও তাদের পরিবারবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ। প্রতিবাদ একটু একটু করে সংগঠিত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে নানা রাজনৈতিক শক্তি আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ তৃণমূল কংগ্রেস লড়াইটা ক্যাশ করে ভোট-বাক্সে তার ফসল তুলেছে। তার রাজনৈতিক রসায়নটাও হিসেবে রাখতে হবে। একদিকে বৃহত্তম শক্তি হিসেবে তাদের উপস্থিতি অন্যদিকে বামপন্থী শক্তিগুলোর দুর্বলতা, পারস্পরিক অনাস্থা, ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে দাঁড়াবার অসমর্থতা— তৃণমূলকে জায়গা করে দিয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় সে সিঙ্গুরের লড়াইটা তৃণমূল একাই লড়েছে। আজ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী একলা চলো-র রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে ঘোষণা করছেন— 'সিঙ্গুর একা করেছি নন্দীগ্রাম একা করেছি— একাই চলতে পারব' —এই দাবি কতটা নৈতিক তা একবার ওনার ভেবে দেখা উচিত। অবশ্য মিথ্যে প্রচারের পাশাপাশি সত্য ইতিহাসটা থাকবেই। সেই সত্যটা বারবারই মানুষের সামনে তুলে ধরা উচিত। না হলে মিথ্যেটার সত্যে প্রতিষ্ঠা পাবার সম্ভাবনা থেকে যাবে। তিনি কংগ্রেসকে সাথে নিয়ে লড়েননি ঠিক কথা— ঐ লড়াই-এ কংগ্রেসের কোন জায়গাই ছিল না। কিন্তু বাকি শক্তিগুলোর ভূমিকা? তাকে তিনি কী করে অস্বীকার করতে পারেন?

তবে তৃণমূল কংগ্রেস অন্যান্য সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে চলেনি, বরং বলা চলে বাকি সংগঠনগুলো আন্দোলনের প্রতি দায়বদ্ধতায় সকলের সহমতের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটিতে ছিল— যা কখনই তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানারের তলায় ছিল না। তবে এই দক্ষিণপন্থী দলটি এতটাই কর্তৃত্ববাদী যে তারা সবসময় চেষ্টা করে গেছে নিজেদের মতো করে আন্দোলনের রাশ হাতে রাখতে— তাই অন্যদের জায়গা ছেড়ে দিতে বা তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে তাদের সংকীর্ণতা ছিল। আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকা সব দলকেই এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

২০০৬ সালে ঘটে যাওয়া সিঙ্গুর আন্দোলনের অংশ নেওয়া মানুষেরা আজ কেমন আছেন একথা তুলে ধরতে গেলে এই আন্দোলনের বিশ্লেষণও অবধারিত ভাবে এসে পড়ে। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সিঙ্গুরের মানুষের জীবনে কতটা পরিবর্তন এনেছে? কিছুই কি পরিবর্তিত হয়নি? পরিবর্তনের সরকার জীবনটা আবার আগের মতই স্বচ্ছন্দ করে দেবে ভেবে কত শতাংশ মানুষ আশার সলতে পাকাচ্ছেন? আর কত শতাংশই বা নিজেদের হা-ঘরে অবস্থা আর চেনা মুখগুলোর পরিবর্তন দেখে হতাশায় ক্ষোভে দিনাতিপাত করছেন? আজকের সিঙ্গুরকে জানতেই আবারও বিভিন্ন মৌজার মানুষদের মুখোমুখি হয়েছি। জেনেছি তাদের প্রত্যাশা আর হতাশার কথা। যাদের সাথে কথা বলেছি তাদের অধিকাংশই আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। চেনা নামে পাঠকদের সাথে তাদের পরিচয় করানো যাবে না। কারণটা সহজেই অনুমেয়। দেখি তারা কী বলছে।

রমলা বাগ : আন্দোলনে যখন ছিলাম তখন জমি ফেরত মূল দাবি ছিল। এখনও জমি ফেরত চাই। সরকারের কাছে আশা আছে জমি ফেরত পাব। এ আশাতে বুক বেঁধে আছি। যে সচ্ছলতা ছিল এখন তা নেই। জমি চলে যেতে আমার স্বামী ঘরের কিছু সোনাদানা বেচে দোকান করে চালাচ্ছে। এত জিনিসের দাম বেড়েছে যে গ্রামের লোকের পক্ষে বেঁচে থাকাটাই সমস্যা, আশেপাশের সবার অবস্থা কম-বেশি খারাপ। তাতে মন খারাপ হচ্ছে। দিদি না দেখলে আত্মহত্যা করতে হবে। আমরা তো অন্য দল করি না। ওঁকেই ধরে আছি। পরিস্থিতি যা তাতে ধৈর্য্য থাকছে না। দিদি আস্‌লে দেখতে পেতেন কত মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। এখন ভাবনা নতুন আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। কেউ কেউ ভাবছেনও। তবে ওই রাস্তায় আর যাবো না।

নমিতা বাগ : আন্দোলনে ছিলাম আছি থাকব। শেষ দেখে ছাড়বো। জমি-ই ফেরত চাই। এর জন্য এত লড়াই করেছি। যে কারণেই হোক চাষিদের পাশে ছিলেন মমতা। এখন আপ্রাণ চেষ্টা করবেন কারণ এখান থেকেই পরিবর্তন এনেছেন। দৃঢ় বিশ্বাস জমি ফেরত করাবেনই। আমাদের দাবিই আছে চাষযোগ্য জমি ফেরত দিতে হবে— প্রয়োজনে সমতুল জমি অন্যত্র হলেও চাই। মমতা ব্যানার্জী নিজের তাগিদেই ফেরত দেবেন। সময় বলে

দেবে আবার আন্দোলন করতে হবে কী না। তবে আমার এখনই তেমন মনে হচ্ছে না। পরিস্থিতি অনুযায়ী, দাবি অনুযায়ী ঠিক করব আন্দোলনে থাকব কী না।

অসীমা দাস : আমার স্বামী জমিতে কিষেন খাটত। আমাদের জমি ফেরত পেলে বেচে দেব। আমার স্বামী এখন বাজারে আনাজ নিয়ে বসে। সব দিন বিক্রি হয় না। এখন অবস্থা দিন আনি দিন খাই। যে দিন কোন ব্যবস্থা করতে পারি না আমাদের হাঁড়ি চড়ে না। এখানকার নেতারা কেউই দেখতে আসছে না যে আমাদের কীভাবে চলছে। ওদের কাছে সমস্যার কথা বললে বলে, কী করব। করার কিছুই নেই এখন। আমি প্লাস্টিকের মালা করি, বারোটা করলে আড়াই টাকা পাই। ছ ডজন করে কাজ পাই। যদি জমির জন্য আবার আন্দোলন হয় তবে সবাই গেলে আমিও যাব।

রমলা দাস : দেড় বিঘে জমি আছে। সবটাই টাটার পাঁচিলের ভিতরে। যা খেটেছি সব জমি কিনতে গেছে। মেয়ের বিয়ে চেয়েচিন্তে দিয়েছি। আমরা চাকরি চাইনা। জমি ফেরত চাই। আর টাকাও নেব না। যে সরকার গদিতে বসেছে তারা তো সিঙ্গুরের অবস্থা জানে। এখানকার নেতাদের বলেও কোন লাভ হচ্ছে না। নেতাদের পেট ভরছে, আমরা মরছি। এখন আর সরকারের উপর ভরসা করতে পারছি না। বলেছিল সরকার উল্টে গেছে এবার তোমরা জমি পাবে, চাষ করতে পারবে। কোথায় গেল সে সব? সিঙ্গুরের লোকের কীভাবে চলছে— এ নিয়ে তাদের চিন্তা নেই। কী করে ভরসা থাকবে। আমরা মধ্যবিত্ত। সম্মানের ভয়ে মাটি কাটার কাজে যেতে পারছি না। জমি ফেরত না পেলে আমরা আবার আন্দোলনে নামব। আমরা ক্ষমতায় বসাতে পারি। নামাতেও পারি। দরকার হলে রাজভবনে যাব, নেতাদের কেয়ার করব না।

অর্চনা মৈত্র : যতদিন যাচ্ছে তত টেনশন বাড়ছে। নিজেরা ভুল করেছিলাম না ঠিক করেছিলাম বুঝতে পারছি না। একবার মাস দুই-তিন আগে মাঠে নামিয়েছিল। জমি দেবে বলে মাপজোক করল। বিডিও-তে একবার নিয়ে গেলো। কিছুই হচ্ছে না। আমাদের প্লট-এর মধ্যে জমি দিতে হবে। আমরা কি জয়মোল্লা না খাসেরভেড়িতে যাব? আমরা আশা-ভরসা পাচ্ছি না। কিছু কিছু লোক টাকা পেয়েছে, লোন-এর মত। তবে গুপ্তভাবে হয়েছে। আমরা শুধু খেটে মরলাম। মমতা ধৈর্য্য ধরতে বলছেন, আর কত ধৈর্য্য ধরব? একটা বিপিএল কার্ড নেই। নেতাদের বললেও শুনছে না। পঞ্চায়েত সদস্যরাও কিছু বলছে না। আমাদের ছেলেদের ভবিষ্যৎ কী? দুই ছেলে বেকার। আমরা জমি ফেরত পেলে ভাল, না হলে টাকাই নিতে হবে। এখন আর মিটিং মিছিলে যেতে ইচ্ছে করে না। মানুষের মনে ঘেন্না ধরে গেছে। মমতা তো এদিকে আর পাত্তাই দিচ্ছে না। ওদের খোঁজ নেওয়া তো উচিত গ্রামের মানুষগুলো কীভাবে বেঁচে আছে। কোন কাজের সংস্থানও তো করে দিচ্ছে না। মানুষগুলো কীভাবে খাবে এটাও তো ভাবা উচিত। মানুষকে থাকতে দেওয়া, যত্ন করা, কত কী করেছি। এখন তো কেউ চিনতে পারছে না। দু ঝুড়ি ইট, মাটি ফেলে ওরা দেশের উন্নতি করছে! আমাদের কাদা-মাটির রাস্তাই ভাল ছিল। চাষের সময় এখানে বারো মাসই কাজ হত। খেতমজুররা কাজ পেত। এখন তো কাজই নেই। তবে কিছুটা ভাগে চাষ করি। বছরে জমির মালিককে চার হাজার টাকা দিতে হয়। না খেয়ে কি ধৈর্য্য ধরা যায়। গোপালনগরের পূর্ব দিকে গ্রামের লোকজন রাস্তায় জন্য লাল মাটি ফেলতে দেয়নি, কারণ পিচরাস্তা হওয়ার কথা ছিল। আমরাও না দিলে ভাল করতাম। যদি প্রয়োজন হয় আবার লড়াই করতে হবে। হাল তো ছেড়ে দিতে পারি না।

রতন সাঁতরা : যা জমি সব টাটাতে পড়েছে। দিদি বললে ফেরত হবে। কোথায় হচ্ছে? খেতে পরতে পাচ্ছি না। ঘর ভেঙ্গে পড়ছে। এখনও কোন সুরাহা পাচ্ছি না। কেউ ভরসা দিতে পারছে না। মূর্তি উদ্বোধনে কলকাতা থেকে লোক এসে অনুষ্ঠান করে চলে যাচ্ছে। এটা না করে ক্ষতিপূরণের টাকা দিত, লোক খেয়ে বাঁচত। তবে সত্যের জয় আছেই।

প্রশান্ত বাগ : বলেছিল বিধানসভা মিটে গেলে জমি পাবো। কোথায়। স্থানীয় নেতারাও তো চুপ হয়ে আছে।

অমল পাত্র : যার জমি গেছে আর যারা কাজ হারিয়েছে তাদের সকলের একই অবস্থা। আমরা তো একশো দিনের কাজের সঠিক মজুরিও পাইনা। ১৩০-এর জায়গায় ১১০ করে দেয়। আগে নিজেদের এলাকাতেই আমরা কাজ করতাম, মেয়েরা কাজ করত। এখন ভোর চারটেয় উঠে সব ফেলে ছুটছি। তাও কাজের নিশ্চয়তা নেই। ১৮ তারিখের মূর্তি উদ্বোধনের সভায় আমরা যাইনি। আমরা সবাই শাসক দলের সমর্থক হলেও তিতিবিরক্ত। বলেছিল জানুয়ারি থেকে ১৭৫ টাকা রোজ হবে, কিন্তু সেই ১৩০ ধরে রেখেছে। রাস্তার কাজ হলো, ১৯২ টাকা রোজ দেবে বলে কাজ করালো, কিন্তু পাঁচ-ছয় দিনের টাকা দিয়েছে। আমরা ভাবলাম, একে পাল্টে ওকে আনলে ঠিক হবে। কিন্তু কী হল? নেতারা গুছিয়ে নিচ্ছে, আমরা না খেয়ে মরছি। নেতাদের পরিবর্তন হচ্ছে। আমাদের পেটে লাথি মারছে। গ্রামসভার মিটিং-এ দু-একটা লোক ছাড়া ডাকে না। কিন্তু আমাদের সবার যাওয়ার অধিকার আছে। নেতারা মিটিং করে নিজেদের গুছিয়ে নিচ্ছে। এভাবে সিপিএম ডুবেছে। এখানে এবার পঞ্চায়েত উল্টে যাবে।

রবি পাত্র : আন্দোলন কি বৃথাই করলাম। কার কাছে অভিযোগ জানাবো? এখন জোট বাঁধবে কারা? অন্য কোন দলকে এলাকায় আসতে দেবে না বলছে। অন্য পার্টি করলে দোষ কী? এখন তো কোন প্রতিবাদ করলে মাওবাদী বলবে। ভরে দেবে জেলে।

শ্যামল মালিক : এখন রাজনীতিটাই এমন যে, যে যেরকম পার্টি করবে তার সেই মত কাজ হয়। এখানে অঞ্চলপ্রধান নিজের মত করে দলের লোককে দেখছেন। যার ১০ বিঘে জমি আছে সে বিপিএল তালিকাভুক্ত হচ্ছে অথচ যার শুধু ভিটেটুকু পড়ে আছে তার বিপিএল হয়নি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা কোন ভাল মুখ্যমন্ত্রী পেলাম না। জ্যোতি বসু তার ছেলেকে রাজা করে গেছেন, মমতা আমরি-তে প্যাকেজ ঘোষণা করছেন, মদ খেয়ে মরলে টাকা দিচ্ছেন, ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ক্লাবকে টাকা দিচ্ছেন, তিনি এখানে গ্রামের হাসপাতালের কাজে তা লাগাতে পারতেন। উনি ভুল পথে চলছেন।

সিঙ্গুরের মানুষেরা যেভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাতে কতগুলো বিষয় স্পষ্টভাবে উঠে আসছে। প্রথমত : যে কৃষকের জমি টাটার পাঁচিলের মধ্যে আটকে পড়েছে এবং যে খেতমজুর কাজ হারিয়েছে তাদের সকলের সংকটই প্রায় একই রকম। দ্বিতীয়ত : অল্প কজন-কে বাদ দিলে প্রায় বেশির ভাগই বর্তমান সরকারের উপর ভরসা রাখতে পারছেন না। তৃতীয়ত : এটা বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে তারা কেউই স্থানীয় প্রশাসন তথা নেতৃত্বের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না (এটা উল্লেখযোগ্য যে সিঙ্গুরের সব গ্রামপঞ্চায়েতেই তৃণমূলের অধীনে)। চতুর্থত : ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছে যাওয়া নেতৃত্বের ব্যক্তিগত জীবনে পরিবর্তন তাদের বিগত শাসক দলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। পঞ্চমত : নির্বাচনের আগে সবচেয়ে বেশি গণতন্ত্রের ধুয়ো তোলা দলটির অ-গণতান্ত্রিক আচরণ, (গ্রামসভার মিটিংএ সকলকে না ডাকা, অন্য দলের উপস্থিতি সহ্য না করা)। এ প্রসঙ্গে বাজেমেলিয়ার একটি গ্রামের উল্লেখ করতে হয়, যে গ্রামটি একদা সিপিএম প্রভাবিত ছিল (আজও অনেকেই সিপিএম-ই আছেন), সেখানে প্রায় ১৫০০ ভোটার-এর মধ্যে হাতে গোনা কজন বিপিএল তালিকাভুক্ত, কয়েক ঘর ছাড়া কেউই ইন্দিরা আবাস যোজনায় ঘরের জন্য বরাদ্দ টাকা পাননি। এটা 'বদল' এর পরিবর্তে 'বদলা' হয়ে যাচ্ছে না তো! ষষ্ঠত : বছরে একশো দিনের কাজের প্রকল্প সেই একই ভাবে প্রহসন-ই রয়ে গেছে। সপ্তমত : গরীবের কথা কোন শাসক দলই ভাবে না— এই সত্যটা সিঙ্গুরের মাটিতে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে।

সিঙ্গুর আন্দোলন থমকে যাওয়ার পরবর্তী সময়ে যে নেতিবাচক দিকটি প্রায় চোখের আড়ালে ঘটে যেতে থাকে সেটি উল্লেখ করতেই হয়। আন্দোলনের প্রত্যাশিত ফল না মেলায় ওরা ধীরে ধীরে নিজেদের মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে শুরু করে দিলেন। যতক্ষণ পেরেছেন ঘরের জিনিস, গয়না বেচে, জমানো টাকা খরচ করে জীবনধারণ করেছেন। অভাবে যখন পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেল তখন পুরুষরা টাটার ঘেরার মধ্যে ঢুকে টিনের শেড, লোহা, ইট চুরি করাও শুরু করেন। সিকিউরিটির চোখ এড়িয়ে তা চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মহিলারাও এ কাজে সামিল হয়, তবে অন্য পথে। নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে নিজেদের মান ইজ্জত বিকিয়ে দেবার বিনিময়ে তারা পাঁচিলের ঘেরা অংশে প্রবেশের ছাড়পত্র আদায় করে। এভাবেই চলতে থাকে নারী-পুরুষের যৌথ চৌর্য্যবৃত্তি। বছর দুই আগে এবিষয়ে জানতে যখন গ্রামে যাই কেউ কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, আমাদের সুন্দর শান্ত জীবনটা ছারখার হয়ে গেল। সময় মানুষকে লোভের সাথেও অভ্যস্ত করে তোলে। তাই টাটার পাঁচিল ভেঙ্গে ইট চুরি করাটা আজ ওদের কাছে ন্যায্যতা পেয়ে গেছে। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দায় আজকের প্রশাসন-নেতৃত্ব এড়াতে পারেন না। তেভাগার ইতিহাস দেখিয়েছে আন্দোলনরত কৃষকরা যখন জমিদারের গোলা লুঠ করেছে— তখন তা গ্রামের মানুষের যৌথ সম্পত্তি হয়েছে। সেখানে ব্যক্তিগত অসততার কোন জায়গা ছিল না। মুক্তকেশী মাঝি, চণ্ডীবালা পাখিরা, পুষ্পবালা মাঝিদের উত্তরসূরীদেরও এই পরিণতি শুধু সিঙ্গুরের মানুষদের নয়, সমগ্র পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে লজ্জার, যন্ত্রণারও। আন্দোলনের বৃহত্তম শক্তি হিসেবে আজ তৃণমূল ক্ষমতার শীর্ষে। অথচ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লড়াকু মানুষদের মূল্যবোধ নিয়ে সুষ্ঠু জীবনধারণের দিশা দেখাতে পারছে না।

সিঙ্গুর আন্দোলন যখন জমি-না-দেওয়ার দাবি থেকে চারশ একর ফেরত দেওয়ার দাবিতে অবস্থান নিতে বাধ্য হল সে সময় ঐ আন্দোলনের অন্যতম শক্তি একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জমির জন্য প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে অন্তর্বর্তীকালীন তিনহাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছিল। সেই দাবিতে বর্তমান শাসকদলের অন্যতম নেতৃত্ব স্বাক্ষর করে ছিলেন। আজ যদি শাসকদল জমি সমস্যা না মেটা পর্যন্ত সেই ভাতা-র ব্যবস্থা করতেন তবে সিঙ্গুরের মানুষ তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না। তাপসী মালিকের মূর্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে সেখানকার মানুষদের উপস্থিতি প্রায় নগণ্য ছিল, কারণ মূর্তি স্থাপনের এটা উপযুক্ত সময় ছিল না। ওঁদের জীবনযাপনে কিছুটা স্বস্তি থাকলে ওঁরা এতটা বিরূপতা প্রকাশ করতেন না। নেতাদের ঘরবাড়ির ঝকঝকে রঙ আর ব্যক্তিগত জীবনযাপনের জৌলুস দিয়ে তো ওদের সীমাহীন দারিদ্র্য আর লজ্জাকে আড়াল করা যাচ্ছে না কিছুতেই। তাই ওরা আশাহত, তাই ওরা ক্ষুব্ধ। হতাশা আর ক্ষোভ আবারও বিদ্রোহের আগুন হয়ে জ্বলে উঠবে কি না, তা সময়ই বলে দেবে।

প্রবন্ধ

কানোরিয়া জুট শ্রমিক আন্দোলন : সমস্যা ও সম্ভাবনা

কুশল দেবনাথ

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেস জোট ক্ষমতার আসার পর বন্ধ কারখানা খোলার ক্ষেত্রে কানোরিয়া জুটমিলের বিষয়টি বেশ প্রচারে এনেছে। বিশেষ করে গত বিধানসভা নির্বাচনে যেখানে পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার বন্ধ বা রুগ্ন কারখানার বিষয়টি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ইস্যু ছিল সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস কানোরিয়া জুটমিল খোলার বিষয়টি তাদের কাজের সাফল্যের মুকুটে পালক হিসাবে বারবার বলেছে। যদিও এই পর্যায়ে বেশ কয়েকটি কারখানা বন্ধ হয়েছে। ডানলপের মতো কারখানার মালিক রাজ্য সরকারের তথাকথিত হুমকি অগ্রাহ্য করে কারখানা বন্ধ করে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করে চলেছে। বন্ধ চা-বাগানের ৯ জন শ্রমিক অনাহারে মারা গেছে। তবু কানোরিয়া জুট মিলের মতো গুরুত্বপূর্ণ মিলে সরকারি পদক্ষেপ যদি ইতিবাচক হয় তবে তাকে 'সাফল্য' হিসাবে চিহ্নিত করতে দোষ কোথায়? দু'পাঁচটা নেতিবাচক অভিজ্ঞতার পাশে একটা দুটো কাজ যদি বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয় তবে তাকে ইতিবাচক কাজ বলতে অসুবিধা কোথায়? বিশেষ করে কানোরিয়া জুটমিলের মতো বিষয়— যা এরাজ্যে শ্রমিক আন্দোলনে দেড় দশক ধরে উপস্থিত আছে— যে মিলে ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে বার সাতেক লকআউট ঘোষণা করা হয়েছে— ২০০৬ সাল থেকে ২০১১ সাল অবধি টানা বন্ধ থেকেছে। সেই মিল সরকারে আসার তিনমাসের মধ্যেই যদি খুলে যায় সেটা ঠিক কাজ হয়েছে বলতে অসুবিধা কোথায়? যদি ভাসা ভাসা ভাবে বিষয়টা দেখি তবে এরকম একটা সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসবে। কিন্তু কানোরিয়া জুটমিলের শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে যদি বিষয়টা দেখি তাহলে অন্য সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসবে। কী সেই সিদ্ধান্ত? সিদ্ধান্ত জানার আগে বিগত ১৮ বছরের ঘটনাচক্র একবার বোঝার চেষ্টা করি।

কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলন : ফিরে দেখা

গত শতকের আটের দশক থেকে বিভিন্ন কারখানা বা মিলে প্রতিক্রিয়াশীল ও সংস্কারবাদী আপসকামী নেতৃত্বকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শ্রমিকরা স্বাধীনভাবে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। হিন্দুস্থান লিভার, গার্ডেনরীচ শিপ বিল্ডার্স, কানোরিয়া জুট মিল, মাঠকল এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের আমলাতান্ত্রিক কাজের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম এই প্রক্রিয়া জোরদার করে। সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও এরাজ্যের শ্রমিক আন্দোলনে ইতিবাচক ধারা প্রধানত এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হচ্ছিল। সাতের দশকে সিপিআই(এমএল)-এর অতি-বাম রাজনীতির নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কমিউনিস্ট বিপ্লবী শক্তিগুলি এই সমস্ত আন্দোলনগুলির নেতৃত্বদায়ী জায়গায় ছিল। এই ধারাবাহিকতাতেই গড়ে ওঠে কানোরিয়া জুট মিলের শ্রমিক আন্দোলন। 'মতপ্রকাশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরাই কানোরিয়া জুট মিলের শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করে। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হবার চাহিদা ও 'মতপ্রকাশ' পত্রিকার কর্মীদের প্রয়াস এই দুয়ের মেলবন্ধনে কানোরিয়া জুটমিলে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নকে কার্যত সাইনবোর্ডে পরিণত করে গড়ে তোলে সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন। ১৯৯৩ সালে সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে শ্রমিকরা মিলের প্রমোটার শিবশংকর পাশারির শ্রমিক বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই সংগঠিত করতে শুরু করে। প্রমোটার পাশারি ও তার সহযোগী সিটু নেতাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধের পথে হাঁটতে শুরু করে শ্রমিকরা। এই লড়াইয়ের ধারা-বাহিকতাতেই ১৯৯৩ সালের ২৩শে নভেম্বর থেকে ঘরভাড়া ও বকেয়া দু কিস্তি ডিএ-র দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করে শ্রমিকরা। প্রমোটার পাশারি ও তার সহচরদের সমস্ত সন্ত্রাস অগ্রাহ্য করে শ্রমিকরা উৎপাদন বন্ধ রাখে। দীর্ঘদিনের বঞ্চনার জবাব হয় কর্মবিরতি। ২৩-২৫ নভেম্বর কর্মবিরতি চলার পর ২৬ নভেম্বর ১৯৯৩ মিলে সাসপেনশন অব ওয়ার্ক ঘোষণা করে মিল কর্তৃপক্ষ। ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে যে লড়াই শুরু হয় ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে তার একটি পর্যায়ে অবসান ঘটে। কানোরিয়া জুটের শ্রমিকদের এই পর্যায়ের লড়াই গোটা দেশে নজর কাড়ে। প্রমোটার পাশারির আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং 'পুরো কাজ পুরো দাম' ভিত্তিতে গড়ে ওঠে আন্দোলন। লক আউট পর্যায়ে কারখানা দখল করে উৎপাদন চালু করে শ্রমিকরা। এটা ছিল প্রতীকী লড়াই। আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যৌথ রান্নাঘরের অভিনব উদ্যোগে সামিল হয় গণতান্ত্রিক মানুষজন। অন্তর্বস্তুতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন হলেও ট্রেড ইউইনিয়নের গণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তম সামাজিক পরিসরে এই আন্দোলন ছড়িয়ে যায়। অন্যান্য কারখানার শ্রমিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ায়। প্রমোটার পাশারির অপকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় সবাই। সিটু সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির ' ফড়ে'-প্রীতির স্বরূপ উন্মোচিত হয়। নানা বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যায় এই লড়াই। লড়াইয়ের চার দফা কর্মসূচি সূত্রায়ণও হয়। সেগুলি হলো: (১) শিল্প শ্রমিক আইন মেনে পাশারি মিল চালাতে পারলে চালাতে পারে; (২) পাশারি না পারলে অন্য কোনো মালিক চালাতে পারে; (৩) সরকার নিজেই চালাতে পারে; (৪) কেউ কিছু না করলে শ্রমিকরাই সমবায় করে মিল চালাবে। অর্থাৎ এক সামগ্রিক দৃষ্টিকোণে এই লড়াই গড়ে ওঠে। ১৯৯৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে এক ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের যে শক্তি এই আন্দোলনের নেতৃত্বে দিয়েছিল তার ঐক্যবদ্ধভাবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে এই লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের ভাবনা, সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি কানোরিয়া শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল। ফলত হেজে যাওয়া শ্রমিক আন্দোলনে সুবাতাস এনেছিল কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলন। বহু কর্মী ঘরবাড়ি ত্যাগ করে কানোরিয়া শ্রমিকদের জীবনের সঙ্গে নিজেদের জীবনকে জড়িয়ে নেয়। একথা বলা যায় এই সমস্ত নেতা ও কর্মীদের সক্রিয় উপস্থিতি এবং বৈপ্লবিক কর্মধারা ছাড়া কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলন বিকশিত হতো না।

১৯৯৪ সালে এই আন্দোলনের প্রাথমিক পরিসমাপ্তি ঘটলেও সিটু নেতাদের সহযোগিতায় তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের মদতে পাশারি বারবার চুক্তিভঙ্গ করে। তার বিরুদ্ধেও শ্রমিকরা লড়াইয়ের মশাল জ্বালিয়ে রাখে। অর্থাৎ মিলের প্রমোটার পাশারির অন্যায় অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিক সংগ্রাম জারি থাকে। কিন্তু কানোরিয়া 'ব্যর্থ আন্দোলনের নাম' এটা প্রমাণ করতে এবং শ্রমিক সংগঠন ভাঙ্গার জন্য কারখানা বন্ধ থেকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, নানা রকম আক্রমণ নেমে আসে। যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়াও অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত বলা যায় সমাজে সামগ্রিকভাবে শ্রেণী সংগ্রাম যখন দুর্বল অবস্থায় থাকে, শ্রমিকশ্রেণী যখন রাজনৈতিক-ভাবে সংগঠিত নয়, তখন এরকম সাড়া জাগানো আন্দোলন কীভাবে আরও উন্নত স্তরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তার রণনীতিগত কৌশল কী হবে সে সম্পর্কে আন্দোলনের নেতৃত্বদায়ী কমিউনিস্ট বিপ্লবীশক্তির ধারণা ছিল না। নতুনভাবে ভাবার চেষ্টাও হয়নি। ফলত আন্দোলন দুর্বল হতে শুরু করে, আন্দোলনের শ্রমিকদের সক্রিয়তা কমতে থাকে। এভাবে চলছিল। এর মধ্যেই হল এবারের চুক্তি।

এবারের চুক্তি কি নতুন কিছু?

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদলের পর চুক্তি করে মিল চালু হয়েছে। শুরুতেই একটা প্রশ্ন তোলা হয়েছিল বন্ধকারখানা খোলার ক্ষেত্রে এটা কি একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ? যদি এটা ইতিবাচক পদক্ষেপ হয় তাহলে বলতে হবে পাশারিকে দিয়ে এরকম মিল খোলা বামফ্রন্ট আমলেও বারবার হয়েছে। যে প্রমোটার পাশারি কানোরিয়া জুটমিলের সমস্যার মূল নায়ক, যার বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল লড়াই, তার সাথে সরকারি দল পরিচালিত ইউনিয়নকে দিয়ে চুক্তি করিয়ে মিল খোলানোকে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করা যায় না। বামফ্রন্ট আমলে সিটু নেতাদের মদতে পাশারি যা ইচ্ছে তাই করার চেষ্টা করত। তৃণমূল কংগ্রেস আমলে পাশারি শুধু আনুগত্য বদল করেছে। তাই তাকে মিলে মদত দিচ্ছে আইএনটিটিইউসি (যা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন)। গ্র্যাচুইটি, পিএফ, কাটৌতি সহ শ্রমিকদের বকেয়া প্রায় ২৫ কোটি টাকা। ২৩০০ জন অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক গ্র্যাচুইটি পায়নি। আর চুক্তিতে লেখা আছে, পিএফ-ইএসআই গ্র্যাচুইটি আইন অনুযায়ী দেওয়া হবে। প্রশ্ন হলো, আইন অনুযায়ী টাকা দেওয়া হলে বকেয়া টাকা কীভাবে দেওয়া হবে। যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নিলাম যারা এই পর্যায়ে কাজ করবে তাদের আইন অনুযায়ী টাকা দেওয়া হবে, যাদের টাকা বকেয়া পড়েছে সেখানে কোন্ আইন প্রযোজ্য হবে? সুতরাং হাজার হাজার শ্রমিককে বঞ্চনা করে এই চুক্তি হয়েছে। বাম সরকারের আমলের সাথে 'পরিবর্তনের সরকার' এখানে কোনো পার্থক্যরেখা টানতে পারেনি। মিল খোলার চারমাসের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি মিল চললেও তা চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। হাজারখানেক শ্রমিক কাজ পেয়েছে, যেখানে কাজ পাওয়ার কথা তিনহাজার শ্রমিকের। যারা কাজ পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে অর্ধেকের চেয়ে বেশি শ্রমিক ভাউচারে কাজ করছেন। অর্থাৎ কম মজুরিতে কাজ করছেন। মিলের শ্রমিকলাইন ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র করছে পাশারি। তৃণমূল পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন পাশারির সমস্ত কাজকে সমর্থন করে চলেছে। কানোরিয়া জুট মিলের এক সময়ের শ্রমিকনেতা পূর্ণেন্দু বসু আজ শ্রমমন্ত্রী। তার সহযোগিতায় পাশারি চালাচ্ছে তার শ্রমিকবিরোধী কার্যকলাপ। যেহেতু আমরা একসাথে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছি তাই অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন পূর্ণেন্দু বসু কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলনে এসেছিলেন এবং ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিলেন। গত কয়েকবছরে তিনি রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। বর্তমানে শাসক শ্রেণীর মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাজনীতির অন্যতম প্রচারক। রাজ্যের মন্ত্রী হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি পাশারির পক্ষেই অবস্থান গ্রহণ করবেন, শ্রমিকদের পক্ষে নয়। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এ ধরনের অবস্থান পরিবর্তন নতুন নয়। আমাদের আপত্তি তিনি এবং তার দল যেভাবে কানোরিয়া খোলাকে বন্ধ কারখানা খোলার বিষয়ে দারুণ কাজ বলে অভিহিত করছেন সেখানে। বস্তুত বাম সরকারের আমলে যেভাবে যে পদ্ধতিতে পাশারি কানোরিয়া জুট মিল চালাত গত পাঁচ মাস একই ভাবে চলছে। মৌলিক কোন পার্থক্য সূচিত হয়নি। রংটা শুধু পাল্টেছে এই যা। এবার প্রশ্ন হলো, কানোরিয়ার শ্রমিকরা কেন এই অবস্থা মেনে নিল? কী তাদের অবস্থা?

কেন কানোরিয়ার শ্রমিকরা কার্যকর প্রতিরোধ গড়তে পারছেন না?

১৯৯৩-৯৪ সালে কানোরিয়া জুটের শ্রমিকরা সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন, এখন কেন তা হচ্ছে না? এটা তো ঘটনা, কানোরিয়া শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও তা বিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়নি। মুখ বুজে তারা সবকিছু মেনে নিচ্ছেন। বরং বড় অংশের শ্রমিকই চেয়েছিলেন যেভাবে হোক কারখানা খুলুক। কিন্তু প্রশ্ন হল কানোরিয়া জুটের শ্রমিকরা কেন এই অবস্থা মেনে নিচ্ছে? কী তাদের অবস্থা? এবার আসা যাক সেই প্রশ্নে। কানোরিয়া জুটের শ্রমিকদের আন্দোলনবিমুখ এই অবস্থা হলো কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা আজ জরুরি। ঐতিহাসিক কানোরিয়া জুট শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠার প্রধান

শর্তই ছিল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করতে চেয়েছে। ১৯৯৪ সালে প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটার পর যে কমিউনিস্ট বিপ্লবী শক্তি ওখানে সক্রিয় তাদের নানা প্রকার মতপার্থক্য, ভ্রান্ত তত্ত্বায়ন, যার ফলশ্রুতিতে বারবার ইউনিয়নের ভাঙ্গন শ্রমিকদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছে। যে কমিউনিস্ট বিপ্লবী শক্তি ওখানে সক্রিয় ছিল তাদের কর্মীরা প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন এবং একটা বড় অংশ শ্রমিক আন্দোলনে নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৯৪-এর শেষার্ধ থেকে ঐ কমিউনিস্ট বিপ্লবী শক্তির নেতৃত্বের মধ্যেকার নানা মতপার্থক্য সামনে চলে আসে। এর মধ্যে রাজনৈতিক অন্তর্বস্তু যেমন ছিল, তেমন ছিল ব্যক্তিগত প্রভাব বাড়ানোর প্রচেষ্টা। আন্দোলন চলাকালীন কিছু বন্ধু-শক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা শক্তির কাছে নানা রকম সমালোচনা পৌঁছে দিয়েছিলেন। কিন্তু চরম অহংকার ও উদ্ধত্যের সাথে সে সমস্ত সমালোচনা বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। সব মিলিয়ে আন্দোলন সংকটে পড়তে শুরু করে। শুরু হয় নেতৃত্বের মধ্যে ভাঙ্গন। যার প্রভাব গিয়ে পড়ে ইউনিয়নের মধ্যে। একদিকে কমিউনিস্ট বিপ্লবী শক্তির মধ্যে মতপার্থক্য যেমন বাড়ে অন্যদিকে এর প্রভাব গিয়ে পড়ে আন্দোলনে এগিয়ে থাকা শ্রমিকদের মধ্যে, তাদের একতার মধ্যেও ভাঙ্গন ধরে। প্রাথমিকভাবে শ্রমিকদের বড় অংশ এটা ধরতে পারেনি। কিন্তু যখন বুঝতে পারল তাদের লড়াইয়ের উৎসাহ স্তিমিত হতে শুরু করে।

কানোরিয়া জুট শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবে বেশ কিছু জায়গায় সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। এবং শ্রমিক আন্দোলন বিকশিত হতে থাকে। কমিউনিস্ট বিপ্লবী শক্তির মধ্যেকার মতপার্থক্য ঐ সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে গিয়ে পড়ে। এককথায় যে আন্দোলন এক বছর আগেও গোটা রাজ্যের শ্রমিকশ্রেণী-সহ বৃহত্তম জনমানসে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, শ্রমিক ও গণ-আন্দোলনে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছিল, সেই আন্দোলনে এক বছরের মধ্যে ক্ষয়ের দিকগুলি ক্রমশ পরিপুষ্ট হতে থাকলো এবং সেটাই ক্রমে প্রাধান্যকারী জায়গায় চলে গেল। আন্দোলনের এই অবস্থা শাসকদল, মিল মালিক খুব ভালভাবেই বুঝতে পারল। এই পর্যায়েই নানান আক্রমণ ধারাবাহিকভাবে শ্রমিকদের উপর নেমে আসতে থাকলো। এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলো শ্রমিকরা।

এবার আসা যাক অন্য একটি প্রসঙ্গে। কানোরিয়া জুটে একটা পর্যায়ের পর থেকে ভ্রান্ত তত্ত্বায়ন শুরু করে আন্দোলনের নেতৃত্বের একটা অংশ, যার প্রভাব পড়ে সুদূরপ্রসারী। সেই বিষয়গুলি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। একটি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে কানোরিয়া জুটে সমবায়ের বিষয়টি এসেছিল। যাতে ছিল একটি বিকল্প ভাবনাকে সামনে রেখে শ্রমিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ঐ সময়ে আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সমবায় সমস্যার গভীরতা নিয়ে প্রাথমিকভাবে ওয়াকিবহাল ছিল। এবং তা শ্রমিকদের মাঝে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে একটা অংশ শ্রমিক-সমবায় বিষয়টি আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার পরিবর্তে আবেদন নিবেদন বা 'যেভাবেই হোক ম্যানেজ করা' দৃষ্টিভঙ্গি আন্দোলন পরিচালনা করতে লাগলেন। এর জন্য কখনও আমুল-এর মতো কর্পোরেট সমবায়ের কথা বলা, কখনও ব্যক্তি-মালিক ধরে আনা, কখনো প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর বদান্যতার উপর নির্ভর করা শুরু হলো। শ্রমিক উদ্যোগ, শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিকদের নিজেদের পায়ে উঠে দাঁড়ানোর চেয়ে তাদের নিষ্ক্রিয় করার পথে আন্দোলনের নেতৃত্বের একটি অংশ হাঁটতে শুরু করলো। শ্রমিকদের বলা হলো শ্রমিক সমবায়ের বিষয়টা 'প্রায়' হয়ে গেছে, আর একটু বাকি। এটা যখন বাস্তবায়িত হয় না তখন কানেরিয়া জুটে শ্রমিকরা হতাশ হয়। এবং পরবর্তীতে সমবায়ের বিষয়টা সব থেকে অবিশ্বাস করতো কানোরিয়া জুটের শ্রমিকরাই। নানা দ্বিধাদ্বন্দের কারণে বাকিরা এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। যেহেতু ভাঙ্গন ঐ সময় কানোরিয়ায় সাধারণ প্রবণতায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাই দ্বিধা বেড়েছিল। দ্বিতীয়ত : একটা পর্যায়ের পর থেকে অদ্ভুতভাবে ব্যক্তিপূজা শুরু হলো। একজন ব্যক্তি আন্দোলনে শেষ কথা বলবেন। যে কোনো কর্মসূচিতে উনিই সিদ্ধান্ত নেবেন এরকম ভাবনা শ্রমিকদের মধ্যে চারিয়ে দেওয়া হলো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ হতেই পারে। কিন্তু যখন এটা সাধারণীকরণ করা হয় তখনই সমস্যা বাড়ে। কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান শর্তই ছিল গণতান্ত্রিক পরিবেশ। আন্দোলনের সময় সূত্রায়ন হয়েছিল, সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত না হলে বাকিরা তা মেনে নেবে না। যার প্রমাণ পাওয়া যেত অজস্র সাধারণ সভার মাধ্যমে। কিন্তু সেই ভিত্তি যখন পাল্টে একজনই শেষ কথা বলবে এরকম কথা আসে তখন সমস্যা বাড়ে। সমস্যা ঘনীভূত হয় যখন ঐ ব্যক্তির মত সাধারণ সভায় পরাস্ত হয়। তখন যুক্তি আনা হয়। উনি এই মত মানতে বাধ্য নন। কারণ আগের সাধারণ সভায় অনেক বেশি শ্রমিক ছিল, এখন অনেক কম। আর যেহেতু উনি আন্দোলন বোঝেন, তাই উনি ভুল সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য নয়। মানে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? ওনার মত যখন সাধারণ সভায় গৃহীত হচ্ছে সেটা ঠিক হচ্ছে, কিন্তু ওনার মত সাধারণ সভায় গৃহীত না হলে ভয়ংকর ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। অতএব উনি সেটা মানতে বাধ্য নন। শুধু কানোরিয়া জুট নয় এই ধারায় আন্দোলন যেখানে যেখানে বিকশিত হয়েছে, বাউড়িয়া কটন, ফুলেশ্বর কটন সেখানেও একই অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই ধরনের তত্ত্বের যারা প্রবক্তা হয় তারা নিজেদের নেতৃত্ব রাখার জন্য ভয়ংকর সন্দেহপ্রবণ, প্রতিহিংসাকারী হয়। এবং কোনো নিয়মনীতির ধার ধারে না। শ্রমিকদের স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থটাই বা নিয়ন্ত্রণটা প্রধান বিচারে থাকে, তাই শ্রমিক আন্দোলন ভেঙ্গে গেলে, সংগঠন দুর্বল হলেও চিত্তের কোনো

পরিবর্তন ঘটেনা। নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করে যায়। এটা স্বীকার করতে হবে, কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা প্রধান জায়গায় ছিল। তার এই নেতিবাচক ভাবনা ও কাজকর্ম কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলনের বড়ো রকমের ক্ষতি করেছে। প্রশ্ন আসে, এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্তরে বা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের অন্যরা কেন প্রতিবাদ করল না। তর্কবিতর্ক, প্রতিবাদ বহু হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই ধরনের চিন্তায় যিনি বিশ্বাসী হন তিনি বহুক্ষেত্রে অন্যদের মতকে গুরুত্ব দেন না। মতপার্থক্য হলেই নিজের মতকে নিয়ে প্রয়োগে চলে যান। বাকিদের হয় তখন সংগঠন ভাঙতে হবে নতুবা বিরোধিতা থাকলেও চুপ থাকতে হবে। এ ছিল এক জটিল সমস্যা।

তৃতীয়ত : এক বিপ্লবী অবস্থান থেকে কানোরিয়া জুট শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু নেতৃত্বের একটি অংশ বারবার সেই অবস্থান থেকে সরে এসে শাসকদলের নেওয়া সিদ্ধান্ত, (যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে) তাদের ঘেরাটোপের মধ্যে আন্দোলনকে নিয়ে যেতে থাকে। নীতি ও কৌশলের আন্তঃসম্পর্ক বুঝতে ব্যর্থ হয়। নীতিগত অবস্থান ও নিজস্ব শক্তির জোরে যে কৌশল নিতে হয় সেটা না বুঝে কৌশলই নীতি হয়ে পড়ে। শাসকদলের অর্ন্তদ্বন্দ্ব ব্যবহার করতে গিয়ে নিজেরা ব্যবহৃত হয়েছে এবং শ্রমিকদের বিপ্লবী চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এবার কানোরিয়া জুটের দুজন নেতা বিগত বিধানসভা নির্বাচনের সময় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে খোলাখুলি ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একজন তো তৃণমূলের ট্রেড ইউনিয়নের অংশীদার করে একটি অংশকে তৃণমূলের পক্ষে প্রচারে ইউনিয়নকে নামায়। ১৯৯৩-৯৪ সালের উত্তাল আন্দোলনের সময় যখন মিলের বেশীরভাগ শ্রমিক কমিউনিস্ট বিপ্লবী শক্তির প্রভাবাধীন তখনই সিদ্ধান্ত হয়েছিল সংগ্রামী ইউনিয়নকে নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠনের মুখপত্র করা হবে না। সাধারণভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব অবস্থা, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বল অবস্থা প্রভৃতি দিক বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত হয়েছিল রাজ্যে শ্রমিক আন্দোলন বিকাশের স্বার্থে ইউনিয়ন কোন দলের পক্ষভুক্ত করা হবে না, কোন দলের হয়ে রাজনৈতিক প্রচারও চালানো হবে না। প্রতিক্রিয়াশীল ও আপসকামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বৃহত্তর মঞ্চ হবে এই ইউনিয়ন। ঐ সিদ্ধান্ত ছিল সঠিক, আজও বৃহত্তর শ্রমিক আন্দোলনের স্বার্থে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন একই দৃষ্টি ভঙ্গিতে চলা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা দেখেছি বিগত বিধানসভা নির্বাচনের সময় একটি অংশ তৃণমূলের ট্রেড ইউনিয়নের অংশ হিসাবে প্রচার শুরু করে। আর একটি অংশ প্রচারপত্র বের করে তাতে লেখে : ''এই সভা তাই চায়, অত্যাচারী বামফ্রন্ট সরকার হটে যাক, এই সভা এও আশা করে যে পরিবর্তনের হাওয়ায় আসন্ন নির্বাচনে বামফ্রন্টের বদলে নতুন এক সরকারকে নির্বাচিত, করবেন বাংলার মানুষ। আর পরিবর্তনকারী রাজ্যবাসীর সঙ্গে একযোগে এই সভারও আজ আজ আশা এই যে বাংলার সরকার পাল্টে দিয়ে গঠিত রাজ্যের নতুন সরকার সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির এক নতুন বাংলার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে। চালু করবে জনস্বার্থবাহী এক প্রকৃত উন্নয়ন নীতি''। (জয়দেব মণ্ডল ও জীবন চন্দ্র প্রামাণিক কর্তৃক প্রচারিত লিফলেট)। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানো স্মারকলিপিতে তারা লেখেন, ''অত্যাচারী বামফ্রন্ট সরকারের অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে এরাজ্যে আপনার নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠায় আমরা আনন্দিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে সরকার পরিবর্তনের এই আন্দোলনে প্রধান উপদেষ্টা প্রফুল্ল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আমাদের ইউনিয়নও সামিল ছিল।''

সুতরাং যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে কানোরিয়া জুট সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল সেই ভিত্তিকেই এর মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। সম্প্রতি কানোরিয়াতে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর গ্রেপ্তার নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে খুব হৈচৈ হয়েছে। আসলে এই ঘটনা ছিল তৃণমূলের দুটো শক্তির অভ্যন্তরীণ বিবাদ আর ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উপায় মাত্র। রাষ্ট্র যেভাবে প্রফুল্ল চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করেছিল তার প্রতিবাদ অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। প্রতিবাদ হয়েছে। কিন্তু এর সাথে শ্রমিক স্বার্থের খুব একটা সম্পর্ক ছিল না। তাই এই ঘটনায় সবচেয়ে নিষ্ক্রিয় ছিল কানোরিয়ার শ্রমিকরা। অপরদিকে কানোরিয়াতে এখনও যে রাজনৈতিক কর্মীরা চাকা ঘোরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, তারাও এমন কিছু প্রভাব সৃষ্টির করতে পারেনি যাতে শ্রমিকরা আগের মতো সক্রিয় হয়ে ওঠে।

এই কারণগুলির সাথে আর একটি বিষয় যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তা হচ্ছে কানোরিয়া জুটমিল ও জুটমিল চলার ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যাপক অনিশ্চয়তা। এত বড় লড়াই করে যখন সঠিক শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ হয় না বা মিলে কাজ করার প্রশ্নে, অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা রয়েই যায় তখন হতাশাও বাড়ে। সুতরাং আজকে কানোরিয়া শ্রমিকদের আন্দোলনহীন অবস্থা কারণ হিসাবে বলা যায় : (১) যে বিপ্লবী শক্তি ওখানে ক্রিয়াশীল ছিল তার ব্যর্থতা; (২) বারবার ভাঙ্গন; (৩) ভ্রান্ত তত্ত্বায়ন; (৪) মিলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা।

লড়াইয়ের উপযুক্ত আধার এই মুহূর্তে কানোরিয়া শ্রমিকদের সামনে না থাকার জন্য পাশারি যখন রাজ্য সরকারের মদতে কার্যত কোন চুক্তি ছাড়াই মিল খুললো শ্রমিকরা তা মেনে নিতে বাধ্য হলো। একথা আজ জানা প্রয়োজন কানোরিয়া জুটের ৭৫ শতাংশ ভাগ শ্রমিকই লড়াই থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে ৯০ শতাংশ শ্রমিক লড়াই চেয়েছিল তাই লড়াই হয়েছে। আজ ৭৫ শতাংশ শ্রমিক নিষ্ক্রিয় তাই লড়াই নেই। সুতরাং এই মুহূর্তে কোন্ ইউনিয়নের দিকে বেশি শ্রমিক আছে তা বলা অর্থহীন কারণ বেশীরভাগ শ্রমিকই সংগঠিত

লড়াইয়ের অবস্থানে নেই। হয়তো কোন একটা ঘটনায় শ্রমিকরা ফুঁসে উঠতে পারেন, বড়ো বিক্ষোভও হতে পারে (যা এখানকার জুট মিলের শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য), কিন্তু সংগঠিত ধারাবাহিক শ্রমিক আন্দোলন (যা এর আগে কানোরিয়া শ্রমিকরা গড়ে আলোড়ন ফেলেছে) এই মুহূর্তে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। এবার এরাজ্যের সংগ্রামীদের শ্রমিক আন্দোলনের অবস্থার প্রেক্ষিতে বিষয়টা বিবেচনা করা যাক।

রাজ্যে সংগ্রামী ধারার শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কানোরিয়ার শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা

বিগত শতকের আট এবং নয়ের দশকে বিভিন্ন মিলে সংগ্রামী ধারায় আন্দোলনগুলি বিকশিত হতে থাকে। আজ শুধু কানোরিয়া নয়, প্রায় সর্বত্র সেই ধারার আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছে। কানোরিয়া শ্রমিকদের আজকের নিষ্ক্রিয়তার প্রধান কারণ আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে রাজ্যের শ্রমিক আন্দোলনের জীর্ণ অবস্থাও তাদের নিষ্ক্রিয় হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সংগ্রামী ধারায় শ্রমিক আন্দোলনের আজকে উজ্জ্বল উপস্থিতি নেই তার কারণ হলো :

ক) প্রাথমিক ভাবে সংগঠিত হবার পর, একটা পর্যায় পর্যন্ত আন্দোলন চালাবার পর মালিক ও শাসকদলের আক্রমণের বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে কীভাবে লড়াইকে বিকশিত করা হবে সে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা না থাকা এবং স্পষ্ট ধারণা না থাকার জন্য কোন কর্মসূচি হাজির করতে ব্যর্থ হওয়া, যার পরিণতিতে একটা পর্যায়ের পর সংগ্রামী ধারার ইউনিয়নগুলি অন্তর্বস্তুতে শুকিয়ে যেতে থাকে। শ্রেণী সংগ্রামের আজকের দুর্বল অবস্থা, যার ফলে নানা পিছিয়ে পড়া চিন্তার বহিঃপ্রকাশ শ্রমিক আন্দোলনে গেড়ে বসেছে, তার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম, শ্রেণীর লড়াকু অংশকে বৃহত্তর আন্দোলনের জীবনে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হবার কারণেই এই অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে।

খ) শ্রমিক আন্দোলন ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে বিকাশের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন বিকাশের প্রশ্নটিও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। আমরা বিগত শতকের তিনের দশক, পাঁচ, ছয়, সাতের দশকে দেখেছি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে দুর্বল, অসম্পূর্ণ, আধখ্যাঁচরা হলেও শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন পাশাপাশি চলেছে। সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর বিকল্প রাজনীতি হাজির ছিল, ফলে শ্রমিক আন্দোলন অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতো। এই প্রসঙ্গে বিগত শতকের ষাটের দশকে জয়া শ্রমিক আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। আজকের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতির বিকল্প ধারা কেন্দ্রীয়ভাবে দুর্বল অবস্থাতেও উপস্থিত নেই। আন্তর্জাতিক ও জাতীয়, উভয় স্তরের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। খুব স্বাভাবিক ভাবেই কোন কারখানা বা শিল্পে শ্রমিকরা প্রাথমিকভাবে সংগঠিত লড়াই শুরু করলেও রাষ্ট্র, মালিক ও শাসকদলের জোরালো আক্রমণের মুখে রাজনৈতিক ভাবে বৃহত্তর লড়াই গড়তে পারেনি। ফলে শ্রমিক আন্দোলনে সংগ্রামী ধারার প্রয়োজনীয় বিকাশ ঘটছে না। একটা পর্যায়ের লড়াইয়ের পর এর পর কী, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়নি বা পাচ্ছে না। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিকাশ ঘটাতে গেলে বিকল্প রাজনৈতিক ধারারও বিকাশ ঘটাতে হবে। না হলে ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে প্রতিক্রিয়াশীল ও আপসকামী নেতৃত্বকে ছুঁড়ে ফেলে সংঘবদ্ধ হলেও বৃহত্তর রাজনৈতিক আঙ্গিনায় সেই শাসকদলগুলির পক্ষ নিতে তারা বাধ্য হচ্ছে। কানোরিয়া শ্রমিকদের নিষ্ক্রিয় হবার পিছনে এই কারণটিও আমাদের অনুধাবন করতে হবে। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রধান প্রতিপক্ষ শ্রমিকশ্রেণী সুতরাং পুঁজিপতিরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে শ্রমিকশ্রেণীর উপর সবচেয়ে তীব্র আক্রমণ নামিয়ে আনে। শ্রমিকশ্রেণী যেখানে সংগঠিত হয়, শ্রেণী আন্দোলন বিকশিত হয়, পুঁজিপতিরা তাকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে উদ্যোগী হয়। এরাজ্যেও সংগ্রামী ধারার আন্দোলন ধ্বংস করতে পুঁজিপতিরা একই পন্থা নিয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া থাকলেও লক্ষ্যবস্তু ছিল একটাই। তা হলো শ্রমিকরা যাতে সংঘবদ্ধ হতে না পারে। কানোরিয়াতেও একইভাবে ভিতর ও বাইরে থেকে আক্রমণ নামানো হয়েছে।

একটা কথা না স্বীকার না করলে দায় এড়ানো হবে। ১৯৯৩-৯৪ সালের সাথে আজকের অবস্থা তফাৎ থাকলেও একেবারে গুণগত পরিবর্তন তো হয়নি। সুতরাং ১৯৯৩-৯৪ সালে যদি কঠিন পরিস্থিতিতেও লড়াই করা যায় আজ কেন পারা যাবে না। পারা যে যাবে না একথা বলছি না। কিন্তু কাজটা কঠিন হয়েছে। সবশেষে একটা কথা উল্লেখ করতে হবে যে কানোরিয়া শ্রমিকদের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কোন কোন সময়ে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তারা লড়তে পারবে না। কিন্তু পর মুহূর্তেই দেখা যাচ্ছে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তারা লড়াইয়ের ময়দানে সামিল হচ্ছেন। এখনও সেই উপাদান আছে বলে আমি মনে করি। সুতরাং আজকের নিষ্ক্রিয় অবস্থা আগামী দিনে সক্রিয়তায় রূপান্তরিত হতে পারে। যে সমস্ত শক্তি বৈপ্লবিক অবস্থান থেকে এখনও কানোরিয়া শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার প্রয়াস চালাচ্ছেন তাদের এই সত্যটা মনে রাখতে হবে। কিন্তু তার সাথে বিগত দিনগুলির লড়াইয়ের সারসংকলন করে, নতুন নতুন কর্মসূচি নিয়ে ভ্রান্ত ভাবনাকে পরাস্ত করে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে লড়াইকে গড়ার উদ্যোগ নিতে হবে। এ রাজ্যে সংগ্রামী ধারার আন্দোলন দুর্বল হয়েছে কিন্তু শুকিয়ে যায়নি। সংগ্রামী ধারার আন্দোলনের বিকাশের স্বার্থেই কানোরিয়া শ্রমিক আন্দোলনকে জেগে উঠতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীল, শ্রমিকবিরোধী শক্তি আপাতভাবে আধিপত্যকারী অবস্থানের চলে যেতে পারে, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের দায়িত্ব তো নিতে হবে লড়াকু কানোরিয়া শ্রমিকদের এবং বিপ্লবী শক্তিকে।

প্রবন্ধ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন আর মুক্ত মানুষের বাসযোগ্য নয়

জোনাথন টুলি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ইউরোপীয় বসতিকারীরা উপনিবেশ স্থাপনের সময় থেকেই সেদেশে চলেছে প্রথমে সেদেশের আদিম অধিবাসীদের গায়ের জোরে উৎখাত ও হত্যার, এবং তারপর আফ্রিকা থেকে কালো মানুষদের ধরে এনে ক্রীতদাস বানিয়ে শোষণের প্রক্রিয়া। ফলত দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে সেটা কখনোই 'মুক্ত বা স্বাধীন মানুষের দেশ' ছিল না। এমনকি বসতিকারীদের উত্তরপুরুষদের ক্ষেত্রেও যতোটা প্রচার করা হয় ততোটা স্বাধীনতা বাস্তবে ছিল না, এবং আজকে তা আরো সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, সাথে সাথে ধ্বসে পড়ছে সেই মুক্তি সম্পর্কিত মোহও। অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতা যত বাড়ছে, ততই বিরাট সংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে অমিল হয়ে পড়ছে চাকরি, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা; এবং এই মুহূর্তে পুলিশি রাষ্ট্রে রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রেক্ষিতে— সুনির্দিষ্ট জনসমষ্টির উপর নিপীড়ন বা সন্দেহ এবং ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হবার প্রস্তুতিতে সবার মৌলিক অধিকারের ক্রমাগত সংকোচন— তৈরি হচ্ছে এক চরম পরিস্থিতি। এমনকি 'আমেরিকানদের নৈতিক ও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব'-এর প্রবক্তারাও স্বাধীনতা সম্পর্কিত ক্রমাগত উচ্চারিত বিজ্ঞাপনের পটভূমিকায় দম বন্ধ হয়ে আসার অনুভূতিতে হাঁসফাস করতে শুরু করেছেন।

"*সত্য যখন মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়... মানুষের সব আনন্দ অদৃশ্য হয়ে যায়*" : বলেছিলেন জেফারসন। মাও সেতুং বলেছিলেন: "*মোহ ছুঁড়ে ফেলো, লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হও।*" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তব অবস্থা এখন এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর মতো একটি প্রথম সারির পত্রিকাও এখন চলমান বাস্তব পরিস্থিতির অসহনীয়তার উপর পত্রিকার উত্তর-সম্পাদকীয়তে প্রতিবেদনমূলক প্রবন্ধ ছাপছে। এরকমই একটি প্রবন্ধ একটু সংক্ষিপ্তাকারে আমরা প্রকাশ করছি। ছাপার আর একটি উদ্দেশ্যও অবশ্য আছে। আমাদের দেশে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে, সামান্য ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে প্রায় সমস্ত সামনের সারির টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রই সমস্ত নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতাসীনদের পক্ষে নির্লজ্জভাবে ওকালতি করতে অভ্যস্ত। এই নিবন্ধটি কি তাদের সামান্য চৈতন্যোদয় ঘটাতে পারবে ! —সম্পাদকমণ্ডলী, *অনীক*

প্রতি বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে অন্যান্য দেশের মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে বিরাট বিরাট রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সারা পৃথিবীতে কোন্ কোন্ দেশে অধিকারের সংকোচনমূলক কী কী আইন বা বিধি চালু হলো, তার বিস্তৃত বিবরণ সেখানে পাওয়া যায়। যেমন, সুষ্ঠু প্রকাশ্য বিচারব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং গোপনীয়তা খর্ব করার জন্য ইরানের নিন্দা করা হয় এবং রাশিয়াকে নিন্দা করা হয় প্রচলিত বিধি লঙ্ঘন করার জন্য। একইভাবে অন্য সব দেশে গোপন বিচার বা আটক আইন বা নির্যাতনকে নিন্দা করা হয়।

আমরা আমেরিকানরা গর্বের সঙ্গে মনে করি, একটি মুক্ত সমাজ সম্পর্কে যে সংজ্ঞাই প্রযুক্ত হোক না, আমাদের দেশ সব সময়েই স্বাধীন ও মুক্ত সমাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। দেশে এই মুহূর্তে চালু করা বহু আইন ও বিধি কিন্তু সেকথার প্রমাণ বহন করে না। ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বরের পরবর্তীকালে নিরাপত্তা-মূলক ব্যবস্থার সম্প্রসারণের অজুহাতে দেশে নাগরিক অধিকার অনেক পরিমাণেই খর্ব করা হয়েছে। তার সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে গত বছরের শেষ দিনে স্বাক্ষরিত ন্যাশনাল ডিফেন্স অথরাইজেশন অ্যাক্ট। এই আইন অনুসারে একজন নাগরিককে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আটক রাখা যাবে। মানবাধিকারের কোন্ সংজ্ঞা দিয়ে এতে সমর্থন করা যাবে?

ওয়াশিংটন কর্তৃক গৃহীত জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিটি ক্ষমতাবিধিই প্রণীত হবার পর বিতর্ক উঠেছে, তবে প্রায়শই সেগুলি আলোচিত হয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে। তারা কিন্তু মোটেই বিচ্ছিন্নভাবে প্রযুক্ত হয় না। সব মিলিয়ে সেগুলি ক্ষমতার এমন একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা হয়ে ওঠে যে, সামগ্রিক বিচারে আমাদের দেশকে অন্তত অংশত স্বৈরতান্ত্রিক বলে চিহ্নিত করা যায়। আমেরিকানরা প্রায়শই নিজেদের দেশকে সারা পৃথিবীর সামনে মুক্তির প্রতীক হিসেবে তুলে ধরে এবং কিউবা, চীন প্রভৃতি দেশকে তার বিপরীত বলে দাবি করে। বাস্তবত এটি কিন্তু একটি অর্ধ-সত্যমাত্র। ওই সব দেশকে মৌলিক ব্যক্তিগত অধিকারের অনুপস্থিতির জন্য আমরা সমালোচনা করি। কিন্তু খেয়াল করি না যে, আমরা স্বীকার করি বা না করি, সে সবের সাথে এখন আমাদের ব্যবস্থারও অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

ওই সব দেশের সংবিধানে কিন্তু সমস্ত নাগরিককেই মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে সব দেশের সরকার বহু নাগরিককে সেগুলি থেকে বঞ্চিত করার ও তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাবার পথে বাধানিষেধ রীতিনীতি চালু করে রেখেছে। এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কি খুব একটা ব্যতিক্রমী অবস্থায় আছে? আসুন, একটু বিচার করে দেখা যাক। ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বরের পরবর্তীকালে মার্কিন সরকার যে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, তাতে আমাদের দেশও কিন্তু ওদের দলে ঢুকে গেছে।

১। মার্কিন নাগরিকদের হত্যা করার সংস্থান

প্রেসিডেন্ট বুশের মতো ওবামাও যে কোনো মার্কিন নাগরিককে সন্ত্রাসবাদী বা তাদের মদতদার বলে চিহ্নিত করে হত্যা করার নির্দেশ দেবার অধিকার দাবি করেছেন। এই দাবির ভিত্তিতেই তিনি গত বছর মার্কিন নাগরিক আনোয়ার আল-আওলাকি-সহ আর একজনের হত্যাকে অনুমোদন দিয়েছেন। গত ৩১ ডিসেম্বর প্রশাসন সেই দাবিতে সীলমোহর দিয়ে ঘোষণা করেছে যে প্রেসিডেন্ট কাউকে সন্ত্রাসবাদীদের সাথে যুক্ত মনে করলে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতে পারেন।

—নাইজেরিয়া, ইরান ও সিরিয়াকে শুধুমাত্র রাষ্ট্র কর্তৃক বিচার ছাড়া হত্যার এই বিধির কারণেই কিন্তু নিয়মিত সমালোচনা করা হয়!

২। অনির্দিষ্টকাল আটক রাখা

গত মাসে স্বাক্ষরিত উপরোক্ত আইন অনুসারে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে সন্দেহভাজনদের সামরিক বাহিনী আটক রাখবে। প্রেসিডেন্টের অধিকার থাকবে তাদের অনির্দিষ্টকাল আটক রাখার। প্রশাসনের দাবি, এটা প্রচলিত বিধিরই আইনিকরণ। অধিকাংশ আইন-বিশেষজ্ঞ সেই দাবির বিরোধিতা করছেন, এবং প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে তার বিরোধিতা করার পথে বাধা দিয়ে চলেছে। সরকার তাদের ইচ্ছেমতো নাগরিকদের আইনি সুরক্ষা কেড়ে নেবার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে।

—চীনে সম্প্রতি এর চেয়ে অনেক বেশি সীমিত একটি আটক আইন চালু করেছে বলে তাকে নিন্দা করা হয়েছে, আর কাম্বোদিয়ার মতো দেশকে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ঠিক এরকম 'অনির্দিষ্টকাল আটক' রাখার বিধির জন্যই আলাদাভাবে নিন্দা করে থাকে!

৩। যথেচ্ছ বিচার

এখন কোনো ব্যক্তির বিচার কোথায় হবে— যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে, না সামরিক ট্রাইবুনালে— সেটা ঠিক করবেন প্রেসিডেন্ট। ঠিক এই রীতিটিকেই সারা পৃথিবীতে ব্যঙ্গ করা হয় মৌলিক বিচারের প্রহসন হিসেবে। বুশ ২০০১-এ এই ক্ষমতা চালু করেন, ওবামা সেই রীতি অপরিবর্তিত রেখেছেন।

—চীন ও মিশরকে কিন্তু আমরা বিশেষ বিশেষ নাগরিকদের জন্য স্বতন্ত্র এই বিচারের ব্যবস্থার জন্যই নিন্দা করি!

৪। ওয়ারেন্ট ছাড়া তল্লাসি

প্রেসিডেন্ট এখন ওয়ারেন্ট ছাড়াই কারও উপর নজরদারির, এবং বিভিন্ন কোম্পানি ও সংগঠনকে নাগরিকদের অর্থসংক্রান্ত এবং তাদের যোগাযোগ ও তারা কার সঙ্গে মিশছে সে সংক্রান্ত খবরাখবর দিতে বাধ্য করতে পারেন। ২০০১-এ বুশ এই চরম ক্ষমতা আদায় করে নিয়েছিলেন, ওবামা ২০১১-তে তাকে আরও বাড়িয়ে নিয়ে ব্যবসাপত্রের কাগজপত্র থেকে লাইব্রেরি রেকর্ড-সহ সব কিছু তল্লাশি করার ক্ষমতা পেয়েছেন। সরকার এখন 'জাতীয় নিরাপত্তা বিধি' অনুসারে যে কোনো সংগঠনের কাছে কারণ না দেখিয়েই নাগরিকদের সম্পর্কে খবর দাবি করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তা না জানাবার নির্দেশও দিতে পারে।

—সৌদি আরব ও পাকিস্তানে সরকার নাগরিকদের উপর আইন অনুসারেই ব্যাপক তল্লাশি ও নজরদারির ব্যবস্থার জন্যই কিন্তু নিন্দিত হয়ে থাকে!

৫। গোপন সাক্ষ্য

সরকার এখন রুটিনমতোই গোপন সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তিকে আটক করছে এবং সে সব গোপন সাক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ও সামরিক আদালতে কাজে লাগাচ্ছে। কোনো মামলায় জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর সরকারি গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে —এই মর্মে সরকার বিবৃতি দিয়েই মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে বহু মামলা বাতিল করার ব্যবস্থা করছে। এমনকি বহু নিতান্তই ব্যক্তিগত মামলাতেও অহরহ এরকম বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারকরা বিনা প্রশ্নেই তা মেনে নিচ্ছেন। অনেক মামলা তো আদালতেই তোলা হচ্ছে না। মামলা করার এক্তিয়ার সীমিত করে দিয়ে প্রায়শই যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতগুলি সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কার্যক্রমকে সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জ জানানো মামলাগুলি নিয়মিত বাতিল করে চলেছে।

৬। যুদ্ধাপরাধ

বুশ জমানায় সন্ত্রাসবাদী হিসেবে সন্দেহভাজনদের উপর অমানবিক নির্যাতনকারীদের বিচার করার জন্য সারা বিশ্ব দাবি তুলেছিল। ২০০৯-এ ওবামা প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছিল যে, সিআইএ কর্মচারীদের সম্পর্কে তদন্ত বা বিচার করা চলবে না। এটা শুধু বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পাদিত চুক্তিই ভঙ্গ করে নি, এমনকি আন্তর্জাতিক আইনের ন্যুরেমবার্গ নীতিমালাকেও লঙ্ঘন করেছে। যখন স্পেন প্রভৃতি দেশে যুদ্ধাপরাধের জন্য বুশ জমানার লোকদের তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তখন ওবামা প্রশাসন তাদের বিদেশ মন্ত্রককে তা অনুমোদন করতে নিষেধ করে দিয়েছে। অথচ দীর্ঘ দিন ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে এই অধিকার দাবি করে এসেছে।

—বিভিন্ন দেশ অতীতে বিভিন্নভাবে তাদের কর্মচারীদের যুদ্ধাপরাধের জন্য তদন্তে বাধা দিয়ে সমালোচিত হয়েছে। সার্বিয়া ও চিলিকে এ ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইন মানতে বাধ্য করা হয়েছে। আর ইরান, সিরিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ নিরপেক্ষ তদন্তের সুযোগ দিতে বাধা দেওয়ার জন্য এখনও সমালোচিত হয়ে চলেছে।

৭। গোপন আদালত

সরকার এখন বৈদেশিক গোয়েন্দা নজরদারির আদালতকে

অনেক বেশি বেশি ব্যবহার করছে, যা আবার বৈরিতামূলক বিদেশি সরকার বা সংগঠনগুলিকে সাহায্য করছে বা মদত দিচ্ছে বলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদেরকে গোপনে গ্রেপ্তার করার ছাড়পত্র দিচ্ছে। ওবামা ২০১১ সালে এই ক্ষমতার পুনর্নবীকরণ করেছেন, এবং তার সাথে সাথে চিহ্নিত নয় এমন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর ব্যক্তিদেরকেও গোপনে তল্লাশি করার ক্ষমতা যুক্ত করে নিয়েছে। কংগ্রেস কর্তৃক এই নির্দিষ্টকৃত সীমাও মানছে প্রশাসন না।

—পাকিস্তানের সামরিক বা গোয়েন্দা দপ্তরও এরকম অসীম ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য নিন্দিত হয়ে থাকে।

৮। বিচারব্যবস্থার আওতা থেকে অব্যাহতি

বুশ প্রশাসনের মতো ওবামা প্রশাসনও তাদের গোপনে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে সহযোগী সংগঠনগুলিকে বিচারব্যবস্থা থেকে রেহাই দেবার ব্যাপারে সফলতা অর্জন করেছে। ফলত নাগরিকেরা তাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ভঙ্গের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জ জানাতে পারছে না।

—চীনও একইভাবে দেশের ভিতরে ও বাইরে বিচারব্যবস্থা থেকে ব্যাপক রেহাইয়ের ব্যবস্থা চালু রেখেছে এবং নিয়মিত সহযোগী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে আনীত মামলা বাতিলের ব্যবস্থা করে রেখেছে। তাহলে?

৯। নাগরিকদের উপর ধারাবাহিক নজরদারি

ওবামা প্রশাসন নির্দিষ্ট নাগরিকদের প্রতিটি কার্যকলাপের উপর নজরদারির ক্ষমতা এবং তার বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় নির্দেশ বা পর্যবেক্ষণ অকার্যকর করার ক্ষমতা এখন সাফল্যজনকভাবে ব্যবহার করতে পারছে।

—সৌদি আরবও সমস্ত নাগরিকদের উপর ব্যাপক নজরদারির ব্যবস্থা চালু করে রেখেছে, কিউবাও নির্দিষ্ট নাগরিকদের উপর ব্যাপক নজরদারির জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছে।

১০। ব্যতিক্রমী রূপায়ণ

সরকার এখন 'ব্যতিক্রমী রূপায়ণ' নামে অভিহিত ব্যবস্থা চালু করে যে কোনো নাগরিক বা নাগরিক নন এমন অধিবাসীকে বিদেশে নির্বাসিত করতে পারে।

—এই একই ব্যবস্থার জন্য সিরিয়া, সৌদি আরব, মিশর ও পাকিস্তান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কুখ্যাত।

যদিও ওবামা 'প্রতিরক্ষা অনুমোদন বিল'-এ স্বাক্ষর করার সময় ঘোষণা করেছেন যে, কোনো নাগরিককে অনির্দিষ্টকাল আটক রাখার ক্ষমতা তিনি ব্যবহার করতে চান না, কিন্তু একধরনের 'অনিচ্ছুক স্বৈরতন্ত্রী' হিসেবে তিনি ক্ষমতাগুলি গ্রহণ করেছেন। কোনো দেশ কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক হিসেবে চিহ্নিত হয় সেই ক্ষমতা আছে কিনা তাই দেখেই, সেই ক্ষমতার বাস্তব প্রয়োগ দিয়ে নয়। কোনো প্রেসিডেন্ট যদি তার নিজের কর্তৃত্ব ব্যবহার করে আপনার স্বাধীনতা বা জীবন কেড়ে নিতে পারে, কার্যত তখন সমস্ত নাগরিক অধিকারই পর্যবসিত হয় সেই কর্তৃত্বের ইচ্ছেধীন বিষয় হিসেবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান-প্রণেতারা বাস করতেন স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অধীনে, ফলে তাঁরা তার বিপদ সম্পর্কে আমাদের চেয়ে বেশি বুঝতেন। জেমস ম্যাডিসন তাই সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন : আমরা এমন একটি ব্যবস্থা চাই যা শাসকের শাসকের শুভেচ্ছা বা দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করবে না। "সমস্ত মানুষই যদি দেবদূত হয়ে যেতো, তবে আর কোনো সরকারের দরকারই হতো না।"

বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিনই একই বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন অনেক বেশি স্পষ্টভাবে। ১৭৮৭ সালে সংবিধান স্বাক্ষরিত হয়ে যাবার পর জনৈকা শ্রীমতী পাওয়েল তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কী মশায়, শেষ পর্যন্ত কী পেলাম আমরা— প্রজাতন্ত্র, না রাজতন্ত্র?" তিনি একটু বেশি তীক্ষ্ণভাবেই উত্তর দিয়েছিলেন : "প্রজাতন্ত্রই, অবশ্য আপনারা যদি তা বজায় রাখতে পারেন!"

৯/১১-র পর থেকে আমরা সেই সরকারই তৈরি করে চলেছি, ঠিক যেমনটি সংবিধান-প্রণেতারা আশংকা করেছিলেন— ব্যাপক ও মূলত নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতার অধিকারী একটি সরকার, এই প্রত্যাশা নিয়ে যে, তারা সুবিবেচনার সঙ্গে তা ব্যবহার করবেন।

সম্প্রতি চালু হওয়া 'প্রতিরক্ষা অনুমোদন বিল'-এ অনির্দিষ্টকাল আটক রাখার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তি অধিকাংশ নাগরিক অধিকার-বিশেষজ্ঞদের চোখেই ওবামা-র দ্বিচারিতা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। শোনা যাচ্ছিল, প্রেসিডেন্ট তাতে ভেটো দেবেন। এই বিলের অন্যতম প্রবক্তা লেভিন সত্যি কথাটা ফাঁস করে দিয়েছেন : হোয়াইট হাউস বরং অনির্দিষ্টকাল আটক রাখার ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ তুলে নেওয়াটাকেই সমর্থন করেছিলেন।

রাজনৈতিক নেতাদের অসততা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষদের কাছে কোনো নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু মূল প্রশ্নটা হচ্ছে : আমরা যখন বলি, আমাদের দেশ মুক্ত মানুষের দেশ, তখন আমরা নিজেদেরকেই ভাঁওতা দিচ্ছি কিনা!

q *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ ১৩ জানুয়ারি, ২০১২ প্রকাশিত নিবন্ধ

কত হাজার মরলে পরে মানবে তুমি শেষে

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

তিনি মৃত। তিনি নিহত। —না, এ জাতীয় কথা সংবাদপত্রের রিপোর্টে প্রযোজ্য হল না তাঁর ক্ষেত্রে। 'খতম কিষেণজি'— এই বিশেষণেই তাঁর মৃত্যুসংবাদ শিরোনাম হলো প্রথম শ্রেণীর দৈনিকে। কথা ওঠে, কথা হয় অনেকের সঙ্গে— অধিকাংশই যাঁরা, মধ্যবিত্ত চাকুরে, কিংবা শিক্ষাজীবী— স্বরসংগতি প্রত্যেকেরই লক্ষ্য করবার মতো— ঠিকই তো, যা হয়েছে— খুনির এমন সাজাই প্রাপ্য, ইত্যাদি।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যে কোনো সময়ে চোখ রাখুন— চলেছে যুযুধান প্রতিপক্ষের পাণ্ডিত্যপূর্ণ তরজা। আপনার সুশিক্ষিত পরিশীলিত মস্তিকের গোড়ায় শান দেবার মত উপাদান অবশ্যই মিলবে— আর থাকবে মুফতে পাওয়া সঙ্গের বিনোদটুকুও। পরদিন বেশ একটা বুদ্ধিজীবীসুলভ ভাব নিয়ে সহযাত্রী বা সহকর্মীদের মধ্যে প্রতিপক্ষের কোনো এক পক্ষ হয়ে— সকলেই বেশ সময় কাটিয়ে দেব। বিতর্ক দেখব, রোজ— বিতর্ক করব, কিন্তু কারও বিরাগভাজন হব না। ব্যাপারটা মনে মনে ভেবে একটা গর্বের অনুভূতিও হবে, একই বলে— গণতন্ত্র। চিন্তায়... বক্তব্যে আমাদের কতই ফারাক কিন্তু গণতন্ত্রের কোনো শর্তই আমরা ভাঙিনি। পেশাদারি হাসিতে মুখ ভরিয়ে করমর্দন সেরে বিদায় নেব সকলেই— আমি, আপনি এবং সঞ্চালক— সব পক্ষই। অজানা জঙ্গলঘেরা পরিবেশে পড়ে থাকবে শুধু সেই দিকশূন্যপুরের বাসিন্দা অসহায় নিঃস্ব কিছু কালো মানুষ আর তাদের কথা বলার জন্য কিছু রহস্যময় 'জীব'— সকলেই যারা প্রতিপক্ষ। যারা মরলে কিংবা যাদের মারলে কলমের ডগায় 'খতম' শব্দটি ছাড়া অন্য কোনও বিশেষণই উঠে আসে না।

একথা সত্যি কিষেণজি ও তাঁর অনুগামী সংগঠন প্রয়োজনে প্রাণহন্তারক হয়ে উঠতে পিছ-পা নন। হত্যা যে রাজনৈতিক দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ পথ তাকে নিন্দা বা সমালোচনা করার ক্ষেত্রেও শতকরা একশোভাগ অধিকার তাই আপনার আমার এবং আমাদের পবিত্র-গণতান্ত্রিক(!) রাষ্ট্রের আছে।

তবুও ঐ 'গণতন্ত্র'-ই বড় বালাই। যার আওতার মধ্যেই মুখ বুজে দেখে যেতে হয়— নিরন্ন, নিরাশ্রয়, উৎখাত ছিন্নমূল মানুষের পড়ে থেকে থেকে মৃত্যুর দিন গোনা। তাদের এ হেন অবস্থার প্রতি উদাসীন থাকা গণতন্ত্রেরই অন্যতম এক রূপ। আদিবাসী-জঙ্গলবাসী মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়ে মৃত্যু অথবা উচ্ছেদের যে মহামিছিল ইতিহাসের পথ ধরে রচিত হয়েই চলেছে— সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখাই যেন গণতন্ত্রের আবশ্যিক ধর্ম। একটু আধটু দাক্ষিণ্য কিংবা সেবা চলতেই পারে কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতার চোখে চোখ রেখে অধিকারের কথা বলা— নৈব নৈব চঃ। যদি সংযমের বাঁধ ভেঙে বলেই ফেলেন, কখনও— ঈশ্বরের নামে শপথ করে কিংবা গান্ধীর নামে কি রবীন্দ্রনাথের নামে কিংবা মাও সে-তুং-এর নামে— তবে আপনার মত সন্ত্রাসবাদী, বিচ্ছিন্নতাকামী, রাষ্ট্রদ্রোহী আর কে-ই বা আছে! আর একবার ঐ তকমা গায়ে বসে গেলে সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন আপনার ভাগ্যে নেই— মামলা কিংবা রাষ্ট্রীয় হামলার হাত এড়িয়ে। যেকোন সময়েই আপনারও নামের আগে বসে যেতে পারে— 'খতম' এই অভিধাটুকু। তারপরই টিকি দাড়ি নাড়া পণ্ডিতেরা বসে যাবেন, চ্যানেলে চ্যানেলে শুরু হবে চুলচেরা বিশ্লেষণ। দেখিয়ে দেওয়া যাবে, কতখানি বিপজ্জনক রকমের অগণতান্ত্রিক এইসব প্রতিবাদীরা; যেমনটি ছিলেন কিষেণজি আর তাঁর দল। বলা হবে— অস্ত্র না ধরে গণতান্ত্রিক পথেই তো চলতে পারত আন্দোলন— নেতানেত্রীরা ডাক দেবেন— মূল স্রোতে ফিরে আসার। দেখবেন, ঐ ডাকে কতটাই আত্মবিশ্বাস মিশে আছে। কেন না রাষ্ট্রনির্ধারিত পথই যে মূল স্রোত, তা তো সেই শৈশবেই মগজ ধোলাই করে ঢোকানো হয়েছে। এছাড়া আর সব পথই— ভুল স্রোত— তাই তো মূল স্রোতের কাণ্ডারীরা যৌথবাহিনী নামাবেনই।

এক কলসি জলের জন্য হেঁটে চলা— মাইলের পর মাইল— চলেছেন অরণ্যবাসীরা, অথবা সারাদিন শালপাতা কুড়িয়ে দশটি টাকার রোজগার— কিংবা যে আদিবাসীটিকে বাইরে থেকে দেখেই বুঝতে পারা যায় মানবশরীরে অস্থিসংখ্যা ২০৮; মূলস্রোতের কাণ্ডারীরা, জানা নেই সেসব নিয়ে ভাবেন কতটুকু সময়। ভাবলে হয়তো তারাও একবার বলে উঠতে পারতেন— না, আর নয়— আদিবাসীর শেষ আশ্রয় অরণ্য সাফাই করে জিন্দাল-মিত্তালদের কারখান করা যাবে না। যাবে না, খনিজের লোভে আবারও ঝাঁপিয়ে পড়ে সেখানকার মাটিকে নিঙড়ে নেওয়া— পরিবেশকে বিষিয়ে দেওয়া— বাঁধ তৈরি করে ছিন্নমূল মানুষের তালিকা আরও বাড়িয়ে চলা, এই সব থামাতেই হবে— জঙ্গলের মানুষকে নিজেদের বেঁচে থাকায় পূর্ণ অধিকার দিয়ে জঙ্গলেই থাকতে দিন।

যে দরিদ্র আদিবাসী মানুষ আমাদের রাস্তাঘাট, ব্যাঙ্ক, হোটেল রেস্তোরা— শপিংমলের দখলদারি চায়নি— আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি লালিত জীবনের দায়ভার নতুন করে আর তাদের উপর চাপিয়ে দেব না। না— বলিনি আমরা আগেও, বলতে শিখিনি— শিখলেও বলে উঠতে চাই না। আমরা জানি, রাষ্ট্রেরই কাছ থেকে চুঁইয়ে পড়া দাক্ষিণ্য নিয়ে— এই তো বেশ আছি। আমাদের ধারণা আর শতকোটি নিঃস্ব ভারতবাসীর

উন্নয়ন ধারণা— মিলবে না, মিলতে পারে না। এ যুদ্ধও তাই চলবে। নানান পন্থায় প্রতিরোধ করবে মানুষ। কিষেণজির 'খতম' বড়ো একটা ধাক্কা ঠিকই কিন্তু সমাজের কোথাও না কোথাও থেকে পৌঁছে যাবেন এমন অনেক সংবেদনশীল মানুষ, ফিরে ফিরেই যাঁরা শূদ্র জাগরণের কথা বলবেন— শেখাবেন অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, তা ছিনিয়েই নিতে হয়।

এবার একটা সাদাসাপটা প্রশ্ন রাখি গণতন্ত্রের মহাপূজারীদের প্রতি— মহাত্মা গান্ধী সারাজীবন সত্যের সন্ধানে যিনি অহিংসার পথ ধরেই করে গেলেন, সেনাপ্রধান কিংবা পুলিশপ্রধানদের মাথার উপর তাঁরই ছবি শোভা পায় কী করে? রাষ্ট্রের দ্বিচারিতা, তার নজির সমাজজীবনের কত অগণন ক্ষেত্রেই না প্রকট। গণতন্ত্র-গণতন্ত্র বলে গলা ফাটানো মানুষেরা নজির দেখান তো, এমন কতগুলি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে অহিংসার পথেই যেগুলি প্রতিষ্ঠিত— পারবেন না, কারণ তা হয়নি, হওয়াটা সম্ভবই নয়।

এত সবের পর একটা কথা আরও না বলে পারা গেল না— এই বঙ্গে অতীত থেকে সাম্প্রতিকের আর সব প্রশাসকের মতই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, আপনিও তাদের ফেলে যাওয়া জুতোয় পা গলিয়ে অবশেষে মৃত্যুদণ্ডেরই বিরোধী একটি সুপরিচিত মানবধিকার সংগঠনকেও হত্যার রাজনীতির ফেরিওয়ালা বলে চিহ্নিত করলেন; খুবই দুঃখজনক তবে এটাই সত্য। পুনরাবৃত্তি ইতিহাসের ধর্ম— তবে দ্বিতীয়বার কিন্তু সেটা হবার কথা প্রহসন হিসেবে।

বিশ্ব-পুঁজিবাদ কি গভীরতর সংকটের মুখোমুখি?

৮ পৃষ্ঠায় পর

প্রবৃদ্ধির হার আগে-হিসেব-করা ৩.৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে ধরা হয়েছে যথাক্রমে ২.৫ ও ৩.১ শতাংশ। উল্লেখ্য যে এই হার ৩ শতাংশের চেয়ে কমে গেলেই সাধারণত বিশ্ব-অর্থনীতিকে সংকটগ্রস্ত বলে ধরা হয়ে থাকে। ইউরোপ এখন সংকটগ্রস্ত, এবং উন্নত দেশগুলির সম্ভাব্য হার মাত্র ১.৪ শতাংশ।

সব মিলিয়ে, বিশ্ব-অর্থনীতির সংকটের তীব্রতা ২০০৮-এর সংকটের চেয়েও অনেক বেশি হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের মতে, "আসন্ন সংকটে উঁচু আয়বিশিষ্ট দেশগুলির ব্যাংকগুলিকে সংকটমুক্ত হবার জন্য আর্থিক সহায়তা করার (bailout) বা চাহিদা বাড়িয়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি নেই।" এমনকি যে চীনের উপর নির্ভরতা ২০০৮-এর সংকটমোচনে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল, সেই চীনেও প্রবৃদ্ধির হার গত বছরের ৯.২ শতাংশ থেকে এবছর ৮.৪ শতাংশে নেমে এসেছে, যা গত আড়াই বছরে সবচেয়ে কম।

সব মিলিয়ে, সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে ২০০৮-এর সংকট থেকে পুনরুজ্জীবন নয়, বরং তাকে সংকটের সূচনা মাত্র ধরে নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিকে তারই ধারাবাহিকতা বলে মনে করার কারণ রয়েছে —অর্থাৎ বিশ্ব-অর্থনীতির সংকটের তীব্রতা ক্রমশ বেড়েই চলবার এবং শত শত কোটি মানুষের চাকরি ও জীবনযাত্রার মান আরও বিপন্ন হয়ে পড়বার আশংকা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে।

দীপ্র চৌধুরী

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় স্মরণে

নারী আন্দোলনের নেত্রী, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথী মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি প্রয়াত হলেন। নারীদের ওপর সমাজ ও পরিবারের অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য তিনি তাঁর সাথীদের সঙ্গে গড়ে তোলেন 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ'। তাঁর নিজের বাড়িতে গড়ে তোলা এই সংগঠন কত বিপন্ন নারীকে আশার আলো দেখিয়েছে, তার হিসেব কেউ রাখেনি। নারী-মুক্তি বিষয়ক বেশ কয়েকটি বহু পঠিত গ্রন্থের রচয়িতা, অনেকের প্রিয় মৈত্রেয়ীদি ছিলেন এক বহু বর্ণের মানুষ। প্রথিতযশা সংগীত সমালোচক, ব্যক্তি জীবনে কোমল হৃদয়ের অধিকারী মৈত্রেয়ী অন্যায়,অবিচার আর অসাম্য-র বিরুদ্ধে তীব্রভাবে মত প্রকাশ করতেন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে, অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও ছিলো তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার নারী আন্দোলনের একটি পর্বের সমাপ্তি ঘটলো বলা যায়। অনীক তাঁর স্মৃতির প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছে।

একচেটিয়া পুঁজির আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠা

জন বেলামি ফস্টার, রবার্ট ডবলিউ ম্যাকচেসনি ও আর জামিল জোনা

১৯৯৭ সালে 'বিশ্বায়নের ওপর বেশ (বা কম) কিছু' প্রবন্ধে পল সুইজি ''১৯৭৪-৭৫ সালের মন্দা থেকে শুরু করে পুঁজিবাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্তর্নিহিত তিনটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতার'' কথা বলেছিলেন: ''(১) বৃদ্ধির মোট হার কমে আসা; (২) বিশ্ব জুড়ে একচেটিয়া (অথবা অলিগোপলি) ধরনের বহুজাতিক কর্পোরেশন বেড়ে চলা; এবং (৩) যাকে বলা চলে পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়ার আর্থিকীকরণ।'' (তিনি বলেছিলেন, বিশ্বায়ন কোনো নতুন প্রবণতা নয়, পুঁজিবাদের পুরো ইতিহাস জুড়ে চলেছে এই প্রক্রিয়া।) এই তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথমটি ও তৃতীয়টি— ধনী দেশগুলিতে অর্থনৈতিক স্থবিরতা (stagnation) এবং সঞ্চয়ের আর্থিকীকরণ— ২০০৭-০৯ সময়কালের ভয়ানক আর্থিক সংকট শুরু থেকে সর্বত্র আলোচিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রবণতাটি, যাকে বলা চলে ''একচেটিয়া পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ'', তার প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে কম। বলা চলে যে, প্রধান বা নয়া উদারনৈতিক ব্যাখানে, বামপন্থীদের চিন্তার মধ্যেও যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, ধরে নেওয়া হয় যে একচেটিয়াকরণের প্রবণতার অবসান ঘটেছে। এই চিন্তা অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যত্র সোভিয়েত-উত্তর বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অলিগপলি ধরনের কাঠামো ভেঙ্গে গেছে, তার জায়গায় এসেছে বিশ্বজোড়া তীব্র প্রতিযোগিতার নতুন যুগ।

এই সব ধারণা যে একেবারে ভুল, এমন কোনো বিতর্ক আমরা তুলতে চাইছি না। আমরা বরং বলছি যে, ১৯৭০-এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা যে নতুন করে দেখা গেল তা যতটা ভাবা হয় তার থেকে অনেকটাই সীমাবদ্ধ। তার পরবর্তী কালে বিশ্বজোড়া একচেটিয়া লগ্নি-পুঁজির এক নতুন পর্ব দেখা দেয়, যখন বিশ্বের উৎপাদন দিন দিন আরো বেশি করে যথেষ্ট একচেটিয়া ক্ষমতা রয়েছে এমন কতিপয় বহুজাতিক কর্পোরেশনের আধিপত্যাধীন হয়ে পড়ছে। সংক্ষেপে, আন্তর্জাতিক অলিগপলির (কয়েকটি মাত্র সংস্থা কর্তৃক বাজারের দখল নেওয়া— অনুবাদক) একটি ব্যবস্থা এখন আমাদের সামনে। কিছু উদাহরণ ও ব্যাখ্যা সহ আমাদের বক্তব্যের মূল কথাগুলি রাখছি। সন্দেহ নেই যে এসব নিয়ে আমাদের বক্তব্য যত প্রশ্নের জবাব দেবে তত নতুন প্রশ্ন তুলবে। শ্লথগতি প্রবৃদ্ধি ও পরিণত অর্থনীতিগুলির আর্থিকীকরণ সহ বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবণতাগুলি বোঝার ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের প্রশ্নটি যে অবশ্যপ্রয়োজনীয়, সেটি দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য।

আমরা যা বলব তা অবশ্য আমাদের সব পাঠকদের কাছে নতুন কিছু নয়। একচেটিয়া পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের প্রমাণ কয়েক দশক ধরেই বেড়ে চলছিল। ১৯৭৪ সালে *গ্লোবাল রিচ: দ্য পাওয়ার অফ দ্য মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন* বইয়ে রোনাল্ড ম্যুলার লিখেছিলেন: ''বিশ্বব্যাপী কর্পোরেশনগুলির উত্থান অলিগপলি পুঁজির বিশ্বায়ন সূচিত করছে।... নতুন কর্পোরেট কাঠামো ঘনীভবন ও আন্তর্জাতিকীকরণের প্রক্রিয়ার ফল, যা (ঘনীভবন ও আন্তর্জাতিকীকরণ) অর্থনীতিকে কয়েকশো বাণিজ্য গোষ্ঠীর অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে, এই গোষ্ঠীগুলি ধ্রুপদী বাজারের চিরাচরিত রীতিনীতি মেনে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে না।''

অলিগপলিগুলির ক্ষেত্রে, যেখানে শিল্পের নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে কয়েকটি মাত্র সংস্থার আধিপত্য, সেখানে ধ্রুপদী অর্থে প্রতিযোগিতা দেখা যায় না। বরং দেখা যায় বিরোধিতা ও হাত মেলানোর এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। বিশেষ করে ''দাম নিয়ে প্রতিযোগিতা'' বা বাণিজ্যের ভাষায় ''দাম-যুদ্ধ''-কে দেখা হয় অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার হিসাবে। দৈত্যাকার কর্পোরেশনগুলি সাধারণত এই দাম-যুদ্ধকে এড়িয়ে চলে। তার বদলে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা অন্য সব রূপ ধারণ করে: কম খরচের জায়গা খুঁজে বের করা, ব্যবসার ক্ষেত্রে যা এখনো আসল কথা; সম্পদ ও বাজারের জন্য প্রতিযোগিতা; এবং পণ্যের ভিন্নতা।

আজকের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থা হবে একচেটিয়া প্রবণতাবিশিষ্ট বহুজাতিক কর্পোরেশন— এমন একটি সংস্থা যা বহু দেশে কাজ করে, যদিও তার সদর দপ্তর একটি দেশে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির পরিধির দিকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই কোম্পানিগুলির সদর দপ্তর সাধারণত কেন্দ্রের ধনী দেশগুলিতে (সংস্থাগুলি যত বড় এই প্রবণতা তত বেশি)। জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন কনফারেন্স (UNCTAD)-এর ২০১০ সালের বিশ্ব বিনিয়োগ রিপোর্টে বলা হয়েছে: ''বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় ১০০টি বহুজাতিক কর্পোরেশনের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিশক্তিই (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপান) প্রাধান্যের জায়গায় থেকে যাচ্ছে'', যদিও ''তাদের অংশ ধীরে ধীরে কমছে''।

বিশ্বয়িত (global) কর্পোরেশনগুলির এক মূলধারার বিশ্লেষক মার্ক ক্যাসন ১৯৮৫ সালে বলেছিলেন: ''দীর্ঘকালীন বিচারে যুদ্ধ-পরবর্তীকালের বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে দেখা যায়

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজির ঘনীভবনের সর্বাধুনিক ও সবচেয়ে পরিশীলিত উদাহরণ হিসাবে। এই ধারণাটা সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায় লেনিনের লেখা (*সাম্রাজ্যবাদ: পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়*) থেকে।''

আজ এই প্রবণতাটি সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ পায় আন্তর্জাতিক অলিগপলির বৃদ্ধিতে। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য ইতিহাসের অধ্যাপক লুই গালামবোস বলেছেন, ''বিশ্ব অলিগপলিগুলি সূর্যোদয়ের মতোই অবশ্যম্ভাবী।''। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ১৯৯৯ সালে বলেছে:

''শিল্পের পর শিল্প ঘনীভূত হয়ে একজোট হওয়াটা যেন ছিল অমোঘ। ...বিশ্ব অটোমোবাইল শিল্প ৬টা বা ৮টা কোম্পানিতে ঘনীভূত হচ্ছে। দুটি মার্কিন গাড়ি কোম্পানি, দুটি জাপানি আর কয়েকটি ইউরোপীয় কোম্পানিই সম্ভবত টিকে থাকবে। বিশ্বের প্রধান সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানির সংখ্যা বড়জোর এক ডজন। বিশ্বের রেকর্ড করা গানবাজনার জোগানদার বলা চলে চারটি কোম্পানি। বিশ্বের ঔষধ শিল্পে আধিপত্য দশটি কোম্পানির, আর বিভিন্ন কোম্পানি একীভবনের ফলে সংখ্যাটি আরো কমবে, যদিও এই দৈত্যাকার কোম্পানিদেরও ভয় যে সারা বিশ্বে প্রতিযোগিতা করার পক্ষে তারা খুব ছোট। নরম পানীয় (সফ্‌ট ড্রিংক) বাণিজ্যে তিনটি মাত্র কোম্পানি, আর গত জানুয়ারিতে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট কোম্পানি ক্যাডবেরি সোয়েপস পিএলসি তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের খানিকটা ঐ বাণিজের সর্ববৃহৎ কোম্পানি কোকা-কোলাকে বিক্রি করে দিয়েছে। বাণিজ্যিক উড়োজাহাজের বিশ্বজোড়া বাজার চালায় স্রেফ দুটি কোম্পানি— বোয়িং আর এয়ারবাস ইন্ডাস্ট্রিস।''

সর্বত্রই একই প্রবণতা: টেলিযোগাযোগ, সফ্‌টওয়্যার, টায়ার ইত্যাদি সর্বত্র। ২০০৭ সাল পর্যন্ত বিশ্বজোড়া কোম্পানিগুলির একীভবন ও কোম্পানি কিনে নেওয়ার একটা রেকর্ড তৈরিতে (চিরকালের রেকর্ড, ৪.৩৮ লক্ষ-কোটি ডলার), প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের দারুন বৃদ্ধিতে (বিশ্বের আয় বৃদ্ধির চেয়ে বেশি দ্রুতগতিতে তা বেড়েছে) তা প্রতিফলিত। এভাবে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ইনওয়ার্ড স্টক ১৯৮০ সালে যা ছিল বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৭ শতাংশ, তা থেকে বেড়ে হয়েছে ৩০ শতাংশ, আর এই উর্ধ্বগতি চলেছে ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিক পর্যন্ত।

এই সংখ্যাগুলোও কিন্তু বহুজাতিকদের ক্ষমতা পুরোটা দেখাতে পারে না, কারণ তাদের মধ্যেকার গোপন বোঝাপড়া, রণনীতিগত মৈত্রী ও প্রযুক্তিগত চুক্তির কথা তাতে থাকে না— যেগুলি বিশ্বে এইসব কোম্পানির হাত অনেক লম্বা করে দেয়। থাকে না বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি যে বিরাট পরিমাণে সাবকন্ট্রাক্টিং করে বিশ্ব অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে হাত বাড়িয়েছে, সে কথাও। এই সমস্ত ও অন্যান্য উপায়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির দ্রুত বৃদ্ধি আরো ঘনীভূত বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলছে— সবচেয়ে বড় পাঁচশোটি কোম্পানির আয় এখন বিশ্বের মোট আয়ের ৩৫-৪০ শতাংশ।

দৈত্যাকার কর্পোরেশনগুলি যত আরও বেশি বেশি একটা নয়, কুড়িটি বা পঞ্চাশটি বা আরো বেশি দেশে কাজ করতে শুরু করেছে, উৎপাদনও এখন হতে শুরু করেছে বিশ্ব জুড়ে। ...এমনকি ১৯৯০ সালেও বিশ্বের প্রধান একশোটি অ-আর্থিক বহুজাতিক কোম্পানির মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের একটু বেশি ও মোট বিক্রয় ও কর্মসংস্থানের অর্ধেকের কম ছিল তাদের বিদেশি অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলি থেকে পাওয়া। তখনও উৎপাদনের বেশিরভাগটাই হতো তাদের নিজেদের দেশে তাদের সদর দপ্তরে। ২০০৮ সালে এসে কিন্তু সেই একশোটি বিশ্বজোড়া কর্পোরেশনের ৬০ শতাংশ উৎপাদন ও কর্মসংস্থান এবং ৬০ শতাংশের বেশি বিক্রয় হচ্ছে তাদের বিদেশি অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলিতে।

সাম্প্রতিক কয়েক দশকে মার্কিন দৈত্যাকার কর্পোরেশনগুলি সত্যিই বিশ্বজোড়া উৎপাদন শুরু করেছে। বিশ্বজোড়া ১০০টি প্রধান বহুজাতিকের মধ্যে ১৮টি মার্কিন কোম্পানির মোট সম্পদ, বিক্রয় ও কর্মসংস্থানের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে (মার্কিন দেশের ভেতরকার বাজার এত বড় আর একশোটি বড় বহুজাতিক কোম্পানিকে যেহেতু তাদের বিদেশি অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলির সম্পদের বিচারে রাখা হয়েছে, মাত্র ১৮টি মার্কিন কোম্পানি এই তালিকায় স্থান পেয়েছে): সমস্ত মার্কিন অ-আর্থিক বহুজাতিক কর্পোরেশনের সম্পদের ১৬ শতাংশ, বিক্রয়ের ২৮ শতাংশ ও কর্মসংস্থানের ২৩ শতাংশ করে থাকে এই ১৮টি কর্পোরেশন। এই ১৮টি বহুজাতিক কোম্পানির মোট সম্পদের অর্ধেক বা তার বেশি হলো তাদের বিদেশি অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলির। এর অর্থ, এই কর্পোরেশনগুলি বিশ্বজোড়া অলিগপলি ধরনের প্রতিযোগিতায়/দ্বন্দ্বে গভীরভাবে লিপ্ত।

২০০০ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে সবচেয়ে ওপরের একশো কর্পোরেশনের মধ্যে থাকা মার্কিন কর্পোরেশনগুলির অধিকাংশের ক্ষেত্রেই তাদের বিদেশি অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলি সম্পদ, বিক্রয় ও কর্মসংস্থানের অংশ বেশ বেড়েছে। দু-একটি উদাহরণ দেখা যাক। জেনারেল ইলেকট্রিকের ক্ষেত্রে তাদের বিদেশি অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলির সম্পদ, বিক্রয় ও কর্মসংস্থানের অংশ ২০০০ সালে ছিল যথাক্রমে ৩৬ শতাংশ, ৩৮ শতাংশ ও ৫৩ শতাংশ। তা বেড়ে ২০০৮ সালে দাঁড়িয়েছিল ৫০ শতাংশ, ৫৩ শতাংশ ও ৫৩ শতাংশ। এর ফলে এখন জেনারেল ইলেকট্রিক মূলত মার্কিন নয়, বিশ্বায়িত উৎপাদন সংস্থা। ফোর্ডের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত হারগুলি বেড়েছে আরো নাটকীয়ভাবে। সম্পদের ক্ষেত্রে ৭ শতাংশ থেকে ৪৬

শতাংশ, বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ৩০ থেকে ৫৯ শতাংশ, ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ৫৩ থেকে ৫৮ শতাংশ। ২০০৮ সালে তাই ফোর্ডের মূল কোম্পানিটি ছিল বিক্রয় ও কর্মসংস্থানের মাত্র ৪০ শতাংশের সামান্য বেশির জন্য দায়ী। ২০০৮ সালে কোকাকোলার মোট কর্মীর ৮৬ শতাংশ ছিল বিদেশি অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলি নিয়োজিত।

এই সংস্থাগুলি মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলির আন্তর্জাতিকীকরণের চরম রূপ প্রকাশ করে। সমস্ত মার্কিন বহুজাতিকগুলিকে ধরলে (বড় ও ছোট, আর্থিক ও অ-আর্থিক) ২০০৮ সালে মার্কিন মূল সংস্থাগুলি এখনো মোট মূল্য সংযুক্তি, পুঁজি-ব্যয় ও কর্ম সংস্থানের দুই-তৃতীয়াংশের বেশির জন্য দায়ী আর বিদেশি অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলি দায়ী এগুলির এক-তৃতীয়াংশের কমের জন্য। তা হলেও ২০০৮ সালে দেখা যাচ্ছে, মূল্য সংযুক্তির ক্ষেত্রে মূল কোম্পানি অংশ আগের দুই দশকে ১০ শতাংশ কমে গেছে। এর থেকে মনে হয়, সব মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলিকে ধরলে তাদের আন্তর্জাতিকীকরণ বাড়ার প্রবণতা ভালোমতোই আছে।

আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির ঘনীভূত অর্থনৈতিক শক্তি এছাড়াও প্রকাশিত হয় তাদের বিভিন্ন ধরনের স্ট্র্যাটেজিক জোট গঠন থেকে। এ জন্যই ২০০১ সালে মর্গান স্টানলি ডিন উইটারের বরিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ জোসেফ কুইলান 'জোট পুঁজিবাদ (Alliance Capitalism)' কথাটি তৈরি করেছেন। কুইলান লিখেছেন, ''প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ও বাণিজ্য হলো বিশ্বজোড়া কাজকর্মের প্রাথমিক (প্রধান) উপায়, যদিও একমাত্র উপায় নয়।'' অন্যান্য উপায়ের মধ্যে রয়েছে ''সাবকনট্রাক্টিং চুক্তি, ম্যানেজমেন্ট চুক্তি, টার্ন-কী চুক্তি, ফ্রাঞ্চাইজি, লাইসেন্স দেওয়া, উৎপাদন ভাগ করে নেওয়া। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলো... রণনীতিগত জোট তৈরি ও অংশীদারিত্ব, বিশেষ করে কিছু কিছু শিল্পে এগুলি প্রায় বিশ্বব্যাপী শিল্পের একীভবন ও সংস্থা কিনে নেওয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।'' ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে যেমন ফোর্ড বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী, উৎপাদনপ্রযুক্তি সরবরাহকারী, যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী ও অন্যান্য গাড়ি উৎপাদক কোম্পানির সাথে দুনিয়া জুড়ে ডজন ডজন প্রযুক্তি চুক্তি করেছে।

বিশ্বের প্রধান প্রধান বিমান চলাচল কোম্পানিগুলি ''মিলে গিয়ে কয়েকটি বিশাল জোট'' তৈরি করেছে। ...তার ফলে তৈরি হলো, বলা যায়, একটিমাত্র আধিপত্যকারী কোম্পানি, ইউনাইটেড-এর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী অনেক বিমানের একটি বাহিনী। এ ধরনের বড় বড় জোট গঠন আন্তর্জাতিক অলিগপলিকেই জোরদার করতে সাহায্য করে।

''এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি শক্তিধর কোম্পানিগুলির একটি, মাইক্রোসফ্টও, বিভিন্ন রণনীতিগত জোট তৈরি করে (এরিকসন, ব্রিটিশ টেলিকমিউনিকেশন্‌স, টেলমেক্স ও অন্যদের সঙ্গে)।... অন্য অনেক কোম্পানির মতো মাইক্রোসফ্টও নিজেকে একটি বিশ্বজোড়া বাহিনীর মধ্যস্থলে দেখতে চায়, যাতে করে বিশ্বজোড়া সম্পদের ওপর তাদের আধিপত্য তৈরি হয়।''

বিশ্ব বাণিজ্যের একটা বড় অংশ এখন বহুজাতিক কোম্পানিগুলির আউটসোর্সিং-এর আধিপত্যে। একটা খসড়া হিসাব অনুসারে, বিশ্ব বাণিজ্যের অন্তত ৪০ শতাংশ আউটসোর্সিং-এর সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে একটা বড়ো অংশ হলো সাব-কনট্রাক্টিং। জাতিসংঘের হিসাব অনুসারে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সাবকন্ট্রাক্টিং চুক্তির সংখ্যা এখন লক্ষ লক্ষ। বিশ্বায়িত কর্পোরেশনগুলি ও তাদের অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলি এখন একক-প্রতি শ্রম-ব্যয় কমানোর জন্য সাবকন্ট্রাক্টকদের ওপর নির্ভর করে। একটা বহুচর্চিত উদাহরণ হলো *নাইকি*। এটি একটি ''ফাঁপা কর্পোরেশন''। তাদের পুরো উৎপাদনটাই হয় এশিয়ায় বিভিন্ন দেশে, যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে, বিভিন্ন সাবকন্ট্রাক্টরদের কাছে। ১৯৯৬ সালে একটি *নাইকি* জুতোর ৫২টি অংশ তৈরি হতো পাঁচটি দেশের নানা সাবকন্ট্রাক্টরের হাতে।

সাবকন্ট্রাক্টর ব্যবহার করার ফলে উৎপাদনের সঙ্গে এদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না। তার ফলে *নাইকি* শ্রমিকদের ওপর চরম ধরনের জুলুম করার সুযোগ পায়, অথচ এ ধরনের স্থূল শোষণের সঙ্গে জড়িত সমালোচনা সরাসরি তাদের গায়ে লাগে না।

ব্যবসায় টিকে থাকতে হলে *নাইকি*-র অলিগপলি-প্রতিদ্বন্দ্বী *রিবক*-ও একই রকম মোটা মুনাফা অর্জন করতে হলে একক-প্রতি শ্রম-ব্যয় কমাতে একই ধরনের আউটসোর্সিং ও সাবকন্ট্রাক্টরদের কারখানায় একই ধরনের নিপীড়ন ব্যবহার করতে বাধ্য।

ফরাসি রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ বিয়াট্রিস অ্যাপে বলছেন, যত ''বেশি বেশি কোম্পানি রণনীতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম বাইরে পাঠাতে থাকে'', প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বা প্রত্যক্ষ মালিকানার ওপর তাদের নির্ভরশীলতা কমতে থাকে, ''সাবকন্ট্রাক্টিং-এর মাধ্যমে উচ্চ মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ'' বজায় রাখতে থাকে তারা। তা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করে বহুজাতিক কর্পোরেশনের সংজ্ঞায় এই প্রবণতার কথা ধরা থাকে না, নিয়ন্ত্রণের সব ধরনের পরোক্ষ ধরন এতে অনুপস্থিত থাকে। আর তাই বহুজাতিকের ক্ষমতার সম্পূর্ণ ব্যাপ্তি এতে ধরা পড়ে না। *নাইকি* বা *অ্যাপল*-এর (এরা এদের উৎপাদন চীনে সাবকন্ট্রাক্ট দেয়) মতো সংস্থাকে সঠিকভাবেই একচেটিয়া ধরনের বহুজাতিক কর্পোরেশন হিসাবে দেখা হয়— প্রকৃত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ তেমন না থাকলেও আন্তর্জাতিক কার্যকলাপ ও সরবরাহকারী সংস্থাগুলির ওপর রণনীতিগত নিয়ন্ত্রণের

মাধ্যমে এরা বিশাল মুনাফা কামায়।

এছাড়াও, জেনারেল ইলেকট্রিকের মতো, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বেশি এমন অনেক সংস্থাও বড় ধরনের আন্তর্জাতিক সাবকন্ট্রাক্ট দেয়। যেমন জেনারেল ইলেকট্রিক বৈদ্যুতিন যন্ত্রাংশের সরবরাহের সিঙ্গাপুরের সাবকন্ট্রাক্টর ফ্লেক্সট্রনিক্স ও চীনের কেলোন-এর উপর নির্ভরশীল। বিশ্বজোড়া সাবকন্ট্রাক্টিং-এর একটা সাধারণ ধর্ম এই যে, একটা সাবকন্ট্রাক্টর একই সঙ্গে অনেকগুলি দৈত্যাকার কর্পোরেশনের জন্য কাজ করে, সেক্ষেত্রে সম্পর্কটা জোট বাঁধার, প্রতিযোগিতার নয়।...

আন্তর্জাতিক অলিগপলি-কে বোঝার ক্ষেত্রে বাধা

অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ওপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আলোচনা এমনভাবে ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ওপর সীমাবদ্ধ থাকে যে আসলে যে একচেটিয়া ধরনের বিশ্ব অর্থনীতি তৈরি হচ্ছে সেটা সবার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে, এমনকি বামপন্থীদেরও। আন্তর্জাতিক অলিগপলি ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা/গোপন আঁতাত হওয়ার দিকে যে বিশ্ব অর্থনীতি এগিয়ে চলেছে সেটা বোঝা এতো কঠিন হওয়ার কারণ আমাদের চিন্তায় পাঁচটি সাধারণ বাধা। (১) অর্থনৈতিক বর্গগুলিকে আন্তর্জাতিক অভিব্যাক্তির বদলে জাতীয় অভিব্যক্তিতে ভাবা; (২) কর্পোরেট ক্ষমতার বিশ্লেষণ না করে "বাজার"-রতি; (৩) যাকে আমরা বলি "প্রতিযোগিতার দ্ব্যর্থতা"; (৪) আর্থিকীকরণ ও নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তির ফলে বিশ্বজোড়া অপ্রতিরোধ্য প্রতিযোগিতার জন্ম হয়েছে— এরকম একটা ভাবনা; এবং (৫) আন্তর্জাতিক স্তরে বর্গ বিষয়ে একটি সাধারণ ভুল ধারণা যাতে বিভিন্ন পুঁজির মধ্যেকার প্রতিযোগিতাকে শ্রমিকদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়।

কোনো জাতি-রাষ্ট্র, বিশেষ করে যারা দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্বের অর্থনীতিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য ভোগ করে আসছে সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আলোচনা করার সময় ধরে নেওয়া হয় যে যখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সেই দেশের শ্রম ঘনত্বের ওপর বা তাদের একচেটিয়া দখলে হাত দেয় তখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বাড়ছে। এর সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহণ হলো বিদেশি, বিশেষত জাপানি কোম্পানির আক্রমণে ডেট্রয়টে মার্কিন গাড়ি উৎপাদকদের শক্তপোক্ত অলিগপলির দুর্বল হয়ে পড়া। কিন্তু এটা বিশেষ ভাবা হয় না যে এই দুর্বল হয়ে পড়ার ঘটনাটি ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উৎপাদনের ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবনের দিকে এগিয়ে চলার অংশ।

১৯৯৪ সালে *ট্রাম্ফ অফ অলিগপলি* গ্রন্থে গালামবোস লিখেছেন, ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে "বিভিন্ন শিল্পে মার্কিন কোম্পানিগুলি যখন মুখ থুবড়ে পড়ল তখন নতুন নতুন বিশ্ব অলিগপলির জন্ম হতে থাকল... এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল যাই হোক না, খুব সম্ভবত যা তৈরি হবে তা হলো বিশ্ব-অলিগপলি।" প্রকৃতপক্ষে এখন বিশ্বের মোট গাড়ি উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক করে পাঁচটি বহুজাতিক সংস্থা, যার দুটি মার্কিন (জেনারেল ইলেকট্রিক ও ফোর্ড)। আর দশটি কোম্পানি মিলে উৎপাদন করে বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৭০ শতাংশ। গাড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্ব জুড়ে এখন অলিগপলির রাজত্ব, প্রধান প্রধান কোম্পানি-গুলি সবারই কার্যক্রম বিশ্বজোড়া।

আমাদের চিন্তাভাবনায় দ্বিতীয় যে বাধাটি আছে তা হলো নৈর্ব্যক্তিক অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রবাহের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সম্পর্কের সাধারণ নামকরণ— বাজার। এতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দৈত্যাকার কর্পোরেশনগুলির ভূমিকাকে উপেক্ষা করা হয়। আজকের অর্থনৈতিক তত্ত্বে মুক্ত বাজারের ধারণার সত্যিকারের বিশেষ অর্থ নেই, কেবল মাত্র এটুকু অর্থ আছে যে তা বাহ্যত রাষ্ট্রকে হিসাবের বাইরে রাখে, আর প্রকৃতপক্ষে হিসাবের বাইরে রাখে অর্থনীতিতে সমস্ত ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাকেই, যেমন দৈত্যাকার কর্পোরেশনগুলির ভূমিকাকে। তৃতীয়ত, আমাদের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা হলো প্রতিযোগিতার ধারণাটিকে নিয়ে ধোঁয়াশা। অর্থনীতিতে এর অর্থ এক আর সাধারণ কথাবার্তায় (এবং ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও) তার অর্থ ভিন্ন। অর্থনৈতিক তত্ত্বে, প্রকৃত অর্থে প্রতিযোগিতা নির্ভর করে বাজারের ওপর যাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এমন ধরনের বিরাট সংখ্যক ছোট সংস্থা থাকার ওপর। অন্য প্রতিযোগীরা থাকলেও তারা হবে অজানা, অনামা। সে কারণে সংস্থাগুলির মধ্যে সরাসরি বৈরিতা বিশেষ থাকে না। এভাবে দেখলে মিলটন ফ্রিডম্যান সহ বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ যেমন দেখিয়েছেন যে, আজকের দিনে প্রতিযোগিতা বলতে সাধারণত যা বোঝানো হয় অর্থাৎ অলিগপলিস্ট বাজারে যে চরম বৈরিতার সম্পর্ক দেখা যায়, সেটি অর্থনীতির বিচারে প্রতিযোগিতার চেয়ে একচেটিয়ারই কাছাকাছি। সে কারণেই "প্রতিযোগিতা নিয়ে দ্ব্যর্থতা"।

প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের অলিগপলি ধরনের বৈরিতা (যাকে ভুল করে সাধারণ প্রতিযোগিতা মনে করা হয়) হলো গোপন আঁতাতের দিকে এক প্রবণতা, বিশেষত যেখানে দৈত্যাকার সংস্থাগুলির মধ্যে দাম নিয়ে ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতার ভয় আছে।... একটি পরিণত শিল্পে বড় বড় সংস্থাগুলি পুরোপুরি প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং খানিকটা অলিগপলি-প্রতিযোগী, যারা জোসেফ সুম্পিটারের ভাষায় "সংশোধনমূলক মূল্য নির্ধারণ (করেস্পেকটিভ প্রাইসিং)" করে থাকে। দাম কমানোর আগে তারা জানে যে প্রতিদ্বন্দ্বীও তাই করবে। এই ধরনের দাম-যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক চরিত্রের কারণে প্রবণতা দেখা যায় দামের ক্ষেত্রে গোপন আঁতাত— ব্যারন ও সুইজি যেমন বলেছেন। এই

ধরনের ঘনীভূত শিল্পে দাম খুব বেশি কমানোর ঘটনা দুর্লভ, বরং জোট বেঁধে দাম বাড়ানোর ঘটনা ঘটে থাকে, সব চেয়ে বড় কোম্পানিটিই সাধারণত দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে।

আমাদের যুক্তি এই যে বিশ্ব স্তরে ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবন এবং বিশ্বের উৎপাদনের ক্ষেত্রে যাদের আধিপত্য প্রতিদিন বাড়ছে সেই বহুজাতিক কর্পোরেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি— এর ফলে প্রতিযোগিতার চরিত্র বদলে গেছে— শুধু জাতীয় স্তরে নয়, এখন আন্তর্জাতিক স্তরেও। তাই ১৯৯৫ সালে *ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন ইউনাইটেড স্টেটস* গ্রন্থে এডওয়ার্ড গ্রাহাম ও পল ক্রুগম্যানের কাছে একটা বড়ো মাত্রা পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হলো "অলিগপলিস্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতার' ফল। আজকে নতুন আধিপত্যকারী সংস্থাগুলি উৎপাদন ও বণ্টনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রণনীতিগত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আরো বেশি একচেটিয়া সুবিধা পেতে চায়। কিন্তু সত্যিকারের দাম-প্রতিযোগিতা তারা চায় না— শুধু জাতীয় স্তরে নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও।

আমাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে চতুর্থ বাধাটি হলো এই ধারণা যে আর্থিক প্রবৃদ্ধি ও যোগাযোগের নতুন নতুন প্রযুক্তি একচেটিয়া/অলিগোপলির প্রবণতা কমিয়ে বাজারে প্রতিযোগিতা অনেক বাড়িয়েছে। কিন্তু আর্থিকীকরণ ও কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার আসলে দৈত্যাকার কর্পোরেশনগুলির বিকশিত ও পরিণত হওয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। লগ্নি পুঁজিই আধুনিক কর্পোরেশনগুলিকে সম্ভবপর করে তুলেছে ও পুঁজির কেন্দ্রীভবনের হার বাড়িয়েছে, বিশেষ করে সংযুক্তি ও ক্রয়ের মাধ্যমে। বিশ্বজোড়া একচেটিয়া লগ্নি-পুঁজির আজকের দিনে, লগ্নি পুঁজি, যা একদিন অর্থনৈতিক শক্তিগুলিকে সংহত করতে সাহায্য করেছে, তা আজ বিশ্ব স্তরে কর্পোরেটদের সংহত করতে সাহায্য করছে। তাছাড়া, আর্থিক কর্পোরেশনগুলি নিজেরাই ক্রমশ বিশ্বব্যাপী আরো ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবনের সামনে পড়ছে, পুঁজি কর্তৃক জাতীয় সীমানা অতিক্রম করার অংশ হয়ে উঠছে তারা। যে তথ্য প্রযুক্তি এতদিন সবাইকে সমান করে দিচ্ছিল তাতেও আজ বিশ্বজোড়া একচেটিয়াকরণ চলছে, তার ফলে একচেটিয়া প্রবণতা সাধারণভাবে আরও জোরদার হচ্ছে।

বিশ্বজোড়া একচেটিয়াকরণের প্রবণতা বোঝার ক্ষেত্রে শেষ বাধা হলো একটি সাধারণ বর্গগত ভুল, যেখানে *বিভিন্ন সংস্থার মধ্যেকার প্রতিযোগিতা,* অর্থনীতিবিদরা প্রতিযোগিতা নিয়ে আলোচনা করার সময় যে প্রতিযোগিতার কথা ভাবেন, আর *শ্রমিকদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতাকে* গুলিয়ে ফেলা হয়। কর্পোরেটরা ভাগ-করো-ও-শাসন-করো কর্মনীতির মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরে শ্রম বাজারে সুবিধা পেতে চায়। এই বাস্তবতা থেকে তারা সুবিধা পায় যে পুঁজির বিশ্বজোড়া চলাচলের সুবিধা রয়েছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক বিভিন্ন কারণে শ্রমের সে সুবিধা নেই। তার ফলে, শ্রমিকরা ক্রমশ বেশি বেশি করে কর্মসংস্থান ও মজুরির ক্ষেত্রে বিশ্বজোড়া প্রতিযোগিতার চাপ অনুভব করছেন। আর মজুরি ও কাজের জায়গার সুযোগসুবিধা যখন সবনিম্নে, দৈত্যাকার পুঁজির মুনাফা তখন দিন দিন বাড়ছে। মূলধারার বা র‍্যাডিক্যাল কোনো অর্থনীতিতেই শ্রমিকদের মধ্যেকার এই প্রতিযোগিতাকে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা বলে ধরা হয় না, অর্থনৈতিক বর্গ হিসাবে প্রতিযোগিতা হলো প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন সংস্থা ও দাম নির্ধারণ সংক্রান্ত ব্যাপার।

মার্কসীয় তত্ত্বে শ্রমিকদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতার বিষয়টি পুঁজির মধ্যেকার প্রতিযোগিতা (বা আসল প্রতিযোগিতা) থেকে আলাদা— এটি শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত— শিল্পের বেকার শ্রমিকবাহিনী তৈরির মাধ্যমে পুঁজি যা শ্রমিকদের মধ্যে যে সংঘাত তৈরি করে। এই ধরনের ভাগ-করে-শাসন-করার নীতি উদ্বৃত্ত শ্রমিক সৃষ্টি করে, বিশ্বের উদ্বৃত্ত শ্রমিক বাহিনী থেকে যাতে নিয়মিত শ্রমিক যোগান পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করে। কর্মসংস্থানকে অসুরক্ষিত করে, সবসময় বেকারির খাঁড়া ঝুলিয়ে রেখে এদের শাসনে রাখা হয়। ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক পিয়ের বরদিউ বলেছেন "কাজ থেকে ছাঁটাই হবার ভয় সহ" "বেকারির কাঠামোগত হিংসা" হলো "ব্যক্তিকেন্দ্রিক মাইক্রো-অর্থনৈতিক মডেল" সুষ্ঠুভাবে কাজ করার শর্ত। অথবা, মার্কিন পুঁজিপতি স্যামুয়েল ইনসাল যেমন একশো বছর আগে বলেছিলেন, "আমার অভিজ্ঞতায় শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ানো সবচেয়ে ভালো উপায় হলো কারখানার গেটে অপেক্ষমান লম্বা লাইন।"

আজ শ্রেণী অসন্তুষ্টিকে যে জাতীয় প্রতিযোগিতায় চালান করে দেওয়া হচ্ছে সেই জাতীয় প্রতিযোগিতার মতাদর্শে আমরা শুনছি যে মার্কিন শ্রমিকরা দিন দিন বেশি বেশি করে মেক্সিকোর শ্রমিকদের কাছ থেকে, চীনের শ্রমিকদের কাছ থেকে, ভারতের শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রতিযোগিতার মুখে পড়ছে। আমাদের মতে এটা প্রতিযোগিতা বাড়ার লক্ষণ নয়, বরং একচেটিয়া ধরনের বহুজাতিক কর্পোরেশনের বৃদ্ধির ফল, যারা তাদের অনেক অনেক বিদেশি অন্তর্ভুক্ত কোম্পানির মাধ্যমে, আরও অনেক সাবকনট্রাক্টরের মাধ্যমে এবং জাতীয় সরকারগুলির উপর ও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্ত আধিপত্যের মাধ্যমে বিশ্বের শ্রমিকদের ওপর ভাগ-করো-ও-শাসন-করো নীতি ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছে। একচেটিয়া পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ যত জোরদার হয় শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তত বাড়ে। একই মুদ্রার দুই পিঠ। এর ফল হলো বিশ্ব জুড়ে শোষণ বাড়া (এবং, একচেটিয়ার মাত্রা বাড়া)। কেন্দ্রের পুঁজির নেতৃত্বে গ্যাট ও ডবলিউটিও-র মাধ্যমে কর ও পুঁজি নিয়ন্ত্রণে রাশ পড়ানো হলো, কারণ সম্রাট-কর্পোরেশনগুলি বিশ্বাস করে যে তারা পরিধির প্রতিযোগীদের দাবিয়ে রাখার মতো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এর ফলে পুঁজির যে নিয়ন্ত্রণহীন

চলাচল শুরু হলো তার ফলে পুঁজিবাদের কেন্দ্রের দেশগুলির সুবিধাভোগী শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি কমে বন্ধ হয়েছে বা মজুরি কমেছে, আর পরিধির গরিব শ্রমিকদের বেশির ভাগেরই অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে।

সংস্থার আকার দিন দিন বাড়ার সূত্র ও বহুজাতিক কর্পোরেশনের উদয়

প্রথম থেকেই পুঁজিবাদ এমন একটা ব্যবস্থা যা প্রধান শ্রমিকদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও তাদের শোষণের ভিত্তিতে পুঁজির পুঞ্জীভবন ঘটায়— পুঁজির মধ্যেকার প্রতিযোগিতা হলো সেই পদ্ধতি যার মাধ্যমে দ্রুত পুঞ্জীভবনকে প্রতিটি খণ্ড পুঁজির উপর প্রযোজ্য একটি সূত্র বানিয়ে দেওয়া হয়। মার্কস লিখেছেন: পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশ প্রতিটি শিল্পে পুঁজির পরিমাণ ক্রমশ বাড়ানোটাকে অবশ্যপ্রয়োজনীয় করে তোলে, এবং বাইরে থেকে প্রয়োগ হওয়া একটি শক্তি হিসাবে প্রতিযোগিতা প্রতিটি পুঁজিপতিকে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সূত্রের বশবর্তী করে তোলে। এটা তাকে তার পুঁজিকে রক্ষা করার জন্য তাকে (পুঁজিকে) বাড়িয়ে চলতে বাধ্য করে, আর কেবলমাত্র ক্রমাগত পুঞ্জীভবনের মাধ্যমেই সে একে (পুঁজিকে) বাড়িয়ে চলতে পারে।" স্বাভাবিকভাবেই, পুঁজির ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবনের সঙ্গে এবং কতিপয়ের হাতে উৎপাদনের মূল উপকরণের একচেটিয়াকরণের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলে পুঞ্জীভবন।

পুঁজিবাদের ইতিহাস ফিরে দেখলে, বহুজাতিক কর্পোরেশনের সর্ববিখ্যাত বিশ্লেষক র‍্যাডিক্যাল অর্থনীতিবিদ স্টিফেন হাইমার যাকে 'সংস্থার ক্রমবর্ধমান আকারের নিয়ম' বলেছিলেন, তার প্রমাণ দেখতে পাই। তাঁর কথায়: শিল্প বিপ্লবের গোড়া থেকেই প্রতিনিধিত্বকারী-সংস্থার আকার বাড়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ওয়ার্কশপ থেকে কারখানা, সেখান থেকে জাতীয় কর্পোরেশন, সেখান থেকে বহু-বিভাগীয় কর্পোরেশন, আর এখন বহুজাতিক কর্পোরেশন।"

পুরনো বণিক-পুঁজিবাদের কালে উৎপাদনের একটা মূল ব্যবস্থা ছিল পুটিং-আউট ব্যবস্থা, যেখানে পুঁজিপতি শ্রমিককে উৎপাদনের উপায় ও কাঁচামাল দিত শ্রমিকের নিজের ঘরে বসে পণ্য উৎপাদনের জন্য, আর তারপর শ্রমিকদের শ্রমে উৎপন্ন পণ্যগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে তাদের সামান্য পয়সা দিত। এর অবশ্য একটা অসুবিধা ছিল। পুঁজিপতি শ্রমিকদের শ্রমপ্রক্রিয়ার ওপর সরাসরি খবরদারি করতে পারত না। ফলে উৎপাদন চলে এলো ওয়ার্কশপে, যাকে মার্কস বলেছেন 'সহযোগিতা' পর্ব— শ্রমিকরা এক জায়গায় জড়ো হলো, একজন মালিক-ম্যানেজারের আওতায় এলো। তা আরো শ্রমবিভাজনের পথ পরিষ্কার করল (পিন উৎপাদন নিয়ে অ্যাডাম স্মিথের বিখ্যাত আলোচনায় তা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে)। আগেকার বাজার সম্পর্কের আত্মীকরণ থেকে কারখানা ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়, তার পর শুরু হয় যন্ত্রের ব্যাপর ব্যবহার।

মার্কসীয় সংজ্ঞা অনুসারে, পুঁজিবাদী শ্রমবিভাজন মূলত 'ম্যানুফ্যাকচার' পর্ব থেকে, অর্থাৎ যখন কাঁচামালের ওপর মানুষের শ্রম ব্যবহার করে পণ্য সৃষ্টি করা হত তখন থেকে, শুরু হয়ে 'আধুনিক শিল্প' (বা যন্ত্রোৎপাদন)-এর স্তরে পৌঁছায়, যখন শ্রম যন্ত্রের অধীন হয়ে পড়ে— যা শুরু হয় শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে। এই পুরো পর্যায় জুড়ে সারকথা ছিল কারখানায় শ্রম শক্তির ওপর পুঁজির নিয়ন্ত্রণ, যা আবার বেশি বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফা সৃষ্টি করত।

ওয়ার্কশপ ও কারখানায় শ্রমবিভাজনের প্রাথমিক বিকাশ ছিল ছোট পরিবার-মালিকানাধীন ও পরিচালনাধীন সংস্থার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু পুঁজির ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবনের ফলে এর পরই ছোট পরিবারকেন্দ্রিক সংস্থার জায়গায় চলে এলো বড় বড় শিল্প কর্পোরেশনগুলি। এভাবে, প্রতিনিধিত্বমূলক খণ্ড পুঁজির আকার বেড়ে গেল। সরাসরি সম্পদ বৃদ্ধি (বা প্রত্যক্ষ ঘনীভবন) এর একমাত্র কারণ নয়, পাশাপাশি রয়েছে কেন্দ্রীভবন— বড় পুঁজি সাধারণত ছোট পুঁজিকে হারিয়ে দেয় (এবং তাকে অঙ্গীভূত করে নেয়)। কেন্দ্রীভবন আরো বড় লগ্নি পুঁজির হাতে, যা বিরাট আকারের একীভবন (merger) ও কোম্পানি ক্রয় (acquisition) ডেকে আনে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯০১ সালে এক বছরের মধ্যে ১৬৫টি ইস্পাত কোম্পানি মিলে তৈরি হয়েছিল ইউ এস স্টীল, প্রথম বিলিয়ন (একশো কোটি) ডলার কর্পোরেশন। তার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ দেয় জে পি মর্গানের লগ্নি পুঁজি সাম্রাজ্য।

ছোট সংস্থার তুলনায় বড় সংস্থার সুবিধা অনেক বেশি। কেবল আকারের সুবিধাই (economies of scale) নয়, অন্যদের ঢোকার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে একচেটিয়া ধরনের সুবিধা, এবং তার ফলে একচেটিয়া খাজনা আদায়ের ক্ষমতা। তার ওপর, একটা কর্পোরেশন যখন অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করার মতো বড় হয়ে ওঠে, সে তখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা লাভ করে, রাষ্ট্রীয় ভরতুকি ও সহায়তার পূর্ণ সুযোগ নিতে পারে। একচেটিয়া পুঁজিবাদের পুরো ইতিহাস এরই সত্যতা প্রকাশ করে। এর ফলে বিংশ শতকে, আলফ্রেড মার্শালের *প্রিন্সিপিল্‌স অফ ইকনমিক্স* বর্ণিত ছোট পরিবার-ভিত্তিক সংস্থা আর প্রতিনিধিত্বকারী বাণিজ্য সংস্থা রইলো না, বিশালাকৃতি একচেটিয়া ধরনের কর্পোরেশনগুলি হয়ে উঠলো প্রতিনিধিত্বকারী বাণিজ্য সংস্থা।

পুঁজিবাদের প্রতিযোগিতামূলক স্তরে শ্রমের ম্যানেজারীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল সাধাসিধে বা স্থূল ধরনের। কিন্তু বাজারের প্রসারের সাথে সাথে সংস্থাগুলি যত আকারে বড় হতে লাগল একচেটিয়া পুঁজির নতুন রাজত্বে আরো জটিল ও নিয়মানুসারী এক শ্রমবিভাজন সম্ভব হয়ে উঠল। বিংশ শতকের গোড়ায় ফ্রেডরিক উইনস্লো-র হাতে বৈজ্ঞানিক পরিচালনার (ম্যানেজমেন্ট) পত্তন সম্ভব হলো। এতে শ্রমপ্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান ও তার নিয়ন্ত্রণ দিন দিন শ্রমিকের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ম্যানেজমেন্টের হাতে

ঘনীভূত হলো, পাশাপাশি এর ফলে শ্রমের তীব্রতা অনেক বৃদ্ধি পেল— মার্কস যাকে বলেছেন পুঁজির অধীনে শ্রমের 'নিয়মতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তির' বিপরীতে 'প্রকৃত' অন্তর্ভুক্তির ঐতিহাসিক সূত্রপাত। অলিগপলিগুলির মধ্যে দাম নিয়ে প্রতিযোগিতা বন্ধ করার পাশাপাশি এটি ও আরও অনেক কিছু একচেটিয়া পুঁজির বিজয় ডেকে আনে। এই পর্বেই উদয় হয় আধুনিক বহুবিভাগীয় কর্পোরেশন, অলিগপলি, আনুভূমিক সংযুক্তি, উল্লম্ব সংযুক্তি, জোট, সিকিউরিটির বাজার ও বহুজাতিক কর্পোরেশনের। ১৯৭৮ সালে হ্যারি মাগডফ বলেছেন, ''বাণিজ্য সংস্থার তিনটি প্রধান ধর্ম— বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্পোরেট ক্ষমতা ঘনীভবন ও বিশ্ব বাজারের বৃদ্ধি— শেষ পর্যন্ত বহুজাতিকদের কাজকর্মের মধ্যে ঠিকমতো পূর্ণতা পেল।'' কিন্তু, তিনি বলছেন, ''যাকে সুবিধাজনকভাবে একচেটিয়া পুঁজি (প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদের বিপরীতে) বলা হয় সেই স্তর'' আসা পর্যন্ত, যখন প্রতিটি প্রধান শিল্পে কয়েকিটি দৈত্যাকার কর্পোরেশন থাকাটাই নিয়ম হয়ে উঠল, ''পুঁজির ঘনীভবন'' ততখানি না ঘটা পর্যন্ত বহুজাতিক কর্পোরেশনের উদয় ঘটতে পারত না।

এই অর্থে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি যেহেতু পুঁজির ভিতরকার বিকাশের— শ্রমকে নিয়ন্ত্রণ, পুঞ্জীভবনের প্রচেষ্টা, প্রতিযোগিতার শক্তি, ঋণ/লগ্নি-পুঁজির জোর ও বিশ্ব বাজারের বিকাশের— ফলশ্রুতি, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাই বিশ্বায়িত সংস্থার কোনো সহজ বা সাধারণ তত্ত্ব হতে পারে না। কিন্তু এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাবা যেতে পারে। প্রথম যে বহুজাতিক সংস্থাগুলি তৈরি হয়েছিল সেগুলি প্রাথমিকভাবে সংগঠিত হয়েছিল কাঁচামালের সন্ধানে। তেল ও রাবার কোম্পানিগুলি এর উজ্জ্বল উদাহরণ। বিশ্ব কর্পোরেট কাজকর্মে এগুলি এখনো খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে তার চেয়ে বড় ঘটনা এই যে পরিণত একচেটিয়া ধরনের (ও অলিগপলি ধরনের) বাজারগুলি তার নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পে বেশি দাম ধরে রাখা ও আরো বেশি বেশি মুনাফা অর্জন করার জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধিকে সাবধানতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে। তার ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে উদ্বৃত্ত তৈরি হয় তা বিনিয়োগের জায়গা খোঁজা চলতেই থাকে। এভাবে একচেটিয়া ধরনের কর্পোরেশনগুলি ''ঐতিহাসিকভাবে চালু ক্ষেত্রের বাইরে যাওয়ার একটা ভিতরকার তাগিদ অনুভব করে। সংস্থাটি যত একচেটিয়া ধরনের হয়, তার উদ্বৃত্ত মূল্য যত বেশি হয়, এই তাগিদও তত বেশি হয়।''

বিনিয়োগ করার মতো উদ্বৃত্ত আছে আর অন্যান্য শিল্পে অন্যান্য দেশে বিনিয়োগ করে মুনাফা কামাতে চাইছে এমন একটি কর্পোরেশনের সামনে সুযোগ রয়েছে অপ্রত্যক্ষ পোর্টফোলিও বিনিয়োগের (যা আর্থিক বিনিয়োগ মাত্র), অথবা শাখা-কোম্পানির (subsidiaries) মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সরাসরি হাতে নেওয়ার। এই দ্বিতীয় পথটি বেছে নিলে অন্য প্রতিযোগীদের তুলনায় কর্পোরেশনটির একটা একচেটিয়া ধরনের সুবিধা হলো, যদি কর্পোরেশনটি তার সুযোগ নিতে পারে। যেমন বৃহৎ আকারের সুবিধা, আরো সুবিধাজনক শর্তে পুঁজি/লগ্নি-পুঁজি পাওয়ার সুবিধা, প্রযুক্তিগত (অথবা গবেষণা ও বিকাশের) সুবিধা, পেটেন্ট, ম্যানেজারীয় সম্পদ, বিক্রয় প্রচেষ্টার আরো বিকশিত প্রচেষ্টা ইত্যাদি। এসব উপায়ে সে বাজারে অন্যদের ঢোকার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে পারে, একচেটিয়া মুনাফা লাভ করতে পারে। কোনো কর্পোরেশন ভাবতে পারে যে তার বিশ্বজোড়া কাজকর্মের ওপর রণনীতিগত নিয়ন্ত্রণ সে বাড়িয়ে সে তার সংস্থায় বেশি স্থিতিশীলতা আনতে পারে। মূল সংস্থা ও সংযুক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে (কখনো কখনো বিভিন্ন সংযুক্ত সংস্থার নিজেদের মধ্যে) অন্তঃসংস্থা বাণিজ্যের ফলে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি কর ফাঁকি দিতে পারে— বিভিন্ন কোম্পানির মুনাফা/লোকসান এমনভাবে সাজানো হয় যাতে বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন আইনের সুযোগ নেওয়া যায়।

বহুজাতিক কর্পোরেশনের প্রসারণের অলিগপলি ধরনের ফলে সংস্থাগুলি সর্বদাই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর টেক্কা দেওয়ার নীতি নির্ধারণে ব্যস্ত। গ্রাহাম ও ক্রুগম্যান তাই বলেছেন যে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ প্রায়ই '''পারস্পরিক ভীতি প্রদর্শনের' রূপ নেয়। একটি সংস্থা কর্তৃক অন্য সংস্থার দেশের বাজারে অনুপ্রবেশ হলো অলিগপলি-প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি রূপ''।

বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির কাজকর্মের ক্ষেত্রে একটি নির্ধারক বিষয় হলো, আগেই বলা হয়েছে যার কথা, হাইমার থেকে শুরু করে কেইথ কাওলিং, রজার সুগডেন ও জেমস পিপলস পর্যন্ত অনেক বিশ্লেষক যাকে 'ভাগ করো ও শাসন করো' বলেছেন। নয়া-উদারনৈতিক কালে কর্পোরেশনগুলি সারা বিশ্বে চলাচল করতে পারে। ''মুক্ত বাণিজ্যের'' (অর্থাৎ পুঁজির মুক্ত বিহারের) প্রায় সব বাধা অপসারিত। কিন্তু শ্রম সহজে কোথাও যেতে অক্ষম। শ্রম তাই সেই সেই দেশে, সেই সেই অঞ্চলে বাঁধা পড়ে আছে। অভিবাসন আইন, ভাষা, রীতিনীতি ও আরও অনেক কিছু তাকে আটকে রাখে।

ডেভিড হার্ভে যাকে ''নিঃস্বকরণের মাধ্যমে পুঞ্জীভবন'' বলেছেন, কৃষি-বাণিজ্য কর্তৃক বিশ্বের সর্বত্র বিরাট আকারে কৃষক উচ্ছেদ ও অত্যধিক জনঘনত্বপূর্ণ নগর এলাকায় কৃষকদের ভীড় করার ফলে বিশ্ব জুড়ে শিল্পে উদ্বৃত্ত শ্রমিক বাহিনীর আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ওপর আবার সোভিয়েত ব্লকের পতন এবং পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতিতে চীনের অন্তর্ভুক্তি বিশ্ব জুড়ে প্রতিযোগিতা-রত শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়িয়েছে। এসবের ফলে কোনো কোনো কর্পোরেট বিশ্লেষক বলছেন বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদী শ্রমিকের সংখ্যা 'দ্বিগুণ' হয়ে গেছে। এর অর্থ এই যে বিশ্বজোড়া উদ্বৃত্ত শ্রমিকের বাহিনী গত কয়েক দশকে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন দেশের

মরিয়া শ্রমিকদের এককে অন্যেরে বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়া খুব সহজ হয়ে গেছে।

বিদেশে যেখানে মজুরি কম, কর্মস্থলের অবস্থা খারাপ, উৎপাদনকার্য সেখানে পাঠিয়ে দেওয়ার ভয় প্রায় সব জায়গাতেই কাজ করে, এমনকি বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিধির কম-মজুরির দেশগুলিতেও যখনই শ্রমিকরা সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করে তাদের এই ভয় দেখানো হয়। এর একটা ক্লাসিক ঘটনা ঘটে ১৯৭১ সালে ব্রিটেনে, ব্রিটিশ অটো শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রত্যুত্তরে হেনরি ফোর্ড-২ যখন ঘোষণা করেন যে ফোর্ড এসকর্ট ও কর্টিনা গাড়িগুলি ভবিষ্যতে এশিয়ায় উৎপাদন করা হবে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির ম্যানেজমেন্টদের উপর সমীক্ষায় দেখা গেছে যে তারা ইউনিয়নের সঙ্গে বচসার সময় উৎপাদন সরিয়ে নেওয়ার এই ভীতি প্রদর্শনে তাদের কোনো আপত্তি নেই। এই রণনীতি, যার নাম দেওয়া হয়েছে নমনীয় উৎপাদন (ফ্লেক্সিবল প্রোডাকশন), এর ফল হলো বিশ্ব জুড়ে শ্রমিক সংগঠনগুলিকে দুর্বল করা, তাদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরানো। এসব কিছুই হলো শ্রম প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের অঙ্গ, শ্রম বিভাজন ও পুঁজিবাদী শোষণ প্রক্রিয়া থেকে যাকে আলাদা করা যায় না। নমনীয় উৎপাদন হলো নতুন আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন, বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা উৎপাদন এর ভিত্তি, অনেক সময় প্রযুক্তিগত ভাষায় এর পেছনে যুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু আসলে এর পেছনে আছে আরো সস্তা, আরো শোষণ করার মতো শ্রমের সন্ধান।

প্রায় তিন দশক আগে *মনোপলি ক্যাপিটালিজম* গ্রন্থে কেইথ কাওলিং যেমন লিখেছেন:

পুঁজিবাদ দিন দিন আরো বেশি করে ভবঘুরে হয়ে উঠছে, আর তার পেছনে রেখে যাচ্ছে সামাজিক ভাঙনের এক রেখা। প্রতিটি বহুজাতিক কর্পোরেশনের ক্ষেত্রেই এরকম ভবঘুরে হওয়াটা পদ্ধতি হিসাবে দক্ষ— দিন দিন শ্রমের মূল্যবৃদ্ধি ও আরো নমনীয় প্রযুক্তির কারণে নতুন সুযোগ আসার ফলে এরকমটা করাই তার দিক থেকে যুক্তিযুক্ত। এর ফলে আবার শ্রমিকদের দক্ষতার চাহিদা কমে যায়।... যেখানেই শ্রমিকরা মজুরি বাড়ানোর বা কাজের তীব্রতা অথবা সময় কমানোর দাবি তুলবে, তারা কাজ খোয়াবে। সে কাজটা চলে যাবে অন্য দেশের কম সংগঠিত, কম জঙ্গি শ্রমিকদের কাছে। (কোনো কোনো উন্নত পুঁজিবাদী দেশের) এই বি-শিল্পায়ন হলো এমন একটি বিশ্বে শ্রেণী সংগ্রামের ফল।

এর অর্থ এই যে বিদেশি সংযুক্ত কোম্পানি বা সাবকনট্রাক্টরদের হাত দিয়ে বিশ্ব অর্থনীতির নিম্ন-মজুরি এলাকায় উৎপাদনের আউটসোর্সিং হলো আন্তর্জাতিক অলিগপলি ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক 'নতুন ভবঘুরেপনা' সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে উৎপাদন কোথায় হবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কোথায় শ্রম সবচেয়ে সস্তা তা দিয়ে, আর শ্রমের প্রতিরোধের চিহ্নমাত্র দেখা দিলে সম্রাট-কর্পোরেশনগুলি চাটিবাটি গুটিয়ে অন্যত্র চলে যায়।

আজকে অলিগপলি ধরনের বহুজাতিকের ক্ষেত্রে পুঞ্জীভবনের জন্য, অর্থাৎ টিকে থাকার জন্যই, বিশ্বজোড়া প্রসারণ প্রয়োজনীয়। কোনো একটি প্রধান কর্পোরেশন যদি একটি নতুন বাজারে প্রবেশ করে, তার প্রতিদ্বন্দ্বীদেরও তা করতে হয়, নইলে তাদের সামনে উন্নতির দরজা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। গ্রাহাম ও ক্রুগম্যানের মতো কোনো কোনো অর্থনৈতিক তাত্ত্বিক একে বলেছেন বহুজাতিক কর্পোরেট বিনিয়োগের ''নেতাকে অনুসরণ করো'' ধরন।

বাণিজ্যকে এখন আর প্রাথমিকভাবে মুক্ত বাজারের শক্তি থেকে উদ্ভুত মনে করা হয় না— নয়া-উদারনৈতিক তত্ত্বে যেমন মনে করা হত। দিন দিন বাণিজ্য হয়ে উঠছে আরো বেশি করে বহুজাতিকদের মূল কোম্পানি ও সংযুক্ত কোম্পানিগুলির মধ্যে সম্পর্ক দিয়ে নির্ধারিত, দিন দিন তা হয়ে উঠছে অন্তঃকোম্পানি বাণিজ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে বহুজাতিক নিয়ন্ত্রিত। *ইন্টারন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজেস অ্যান্ড গ্লোবাল ইকনমি* (২০০৮) গ্রন্থে জন ডানিং ও সারিয়ানা লুনডান যেমন বলেছেন: ''মার্কিন বহুজাতিকদের মূল কোম্পানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি সংযুক্ত কোম্পানিগুলির অংশ যোগ করলে, বহু-জাতিকরা মার্কিন রপ্তানির ৭৭ শতাংশ ও আমদানির ৬৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে।'' সেকারণে মার্কিন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবস্থা দ্রুত এমন একটা দিকে চলেছে যেখানে একমাত্র বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলিই শুধু থাকবে। ২০০৫ সালে কাওলিং লিখেছিলেন, ''বহুজাতিকীকরণ বাজারকে নিয়ন্ত্রণের আর একটি মাত্রা নিয়ে এলো। বাণিজ্যের ধরণ ও মাত্রার ওপর দৈত্যাকার সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ। আর তাই তা জাতীয় বাজারে একচেটিয়া বা অলিগপলি ধরনের দাম নির্ধারণের ওপর বাণিজ্যের সম্ভাব্য প্রভাবকে নস্যাৎ করে।''

আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির দ্বন্দ্ব

পুঞ্জীভবনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের প্রধান ফল হয়েছে এই যে বিশ্বে শোষণ তীব্রতর হয়েছে, স্থবিরতার প্রবণতা গভীরতর হয়েছে। ১৯৭০-এর দশক থেকে উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতিগুলিতে প্রবৃদ্ধির হারে দিন দিন আরো মন্দা দেখা দিল। বিশ্ব সংকটের অন্য সব ভয়ানক ফল পড়লো বিশ্বের গরিব দেশগুলিতে। আন্তর্জাতিক একচেটিয়া লগ্নি-পুঁজির বৃদ্ধি শুধু যে বিশ্ব জুড়ে মন্দা ছড়ালো তাই নয়, আর্থিকীকরণও দেখা দিল। দৈত্যাকার সংস্থাগুলি তাদের বিশাল পরিমাণ অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত বিনিয়োগের জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট জায়গা না পেয়ে বিশ্ব আর্থিক ক্ষেত্রে ফাটকাবাজিতে দিকে নজর দিল। তার ফলে আর্থিক সংকট আরো বাড়ল, তা আরো ভয়ানক হয়ে উঠলো। সর্বত্র রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলি দৈত্যাকার পুঁজির

ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লো। যেসব কর্পোরেশন 'অকৃতকার্য হওয়ার পক্ষে বড্ড বড়' তাদের উদ্ধার করতে বাধ্য হলো রাষ্ট্র। জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকারগুলি সব সাধারণ মানুষের অর্থ নিয়ে, সমাজকল্যাণ খাতে ব্যয় কমিয়ে, আরো নিপীড়ক ধরনের কর চাপিয়ে, মোটের ওপর সমাজে শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে এই আর্থিক সংকট থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো। তাই, একচেটিয়া পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ বিশ্ব ব্যবস্থার আরো স্থিতিকরণের বদলে আরো বেশি বেশি সংকট ডেকে আনছে— শুধু ব্যক্তি-অর্থনীতির সংকট নয়, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থারও সংকট।

তার সমস্ত কদর্যতা নিয়ে অসাম্য আরো গভীরভাবে জেঁকে বসছে। আজ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ধনীতম ২ শতাংশ বিশ্বের মোট সম্পদের অর্ধেকের বেশির মালিক। আর এই ধনীদের মধ্যে আবার ধনীতম ১ শতাংশ বিশ্বের সম্পদের ৪০ শতাংশের মালিক। ১৯৬০-এর দশকে, একচেটিয়া পুঁজির 'সোনালী সময়ে', বিশ্বের ধনীতম ও দরিদ্রতম অঞ্চলে জনপ্রতি আয়ের অনুপাত যেখানে ১৫:১ থেকে কমে হয়েছিল ১৩:১। বিংশ শতকের শেষে সেখানে এই অনুপাত বেড়ে হয়েছে ১৯:১। ১৯৭০ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে (চীন বাদে) জনপ্রতি জাতীয় আয় ছিল জি-৮ দেশগুলির (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইটালি, কানাডা, রাশিয়া) জনপ্রতি জাতীয় আয়ের ৬.৩ শতাংশ। ২০০০ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে (বিরাট আর্থিক মন্দার আগে পর্যন্ত) এই হারটি সামান্য বেড়ে হয়েছিল ৬.৬ শতাংশ। জি-৮ দেশগুলির জনপ্রতি জাতীয় আয়ের তুলনায় ৫৮ টির মতো সবচেয়ে কম উন্নত দেশ জনপ্রতি জাতীয় আয় ১৯৭০ সালে ছিল ১.৮ শতাংশ, ২০০৬ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১.৩ শতাংশে। একবিংশ শতকের প্রথম দশকে বার বার খাদ্যসংকট দেখা গেল। কোটি কোটি লোক সর্বদা খাদ্যাভাবে ভুগছে, অন্যদিকে খাদ্যের দাম বাড়ছে, খাদ্য নিয়ে ব্যাপক ফাটকাবাজি চলছে।

একচেটিয়া পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের সবচেয়ে বড় পরিহাস এই যে, একচেটিয়া ধরনের বহুজাতিক কর্পোরেটের বিকাশে সাহায্য করে নয়া-উদারনৈতিক মতাদর্শ, যার ভিত্তি হলো হায়েক ও ফ্রিডম্যানের 'মুক্ত বাজার' মতাদর্শ। বলা হলো বিশ্ব জুড়ে মানুষের মুক্তি, অর্থনৈতিক বিকাশ ও ব্যক্তির সুখের কথা— বা সাধারণ ভাষায় 'গণতন্ত্রে'র কথা— যেখানে কোনো 'স্বৈরতন্ত্র' থাকবে না। হায়েকীয় চিন্তায়, এই সোনালী ভবিষ্যতের শত্রু দুটি: শ্রম আর রাষ্ট্র (তা যতটুকু শ্রমের ও সাধারণ মানুষের স্বার্থ দেখবে)।

একচেটিয়া পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের পক্ষে এই নয়া-উদারনৈতিক প্রচার শুধু শ্রমিক শ্রেণীর ওপরই আক্রমণ নয়। বুঝতে হবে যে এটা সাধারণভাবে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ— কর্পোরেশনের শক্তির বিরোধিতা করার জন্য জনগণের স্বাধীনভাবে সংগঠিত হবার ক্ষমতার ওপর আক্রমণ। তারা যে নিজেদের বক্তব্যেরই বিরোধিতা করছে— বাস্তবকে তো অস্বীকার করছেই— সেটা না বুঝেই নয়া-উদারনীতিকরা ছোট এক 'উদারনৈতিক' রাষ্ট্রের ছবি আঁকে, যে রাষ্ট্র বিশ্ব জুড়ে ব্যক্তির, ব্যবসার ও মুক্ত বাজারের চলার পথ থেকে সরে থাকবে। তা সত্ত্বেও পুরনো এক গানের ভাষায় বলা যায়, এই কোটিপতি 'উদারনীতিকদের' স্বর্গ হলো গরিব মানুষদের নরক।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব জুড়ে রাষ্ট্রের ব্যয়ভার কিন্তু বিশেষ কমেনি। রাষ্ট্রগুলি এখন বেশি বেশি করে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির সেবা করছে, তাদের দৈত্যাকার কর্পোরেশনগুলিকে সাহায্য করছে। রাজনৈতিক নেতারা ঘুষ খেয়ে মোটা হচ্ছে, যে ঘুষ আসে নানান রূপে। একই সঙ্গে এইসব আধা-বেসরকারি হওয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা আবার নিজেদের দেশের মানুষের ওপর আরো বেশি নিপীড়ন চালানো, তাদের আরও নিষ্পিষ্ট করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠছে।

জাতীয় ক্ষেত্রে যেমন, কোনো রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী জনতাকে সহায়তা দেয়, সেই কর্মসূচির বিরুদ্ধে নয়া-উদারনৈতিকরা আঘাত হানতে থাকে। আন্তর্জাতিকভাবে প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো 'মুক্ত বাণিজ্যের' নামে জাতি-রাষ্ট্র কর্তৃক বহুজাতিক কর্পোরেশনের ক্ষমতায় রাশ পড়ানো বন্ধ করা। দুর্বল রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে তা বেশি আঘাত হানবে। ধনী দেশগুলি নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি (প্রধানত আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক ও বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন) এইসব দুর্বল দেশে এই আইন আরো জোরদারভাবে লাগু করবে— বিশ্বায়িত কর্পোরেশনগুলির অনুপ্রবেশ রোখার ক্ষমতাও এইসব দেশের কম। নয়া-উদারনৈতিক জমানায় অর্থনৈতিক মন্দার বাস্তবতাকে দৈত্যাকার সংস্থাগুলির সামনে বাজারকে খুলে দেওয়ার পক্ষে বাড়তি যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বর্তমানে বিশ্বজোড়া একচেটিয়া লগ্নি পুঁজির আধিপত্যের অর্থ হলো প্রতিটি নতুন সংকটই আর্থিক সংকট। তা ঋণ বুদবুদের চেহারা নিচ্ছে, সেই বুদবুদটি প্রসারিত হতে হতে শেষে ফেটে যাচ্ছে। যে সব রাষ্ট্র নয়া-উদারনীতির পুরো শক্তিকে রুখতে পারার মতো বড়ো ও শক্তিশালী তারাই একমাত্র এই সময়ে খানিকটা সম্পদের মুখ দেখতে পাবে— তবে এই 'সমৃদ্ধি' তাদের দেশের শাসকগোষ্ঠীর (প্লুটোক্র্যাসি) বাইরে বিশেষ যাবে না। তথাকথিত ব্যর্থ রাষ্ট্রগুলি হলো বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ওপর আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির হানা আঘাতের (প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সামরিক শক্তিও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে) ফল।

ᐁ মান্থলি রিভিউ, জুন ২০১১ থেকে গৃহীত, ঈষৎ সংক্ষেপিত

রাষ্ট্র ও পুঁজি : প্রেক্ষাপট ভারতবর্ষ

রতন খাসনবিশ

ভূমিকা

নেহরু-ইন্দিরা যুগে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রের সঙ্গে বেসরকারি পুঁজির যে সম্পর্ক ছিলো, নয়া উদারবাদী যুগের ভারতবর্ষে এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কের চরিত্র সে সরকম আর নেই। অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে এবং বেসরকারি পুঁজি চলবে সরকারি নিয়ন্ত্রণবিধি মেনে নিয়ে— এটা ছিল নেহরু-ইন্দিরা যুগের ভারতবর্ষের অর্থনীতির মূল ছিল। এই দিশাটাই বদলে গেল ১৯৯১ সালে নয়া অর্থনৈতিক নীতি চালু হবার পর। এটা মোটের ওপর স্থির হয়ে গেছে যে অর্থনীতিতে পুঁজি বিনিয়োগে রাষ্ট্রের যে ভূমিকা ছিল নেহরু-ইন্দিরা যুগে, সেরকম ভূমিকা এখন আর থাকবে না। পুঁজি বিনিয়োগে মূল ভূমিকা পালন করবে দেশি এবং বিদেশি বেসরকারি পুঁজি। এই ভূমিকা পালন করতে তারা যাতে কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়, সরকারের মূল কাজ হবে সেটা নজরে রাখা। এ কাজটা করতে হলে অর্থনীতিতে আনতে হবে বাজারমুখী সংস্কার। ১৯৯১ সাল থেকে সেই কাজটাই ভারত সরকার করছে নিষ্ঠার সাথে। ধরে নেওয়া হয়েছে যে, বাজার যেখানে ব্যর্থ হয়, একমাত্র সেখানেই রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করতে হয়— সরকারি কাজের মাত্রা নির্ধারিত হবে এই তত্ত্বের ভিত্তিতে। রাষ্ট্রকে আগের মতো আর ইস্পাত কারখানা গড়তে হবে না। ইস্পাত কারখানা গড়বে জিন্দাল বা পস্‌কো। একাজে তাদের উৎসাহী করতে লাইসেন্স প্রথা তুলে দিয়ে বাজার অর্থনীতির নিয়মগুলো জোরদার করবে রাষ্ট্র। এ কাজে তাদের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে বাজার যদি ব্যর্থ হয় (যেমন পস্‌কোর জন্য জমি পাওয়া) তাহলে রাষ্ট্র তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। যেসব কাজে বাজারের নিয়ম ঠিকমতো কাজ করে না (যেমন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ), সেসব জায়গায় রাষ্ট্রের ভূমিকা থাকবে। দান-খয়রাতি করা গরিবদের জন্য, প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে টাকা ঢালা— এসব কাজ রাষ্ট্র অবশ্যই করবে। কিন্তু রাষ্ট্রের মূল কাজ হবে বেসরকারি পুঁজির প্রয়োজন মেটানো—রাষ্ট্র হবে বেসরকারি পুঁজির ফেসিলিটেটর।

বলা উচিত এসবের পিছনে একটা উন্নয়ন-সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনাও আছে, যে চিন্তাভাবনাটা আগের থেকে আলাদা। চিন্তাটা এরকম যে, উন্নয়নের জন্য দরকার আয় বাড়ানো। আয় বাড়াতে হলে প্রয়োজন হবে উৎপাদন বাড়ানো। উৎপাদন বাড়াতে হলে দরকার হবে পুঁজি বিনিয়োগ করা। পুঁজি বিনিয়োগ করাটা রাষ্ট্রের কাজ নয়। ও কাজটা করার যোগ্য মাধ্যম হলো বেসরকারি পুঁজিবাদ। বেসরকারি পুঁজিকে বিনিয়োগে উৎসাহী করলে হবে অর্থনীতিতে বাজারমুখী সংস্কার ঘটিয়ে। বাজারমুখী সংস্কার যত বেশি ঘটবে দেশি এবং বিদেশি পুঁজি ততই উৎসাহিত হবে পুঁজি বিনিয়োগ করতে। পুঁজি বিনিয়োগে ত্বরণ আসবে এর ফলে, বিনিয়োগে ত্বরণ এলে উৎপাদন বৃদ্ধির হারেও ত্বরণ আসবে। দেশের আয় বৃদ্ধির হারও বাড়বে। দেশের আয় বাড়লে দেশের গরিব লোকদেরও আয় বাড়বে। কারণ আয় বৃদ্ধির প্রভাব গড়বে সর্বত্র। কালক্রমে দারিদ্র্য দূর হবে এবং একটি সমৃদ্ধ ভারত গড়ে উঠবে। নেহরু-ইন্দিরা যুগে উন্নয়ন চিন্তাটা এই সরল পথে অগ্রসর হয়নি। উন্নয়নের কাজে অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে রাষ্ট্রকে উন্নয়নের এঞ্জিন হিসেবে দাঁড় করিয়ে। নয়া নীতি এই অবস্থাটা কাটিয়ে তুলতে চায় উন্নয়নের এজেন্ডাটাকে অন্যভাবে দাঁড় করিয়ে। মতবাদ হিসেবে এটিকে বলা হয় নয়া উদারবাদী উন্নয়ন মতবাদ। বলা বাহুল্য, এর পিছনে আবার আছে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক চিন্তা, যাকে বলা হয় নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক চিন্তা। আমাদের বক্তব্য, উন্নয়ন ও বেসরকারি পুঁজির আন্তঃসম্পর্কটি যতটা সরলভাবে হাজির করা হয় এই নয়া উদারবাদী তত্ত্বচর্চায়, বিষয়টা তত সরল নয়। জাতিরাষ্ট্র ও বেসরকারি পুঁজির আন্তঃসম্পর্কেও জটিলতা আছে। যেভাবে উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা খর্ব করার কথা বলে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি, তাতে আছে জনবিরোধী উপাদান।

এই প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব পুঁজি অর্থাৎ বেসরকারি পুঁজির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কে যে জটিলতা আছে তা নিয়ে। আলোচনা করব উন্নয়ন এবং বেসরকারি পুঁজির সম্পর্কের জটিলতা নিয়েও। এইসব জটিলতার একটা চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাওয়া যায় ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ইতিহাসে। এই আলোচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে সে জন্যই বেছে নিয়েছি ভারতবর্ষকে।

নেহেরু-ইন্দিরা যুগের উন্নয়ন চিন্তা

১৯৪৭ সালের পর ভারতবর্ষ যে দিশায় তার উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের উদ্যোগ নেয় তার মধ্যে বিপুল প্রভাব ছিল সোভিয়েত রাশিয়া তথা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উন্নয়ন চিন্তার। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যে তত্ত্বের ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মসূচি তৈরি করতো তার মূল কথা ছিল উৎপাদনের উপকরণের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার যতদূর সম্ভব বিলোপ ঘটিয়ে সেগুলিকে সামাজিক মালিকানায় নিয়ে আসা। সামাজিক মালিকানায় নিয়ে আসা এই উপকরণগুলিকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে উৎপাদনের অগ্রগতি ঘটানো এবং উৎপাদিত

ভোগ্যদ্রব্যকে যতদূর সম্ভব সমভাবে বণ্টন করে সমাজের সব মানুষের জীবনযাত্রার মানের অগ্রগতি আনা— উন্নয়নকে বোঝা হতো এই ধরনের এক চিন্তা কাঠামোতে। দেশ ভেদে এই উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে তফাত ঘটতো, কিন্তু সব সমাজতান্ত্রিক দেশের উন্নয়নের মূল দিশা ছিল এই ধরনের। এই ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাজারের ভূমিকা ছিল গৌণ। মুখ্য ভূমিকা ছিল রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র এই উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণ করতো পরিকল্পনা মারফত। এই ধরনের অর্থনীতিকে তাই বলা হতো পরিকল্পিত অর্থনীতি।

ভারতবর্ষও এই ছকেই তার উন্নয়ন কর্মসূচিকে সাজিয়ে নিয়েছিলো, এ দাবি অবশ্যই করা যাবে না। এই ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের পূর্বশর্ত হলো, উৎপাদকের উপকরণের ওপর থেকে ব্যক্তি মালিকানার অবসান ঘটানো। ১৯৪৭ সালে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর যে রাজনৈতিক দলটি শাসিত ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নেতাদের চিন্তাভাবনায় এই ধরনের র‍্যাডিকাল কোনো পদক্ষেপের কথা কষ্টকল্পনাতেও স্থান পেতো না। তারা ক্ষমতা নিয়েছিল বিত্তবান অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলির পক্ষ থেকে— ভারতের দেশি বুর্জোয়া এবং ভূস্বামীরা ছিল যে শ্রেণীগুলির প্রধান প্রতিনিধি। বিদ্যমান বিত্ত ব্যবস্থাকে যতদূর সম্ভব অপরিবর্তিত রেখেই তারা ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উন্নয়ন কর্মসূচি অনুসরণ করার আশু পূর্বশর্তই পালিত হয়নি এই দেশটিতে। যেটা ঘটেছিল তা হলো, দেশি বুর্জোয়া এবং দেশি ভূস্বামীর অর্থনৈতিক স্বার্থ যতটা সম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখেই তার ওপর চাপানো একটা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মসূচি, যাতে থাকবে পরিকল্পিত উন্নয়নের ভাবনা, যে উন্নয়ন হবে রাষ্ট্রচালিত। রাষ্ট্রচালিত এই উন্নয়ন প্রকল্পে পুঁজি বিনিয়োগের একটা বড় দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র নিজেই। রাষ্ট্র এইভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করে যা গড়ে তুলবে সেখানে উৎপাদনের উপকরণের ওপর থাকবে রাষ্ট্রীয় মালিকানা, যা সামাজিক মালিকানারই একটি রূপ। অবশ্য বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগও থাকবে এই অর্থ-নীতিতে। পুঁজি বিনিয়োগের পরিকল্পনা করার সময় বেসরকারি পুঁজির গুরুত্বের কথা অস্বীকার করা হবে না। তবে বিনিয়োগ ক্ষেত্রগুলি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পালন করবে নির্দেশ দেবার দায়িত্ব। কোন্ বিনিয়োগ ক্ষেত্র বেসরকারি পুঁজির জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে, কোন্টা রাষ্ট্র নিজের হাতে রাখবে, এগুলো নির্ধারণ করবে রাষ্ট্রের নীতিপ্রণেতারা। দেশটিতে তাই রাষ্ট্রই হবে উন্নয়নের চালিকা শক্তি, সমাজতান্ত্রিক দেশে যা ঘটে যাচ্ছে। তফাৎ যা হবে সেটা এইরকম যে উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর বেসরকারি মালিকানার অবসান না ঘটিয়েই, বেসরকারি মালিকানার পাশাপাশি গড়ে উঠবে এমন সব উৎপাদন ক্ষেত্র যেখানে আছে রাষ্ট্রীয় মালিকানা, যা কিনা সামাজিক মালিকানারই একটা রূপ।

উৎপাদন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার গুরুত্ব থাকবে দেশটিতে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যেমন তা থেকে থাকে। কিন্তু বেসরকারি উৎপাদন যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে বাজার ব্যবস্থার অস্তিত্বও। তবে বেসরকারি উৎপাদনের ওপর যেমন নিয়ন্ত্রণ থাকবে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলিকে লাইসেন্স প্রথা মারফত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার মাধ্যমে, বাজারের ওপরও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকবে গণবণ্টন ব্যবস্থা ও 'পারমিট' প্রথা মারফত। এই ধরনের একটা অর্থনীতি, যাকে বলা হয়, 'মিশ্র অর্থনীতি', ভারতবর্ষ গ্রহণ করলো সেই রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও সামাজিক মালিকানার সহাবস্থান-ভিত্তিক এক উন্নয়ন পন্থা।

এই ধরনের একটা জটিল ছকে উন্নয়নের সমস্যাটা মোকাবিলা করার চিন্তা কেন করলেন নেহরু যুগের নীতি নির্ধারকরা, নানা টানাপোড়েন সত্ত্বেও যে ছকটা এদেশে চালু রইলো গত শতকের আশির দশকের শেষ পর্যন্ত? বেসরকারি উদ্যোগপতিদের হাতে বিনিয়োগের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আজ যা করা হচ্ছে সেইভাবেই কেন নিজেদেরকে স্রেফ সহায়কের ভূমিকায় রেখে দেবার চিন্তা করেন নি সে যুগের রাষ্ট্রনায়করা? একটা চটজলদি উত্তর আছে এই প্রশ্নটির। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ চলে যাবার পর যে ভারতবর্ষ হাতে পেয়েছিলেন সে যুগের রাষ্ট্রনায়করা, সেখানে দেশি উদ্যোগপতিদের ক্ষমতা ছিল না শিল্পায়নের জন্য যে বিপুল বিনিয়োগ দরকার, সে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেবার। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে উন্নত দেশগুলিতে পুনর্গঠনের জন্য বিপুল বিনিয়োগের দায় মেটাবার পর বিদেশি পুঁজিরও এমন সংগতি ছিলো না যাতে ভারতের শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ পাওয়া যেতে পারতো তাদের কাছ থেকে। বিনিয়োগের দায়, বিশেষ করে ভারী শিল্পে বিনিয়োগের দায় তাই রাষ্ট্রকেই নিতে হতো সে সময়। এই ধরনের অনুমানের পক্ষে ঐতিহাসিক তথ্য আছে যথেষ্ট। শিল্পায়নের জন্য ভারী শিল্পে বিনিয়োগ করতে হবে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের বোম্বাই পরিকল্পনাতেও এ দায় রাষ্ট্রকেই নিতে হবে এ কথা বলা হয়েছিল। দেশি শিল্পপতিদের দিক থেকেও সমর্থন ছিলে এ প্রস্তাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এদেশে ভারী শিল্প-উদ্যোগে বিনিয়োগ করার কর্মসূচিটিই অনুমোদন করেননি, এ তথ্যও বহুল পরিচিত। যোগ করা যায় এ বক্তব্য যে ভারতীয় বুর্জোয়াদের, যারা ছিলো গোড়া থেকেই বিদেশি পুঁজির সঙ্গে আপস করে চলার পক্ষে, উপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর যখন নয়া উপনিবেশিক শোষণ এবং নিয়ন্ত্রণের যুগ এলো তখন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তারা নিজেদের শিল্পভিত্তি মজবুদ করতে চাইলো যাতে তাদের দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়ে। শিল্প ভিত্তি মজবুদ করার জন্য দীর্ঘকালীন বিপুল বিনিয়োগের ঝুঁকি নেবার সাধ্য আবার ছিল না এই দেশি বুর্জোয়ার। এদের কাছে

'নরম বিকল্প' ছিলো এই দায় রাষ্ট্রের ঘাড়ে চাপালো, 'মিশ্র অর্থনীতি'র নামে যে দায়িত্বটা বহন করতে এগিয়ে এলো ভারতরাষ্ট্রের তৎকালীন নীতি প্রণেতারা।

কথাগুলো ভুল, এক কথায় তা বলা যাবে না। কিন্তু সাথে সাথে আরও কিছু কথা ভাবা দরকার। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি দেশি শিল্পপতিদের ওপর নানা বাধানিষেধ নিয়ে এসেছিল, এটা ঘটনা। এখন যত সহজে বেসরকারি বিনিয়োগ করা যায়, তখন সেটা করা যেত না। লাইসেন্স পাবার জন্য দিল্লীতে অনেক দিন দরবার করতে হতো। 'মনোপলি অ্যান্ড রেসট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস' আইনটাও বড় শিল্পপতিদের বিরুদ্ধেই গিয়েছিল। বিদেশি মুদ্রার ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ থাকায় শিল্পপতিরা বিদেশি প্রযুক্তি আমদানি করতে পারতো না ইচ্ছেমতো। তারা বাধ্য হতো প্রযুক্তির জন্য বিনিয়োগ করতে। 'ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট'-এর কারণে বহু বিদেশি কোম্পানি এদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়েছিল। শ্রম আইনে অনেক কড়াকড়ি ছিল। পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইএসআই— এসবের 'ঝামেলা'ও এসে পড়ে এই নেহরু-ইন্দিরা যুগেই। এগুলোর গুরুত্ব কতটা সেটা বোঝা যায় এই সমকালীন বাস্তবতার কথা মনে রাখলে যে, নয়াউদারবাদী অর্থনীতির ছকে ভারতের অর্থনীতিকে সংস্কার করার কাজ যখন শুরু হয়, যে সংস্কারের মূল কথা হলো বেসরকারি পুঁজির অবাধ বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করা, তখন দেখা গেল আক্রমণ নামছে এই নেহরু-ইন্দিরা যুগে যেসব নিয়মকানুন করা হয়েছিল, সেগুলোর ওপরেই। ঐসব নিয়মকানুন যদি পুঁজির স্বার্থেই করা হয়ে থাকে, পুঁজির স্বার্থেই আবার সেগুলো তুলে নেবার কথা ওঠে কীভাবে? বলা যায় যে, তখন ঐসব আইনকানুন বিধিনিষেধ দরকার হয়েছিল তৎকালীন পুঁজির স্বার্থেই; এখন আবার এগুলো তুলে নেওয়া ইচ্ছে এখনকার পুঁজির স্বার্থে। কথাটা কি ঠিক? তখন কি 'মনোপলি' আইন পুঁজির সেবায় লাগতো, যেটা এখন লাগে না? তখন কি 'ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন' আইন পুঁজির কাজে লাগতো, যা এখন লাগে না? সন্দেহ নেই, বিষয়টা অত সরল নয়। স্রেফ দেশি পুঁজির স্বার্থের ছকে এই উন্নয়ন চিন্তাকে বিশ্লেষণ করা ঠিক হবে না। আমাদের ধারণা, যেভাবে নেহরু-ইন্দিরা যুগের উন্নয়ন চিন্তার মূল্যায়ন করা হয়, সেটির পুনর্বিচার দরকার এইসব জটিলতা বুঝতে।

নেহরু-ইন্দিরা উন্নয়ন চিন্তা ও শ্রেণী স্বার্থ

দেশি বুর্জোয়ার স্বার্থে শিল্পভিত্তি মজবুত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সামাজিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা ক্ষেত্র প্রসারিত করা— নেহরু যুগের উন্নয়ন চিন্তা এতটা সরল রেখায় অগ্রসর হয়নি। যে জটিলতার কারণে ভারতবর্ষে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটেছিল, তারই যুক্তিগ্রাহ্য পরিণতিতে ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হয় এক জটিল উন্নয়ন পন্থা। ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটেছিল, এদেশের জাতিগত আকাbWা পূরণের অপ্রতিরোধ্য দাবি পূরণে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বাধ্যবাধকতার কারণে। জাতিগত আকাbWাটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট, যদিও এই আকাbWাটিই আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নেতিকরণের শক্তিতে রূপান্তরিত হয় কালক্রমে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অমোঘ নিয়মের কারণেই যা ঘটে থাকে। যদি প্রাক্ সাম্রাজ্যবাদী যুগে এটা ঘটতো, তবে এর পরিণতিতে দেশটিতে দেখা দিত স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্র, যা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে সামন্তবাদের বিপরীতে। সেটা ঘটলো না কারণ দেশী বুর্জোয়াকে আপস করতে হয়েছিল বিত্তের আর একটি বড় শিবিরের সাথে, যে শিবিরটি হলো দেশি ভূস্বামীর শিবির। আপসটা ঘটেছিল কৃষক এবং শ্রমিকসহ অন্যান্য শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে, জাতিগঠনে যাদের থাকে বিপুল ভূমিকা। এই অবস্থায় জাতিগত আকাbWার সঙ্গে শ্রমিক কৃষকের শ্রেণীগত আকাbWা যুক্ত হয়ে একটা ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম হতে পারতো, চীন বা ভিয়েতনামে যা হয়েছিল, যে সংগ্রামের পোষাকি নাম জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। ভারতে সেটা সফল হলো না। একই সঙ্গে ঘটলো আর একটা ঘটনা। বিশ্বযুদ্ধে হতবল ব্রিটিশের পক্ষে ভারতীয়দের জাতিগত আকাbWাকে (যা মূলত কৃষক ও শ্রমিকের সংগ্রামে প্রকাশিত হচ্ছিলো যুদ্ধোত্তর ভারতে) দমন করে রেখে আগের মতো শাসন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিলো না। ব্রিটিশ শাসকরা ক্ষমতা হস্তান্তর করলো ভারত এবং পাকিস্তানের দেশি বুর্জোয়া ও দেশি ভূস্বামীদের জোটের স্বার্থবাহী কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের হাতে। যারা ক্ষমতা পেল তাদের ওপর দায় বর্তালো দু'দেশের জনগণের জাতিগত আকাbWা (যা আসলে কৃষক ও শ্রমিকের শ্রেণীগত আকাbWা — যথা 'দেশ স্বাধীন হলে জাতির অধিকার পাব', 'দেশ স্বাধীন হলে কাজের অধিকার পাব') পূরণের। লিগ এ দায়িত্ব বা দায় মেটালো ধর্মের মাদক সেবন করিয়ে। কংগ্রেসের হাতে এরকম কোনো মাদক ছিল না। না থাকার কারণ হিন্দু সংখ্যাগুরু ভারতে ধর্মীয় মাদক হিসেবে যা ব্যবহার করতে হবে সেই হিন্দুধর্মের ঐ মাদক শক্তি কম (যে কারণে হিন্দু মহাসভা খুব সুবিধা করতে পারে নি সে সময়)। কংগ্রেসকে ধরতে হল ফেবিয়ান সোসালিস্ট নেহেরুর রাজনীতি, যে রাজনীতির সঙ্গে মিশ্র অর্থনীতির উন্নয়ন চিন্তার মিল আছে।

'মিশ্র অর্থনীতি'র নামে একটা ধূম্রজাল সৃষ্টি করে বুর্জোয়া ভূস্বামীদের পছন্দমতো একটা অর্থনীতিই হয়তো গড়তে যেতো কংগ্রেস, বাদ সাধলো তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হওয়া সোভিয়েত রাশিয়ার গ্রহণযোগ্যতা যখন বিপুল। সোভিয়েত ধরনের অর্থনীতির সাফল্যের কথা যখন বিশ্বপরিব্যাপ্ত। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয় জাতিসংঘের প্রথম উন্নয়ন রিপোর্ট (Measures for the Economic Develop-

ment of Underdeveloped Countries)। এতে বলা হয়, অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নের সমস্যা মেটাতে প্রয়োজন হবে বিপুল বিনিয়োগ। বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে উন্নয়নশীল দেশে— রাষ্ট্র সম্পদ সংগ্রহ করে পরিকল্পিত উপায়ে তার বিনিয়োগ ঘটাবে, যেমনটা ঘটে থাকতো তৎকালীন সোভিয়েত দেশে। সোভিয়েতে বাজার ব্যবস্থা যতটা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকতো, বাজারের ওপর ততটা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অবশ্য এই রিপোর্ট অনুমোদন করেনি। তবে পরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগ ঘটানোর জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ, অনুন্নত দেশে উন্নয়নের সমস্যা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা হয় এবং সেই সূত্রে সোভিয়েতের উদাহরণকে ইতিবাচক হিসেবেই বর্ণনা করা হয় এই প্রতিবেদনে। বলা যায় যে, এখানে যা বলা হয়েছিল, তৎকালীন সদ্য-স্বাধীন বহু দেশের রাষ্ট্রনায়করাই তা ঠিক বলে মনে করতেন। যোগ করা যায় যে, এটা তারা মনে করতেন এমন না হলেও এটা তারা বলতে বাধ্য হতেন স্বীয় দেশের শ্রমজীবী মানুষদের উন্নয়নের আকাbখাকে তোয়াজ করে তাকে ভাষায় রূপদান করতে গিয়ে। ক্ষমতায় থাকতে হলে এটা তাদের করতেই হতো। ভারতের শাসকশ্রেণীও ব্যতিক্রম নয়। পুঁজির অদৃশ্য প্রতিপক্ষ হিসেবে সোভিয়েত ব্যবস্থা সর্বত্রই তার উপস্থিতি বুঝিয়ে থাকতো। জাতিসংঘ থেকে ভারতবর্ষ কিংবা ইন্দোনেশিয়া— সর্বত্রই এটা ছিল তৎকালীন বাস্তবতার অঙ্গ। এই বাস্তবতাই ফেবিয়ান সোসালিজমের ধূম্রজাল ভেদ করে ভারতের 'মিশ্র অর্থনীতি'কে নিয়ে এলো এমন এক জায়গায়, এদেশের বুর্জোয়া কিংবা ভূস্বামী শ্রেণী যা পছন্দও করতো না, আবার যা বর্জন করার সাহসও তাদের ছিল না। পরিস্থিতিতে জটিলতা দেখা দিল এখান থেকেই।

এদেশের বিপুল কৃষকসমাজ চাইতো ভূমি সংস্কার। দেশি বুর্জোয়া ভূমি সংস্কার অপছন্দ করতো না। ভূমি সংস্কারের ফলে তাদের বাজার প্রসারিত হবার কথা, গ্রামীণ সম্পদও তুলে আনা যেত বিনিয়োগে ত্বরণ ঘটাবার লক্ষ্যে। কিন্তু তার দাম হিসেবে ভেঙে যেতে পারতো বুর্জোয়া-ভূস্বামী ক্ষমতা জোট, যেটা তারা ভয় পেতো। ভূমি সংস্কারকে তারা বাধা দিতে সাহস পায়নি। শুধু বুদ্ধি খাটিয়ে এটাকে তারা দিল্লী থেকে ঠেলে দিলো প্রাদেশিক রাজধানীগুলিতে (সংবিধানের রাজ্য তালিকায়) অর্থাৎ স্থানীয় ভূস্বামীদের কোর্টে। সেখানে নানা ধরনের সংস্কার, নানা ধরনের জোট গড়ে উঠলো এর ফলে। পুরনো ক্ষমতা কেন্দ্রগুলো ভাঙতে লাগলো, কিন্তু বিত্তবানদের স্বার্থ নষ্ট হয় এমন বৈপ্লবিক ভূমিসংস্কার কোথাও হল না। গ্রাম ভারত কিন্তু আগের জায়গাতেও থাকলো না। কোথাও স্থানীয় ক্ষমতা গেল জাতভিত্তিক কুলাকদের হাতে, কোথাও তা নিয়মতান্ত্রিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অস্ত্র হিসেবে কাজ করে গড়ে তুললো ক্ষুদ্র কৃষক অর্থনীতি। দিল্লীকে নুতন এই শক্তিগুলির সঙ্গে সমঝোতা করতে হল। কংগ্রেস রাজনীতিরও পরিবর্তন ঘটলো। ইন্দিরা গান্ধীর নব কংগ্রেস এবং তার 'সবুজ বিপ্লব' আর 'সহায়ক মূল্য'র রাজনীতিতে প্রতিফলিত হলো এই পরিবর্তিত গ্রামভারতের রাজনীতি। সোভিয়েত ধরনের ভূমিসংস্কার এখানে হলো না। পুরানো ধরনের ভূস্বামী শাসনও থাকলো না এদেশে। গ্রামভারতে জটিলতা বাড়লো। কৃষিসংকটও প্রায় চিরস্থায়ী চেহারা নিল। কিন্তু বিত্ত-সম্পর্ক বদলে দেবার কঠিন পরিস্থিতিও মোকাবিলা করতে হলো না ভারতীয় বুর্জোয়াদের। জটিলতা বেড়ে যাবার জন্য যে সমস্যা, ভারতীয় বুর্জোয়া সে সমস্যার দায় থেকে অব্যহতি পাবার চেষ্টা করলো সোভিয়েত ব্যবস্থা ভেঙে যাবার পর— নয়া উদারবাদের যুগে এসে। সে আলোচনায় পরে আসছি।

রাষ্ট্রকে উন্নয়নের এঞ্জিন করে অগ্রসর হবার প্রকল্পে ভারতের দেশি বুর্জোয়ার আপত্তি ছিল না। কেন ছিল না, এই প্রবন্ধের পূর্ববর্তী উপবিভাগে তা আমরা ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু রাষ্ট্রকে সামনে রেখে উন্নয়ন ঘটতে গেলে বেসরকারি পুঁজিকে সমস্যার সামনেও পড়তে হয়। রাষ্ট্রকেন্দ্রিক উন্নয়নের ছকে আছে পরিকল্পিত বিনিয়োগ, যে বিনিয়োগের বড় দায়িত্ব নেয় রাষ্ট্র আর যার সুবিধে পায় বেসরকারি পুঁজি। পরিকল্পিত বিনিয়োগ অবশ্যই চাইবে ১৯৫৬ সালের 'শিল্পনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত-সমূহ'-র মতো একটা আইন, যাতে বিনিয়োগ ক্ষেত্রগুলিতে তার কত অধিকার সেটা বলা থাকবে, থাকবে পরিকল্পিত উৎপাদনের স্বার্থে লাইসেন্স প্রথা আর পারমিটের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা বেসরকারি পুঁজির বিনিয়োগ ক্ষেত্রকে সংকুচিত করলো। শুধু তাই নয়, এই ব্যবস্থার ফলে একচেটিয়া ব্যবস্থাও পাকা হলো, যেটা ঠেকাতে পরে আনা হলো মনোপলি বিরোধী আইন। পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হলো এর ফলে। ব্যবস্থাটার দরকার ছিল না, একথা অবশ্য বলা যাবে না। পশ্চাৎপদ এলাকায় যে শিল্প গড়ে উঠেছে এ দেশে, তার মূলে আছে এই পরিকল্পিত বিনিয়োগ। ভারী শিল্পে এদেশ যে এতটা এগিয়ে যেতে পেরেছিল তার মূলেও আছে এই ব্যবস্থাটি। ব্যবস্থাটি কিন্তু ভারতীয় বুর্জোয়াদের যথেচ্ছ বিচরণে বাধা সৃষ্টি করলো। ভারতীয় বুর্জোয়া অবশ্য এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করলো বা এই পরিস্থিতিকে নিজ নিজ স্বার্থে কাজে লাগালো নানা বিচিত্র উপায়ে দিল্লীর শিল্পমন্ত্রককে হাত করে। কেউ এটা কাজে লাগালো মোটর গাড়ির ব্যবসায় অন্যরা যাতে ঢুকতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে। ভুঁইফোড় পুঁজিপতিও গজালো এই ব্যবস্থার সুযোগে (যথা ধীরুভাই আম্বানি)। পুরোনো বহু দেশি পুঁজি হারিয়ে গেল এই ব্যবস্থায় নিজের জায়গা খুঁজে না পেয়ে (বাঙ্গুর, স্যার বীরেন)। ফেবিয়ান সোসালিস্ট-এর 'মিশ্র অর্থনীতি' আর সোভিয়েত ব্যবস্থার অনুপ্রেরণায় গ্রহণ করা 'পরিকল্পিত

অর্থনীতি'র মডেল এইভাবে তার একটা ভারতীয় সংস্করণ করে নিলো যা শিল্পায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রত্যাশিত সাফল্য আনতে পারলো না। বুর্জোয়ারাও এটাকে নাকচ করতে পারলো না কিছুটা পরিস্থিতির চাপে, কিছুটা আবার পরিস্থিতির সুযোগ নেবার স্বার্থে।

সমস্যা দেখা দিলো অন্যদিক থেকেও। আগেই বলেছি আধাখেঁচড়া ভূমিসংস্কার কৃষির সংকটকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলছিলো। কৃষির ক্রমবর্ধমান সংকট, লাইসেন্স-পারমিট রাজের এই বিচিত্র শিল্পায়নপন্থা যা শিল্পের সংকটকেও ঘনীভূত করলো গত শতকের ষাটের দশকের মধ্যভাগে এসে, তা এক সার্বিক অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করলো। প্রবল গণঅসন্তোষ এবং নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের মধ্যে জনগণের পরিবর্তন আকাbWায় প্রতিফলিত হলো এই অর্থনৈতিক সংকটের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি। এর ফলে কি ভারতের উন্নয়ন দিশায় বিপরীতমুখী পরিবর্তন এলো? মোটেই না। সেটা হওয়া সম্ভবও ছিল না; কারণ জনগণ চাইলো আরও র‍্যাডিকাল কিছু কর্মসূচি। শ্রীমতী গান্ধী এটা বুঝলেন। সোভিয়েত ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের যে ছক ধরে ১৯৪৭-পরবর্তী পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করেছিল ভারতের শাসকশ্রেণী (অবশ্যই তাকে তার নিজের প্রয়োজন মতো বদলে নিয়ে), সেই ছকটিরই আরও র‍্যাডিকাল রূপকে সামনে নিয়ে মধ্য ষাটের এই সংকট মোকাবেলায় নামলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। সংবিধান সংশোধন করে তিনি 'সোস্যালিজম' ঢোকালেন দেশের উন্নয়ন দিশা চিহ্নিত করতে। আনলেন আরও ব্যাপক রাষ্ট্রকেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রকল্প যাতে আরও কঠোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এলো এ দেশের অর্থনীতি।

লাইসেন্স-পারমিট প্রথা তো রইলোই, তার সঙ্গে এলো আমদামি-পরিবর্ত প্রযুক্তি নীতি, এলো বিদেশি পুঁজির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক পুঁজির ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আনার লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ। পেনশন ফান্ডে, প্রভিডেন্ট ফান্ডে, বিমা ব্যবসায় নিয়োজিত সঞ্চয়— এ সবের সঙ্গে ব্যাঙ্ক মারফত আহরিত সামাজিক সঞ্চয় রাষ্ট্রের হাতে আসায় রাষ্ট্রই হয়ে পড়লো এ দেশের পুঁজির প্রকৃত নিয়ন্ত্রক। একই সঙ্গে বিদেশি মুদ্রার লেনদেনের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ কায়েম হওয়ায় দেশটিতে বেসরকারি পুঁজির যাবতীয় উদ্যোগও কার্যত হয়ে পড়লো রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্রটি একই সঙ্গে সমাজের সবকটি শ্রেণীকে খুশিতে রাখার জন্য নানা ধরনের ভর্তুকি ব্যবস্থা চালু করলো। সঙ্গে থাকলো গণবণ্টন ব্যবস্থা এবং বিপুল মাত্রায় 'গরিবী হটাও' প্রকল্প। একসময় মনে হচ্ছিলো যে রাষ্ট্রটি শ্রেণীর ঊর্ধ্বে উঠে একটা স্বাধীন অবস্থানে চলে যাচ্ছে উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যকর করার জন্য।

ব্যবস্থাটির দুর্বলতা ছিল এই যে এত সব কিছু করা সত্ত্বেও এই রাষ্ট্রটি সোভিয়েত যেখান থেকে শুরু করেছিল— আমূল ভূমিসংস্কার মারফত ভূমির ওপর সামাজিক মালিকানা আনা আর উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের ওপর থেকে ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ ঘটানো, সেই জায়গাটাই ধরতে পারলো না। রাষ্ট্রীয় মালিকানার ক্ষেত্র প্রসারিত হলো, কিন্তু বেসরকারি পুঁজি বাজেয়াপ্ত হলো না; ভূমি সংস্কার সৃষ্টি করলো জাতভিত্তিক গ্রামীণ কুলাক কিংবা ক্ষুদ্র কৃষকের অর্থনীতি, কিন্তু গড়ে উঠলো না কৃষি সমবায়। শ্রমিকের অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তাবিধি প্রসারিত হলো কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানা ছাড়া সামাজিক মালিকানার অন্য কোনো রূপ না থাকায় এই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রগুলিতে শ্রমিকের দায়বদ্ধতা বাড়লো না; এগুলো তাদের কাছে হয়ে দাঁড়ালো সংগঠিতভাবে অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের ক্ষেত্র— এগুলো বাঁচিয়ে রাখার দায় যে তাদেরকেই নিতে হবে, সে বোধটাই এলো না কখনো। এই অবস্থায় উন্নয়নের গতি শ্লথ হয়ে পড়ার কথা। সেটাই হলো এদেশে। উন্নয়ন যত মন্থর হলো, ততই বাড়লো শ্রেণীদ্বন্দ্ব। সবাইকে তুষ্ট করে চলতে গেলে এ সম্যসা কমে না। এ অবস্থায় কোনো রাষ্ট্রই শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রশমিত করে উঠতে পারে না। শ্রেণীদ্বন্দ্ব বাড়তেই থাকে এবং যুদ্ধরত শ্রেণীগুলির মাথে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে সুবিধে বিলিয়ে শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রশমন করার হাতিয়ার। ভারতে এটাই ঘটলো সে সময়। বলাবাহুল্য, এই অবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রীমতী গান্ধী এই ধরনের একটা ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হলেন না। ব্যর্থতার কারণ, সুবিধে বিলিয়ে দ্বন্দ্ব প্রশমনের হাতিয়ারটির ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে। তিনি এই অবস্থায় চেষ্টা করলেন গণতন্ত্রের রাস্তা বন্ধ করে একটা কঠোর শাসনব্যবস্থা কায়েম করার মাধ্যমে যুদ্ধরত শ্রেণীগুলিকে শাসনে আনার। সেটার ফল আরও খারাপ হলো। তিনি নিজেই শাসন ক্ষমতা হারালেন। স্বল্পস্থায়ী জনতা সরকার অর্থনৈতিক দিশায় কোনো পরিবর্তন আনতে পারলো না। দ্বিতীয় দফায় ফিরে এলেন শ্রীমতী গান্ধী। ব্যবস্থাটি যে এভাবে চলতে পারে না সেটা তিনি আগেই বুঝেছিলেন। এবার তিনি সতর্কভাবে শুরু করলেন উল্টো যাত্রা। লাইসেন্স প্রথা শিথিল করা হলো, বিদেশি পুঁজির ওপর নিয়ন্ত্রণও কিছুটা শিথিল করা হলো। আর কিছু তিনি করলেন না বা করতে সাহস পেলেন না। সাহস পেলেন পরবর্তী শাসকরা। সাহস পাবার কারণও ছিল। যে দায়টা বহন করতে ভারতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র পরিচালিত উন্নয়ন পন্থার আশ্রয় নিয়েছিল, ক্ষমতা হস্তান্তরের চার দশকের মাথায় এসে দেখা গেল, সেই দায়টা আর অত প্রবল নয়। এদেশে তথা সারা বিশ্বেই উন্নয়নের মডেল হিসেবে সোভিয়েতের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে, পরিকল্পিত অর্থনীতি আসলে অদক্ষতার জন্ম দেয়— এ কথা বলা হচ্ছে। সোভিয়েত নিজেই করছে পেরেস্ত্রৈকা। চীনে মাও সে-তুঙের উন্নয়ন চিন্তার বিপরীতে আসছে দেঙ সিয়াও পিং-এর বাজারমুখী সংস্কার।

এমত অবস্থায় জনমানসে সংশয় দেখা দিচ্ছে সমাজতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। আর তার ফলে সংশয় দেখা দিচ্ছে পরিকল্পিত অর্থনীতি মারফত উন্নয়নের সেই চার দশক ব্যাপী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপরও। এই সংশয়ের পর্যায়টাতেই জাতীয় শাসককুল রাজীব গান্ধী এবং ভি পি সিং-এর প্রধানমন্ত্রীত্বে কিছু কিছু বাজারমুখী সংস্কার করতে শুরু করে। আর সোভিয়েত ব্যবস্থা ভেঙে থাকার যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শাসকশ্রেণী বিপুল উদ্যমে নেমে পড়লো নেহরু-ইন্দিরা যুগে গড়ে ওঠা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাটি ভেঙে দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিতে বাজারমুখী সংস্কার চালু করতে।

নয়া-উদারবাদের যুগে রাষ্ট্র ও পুঁজি

ভারতবর্ষে নেহরু-ইন্দিরা যুগে যে উন্নয়ন দিশা গড়ে উঠেছিল তাতে ছিল এক অদৃশ্য দ্বিতীয় শক্তি, যে শক্তির নাম সোভিয়েত রাশিয়া। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর যে বুর্জোয়া ভূস্বামী শ্রেণী ক্ষমতায় এসেছিল তারা যে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের পন্থা গ্রহণ করেছিল তার পিছনে ছিল তৎকালীন বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সামাল দেবার স্বার্থে শ্রমিক-কৃষকের উন্নয়ন আকাচখার সঙ্গে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের মেলবন্ধন ঘটানোর বাসনা— 'মিশ্র অর্থনীতি' বা 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি'র মধ্য দিয়ে যা বাস্তবায়িত হয়েছিল। কালক্রমে এই ব্যবস্থাটিই এদেশে এক জটিল আকার ধারণ করে; সমাধানের অতীত বহু দ্বন্দ্বের জন্ম হয় ব্যবস্থাটিতে। ব্যবস্থাটি শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করবে এমন সম্ভাবনা ছিল না বটে, ব্যবস্থাটিতে কিন্তু গড়ে ওঠে অনেক জনমুখী দিক যা ছিল পুঁজির কাছে অনভিপ্রেত। পুঁজি চাইছিলো এই ব্যবস্থাটি থেকে বেরিয়ে আসতে কিন্তু পরিস্থিতি সে পথে হাঁটার অনুকূল ছিল না।

এই অনুকূল পরিস্থিতি তৈরী হয় সোভিয়েত ব্যবস্থা ভেঙে যাবার সাথে সাথে। সারা পৃথিবী জুড়ে এই অবস্থায় আসে বাজারমুখী পরিবর্তন। পরিস্থিতি চলে যায় বাজার মৌলবাদীদের অনুকূলে। বাজার মৌলবাদীদের চিন্তাসূত্র অনুসরণ করে সারা পৃথিবী জুড়েই কায়েম হয় নয়া উদারবাদী অর্থনীতি, যে অর্থনীতির মূল কথা হল উন্নয়নে রাষ্ট্রে ভূমিকা কমিয়ে আনা এবং বেসরকারি পুঁজির গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলা। এদের মতে এটা বুঝতে হবে যে পুঁজি বিনিয়োগ করাটা রাষ্ট্রের কাজ নয়। ঐ কাজটা করবে বেসরকারি উদ্যোগতি। বেসরকারি উদ্যোগপতিকে বিনিয়োগে উৎসাহী করতে হবে অর্থনীতিতে বাজারমুখী সংস্কার ঘটিয়ে। যে সরকারি সংস্থাগুলো গড়ে উঠেছে ইতিমধ্যে, যেগুলিতে আছে সামাজিক মালিকানা, সেগুলির কী হবে? বাজার মৌলবাদীদের মতে সেগুলোতে নিতে হবে বিলগ্নিকরণের পথ। সেগুলি বিক্রি করে দিয়ে সে টাকায় সরকারি বাজেটের ঘাটতি কমাতে হবে। সরকারি বাজেটের সাইজ ছোট করে আনতে হবে কর আদায় কমিয়ে আর বাজার থেকে কম ঋণ তুলে। বিলগ্নিকরণের টাকা বাজেটে ঢুকলে করদাতারা রিলিফ পাবেন, ঋণের বাজারে সরকারি বন্ড বিক্রির দরকারও কমবে এর ফলে। রাষ্ট্র অর্থনীতি চালাতে গিয়ে এত যে ভর্তুকি দেয় সেটাও কমবে বাজারমুখী সংস্কার ঘটলে। মোটের ওপর কথাটা হল, পুঁজিকে নিজের কাজ করতে দাও, উন্নয়ন অবশ্যই ঘটবে এর ফলে। রাষ্ট্রকে আলাদা করে আর উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে না।

১৯৯১ সালের পরের ভারতবর্ষ হাঁটছে এই পথে। পুঁজি ক্রমশ মুক্তি পাচ্ছে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে। ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, বাজারমুখী সংস্কারের হাত ধরে পুঁজি যতই নিয়ন্ত্রণমুক্ত হবে ততই বিনিয়োগের গতিতে ত্বরণ আসবে। বিনিয়োগে ত্বরণ এলে উৎপাদন বৃদ্ধির হারেও ত্বরণ আসবে। উৎপাদন বৃদ্ধির হারে ত্বরণ এলে আয় বাড়বে দেশবাসীর। দারিদ্র্যও কমতে থাকবে দেশ জুড়ে। ১৯৪৭ সালে এই কথা বলার সাহস ছিল না না ভারতীয় শাসককুলের। তখন এই তত্ত্বের পাল্টা তত্ত্ব ছিল অনেক বেশি জোরদার। জোরটা যোগাতো সোভিয়েত রাশিয়া। এখন সেই পাল্টা তত্ত্বের জোর কমেছে। বিনা বাধায় বা স্বল্প বাধায় পুঁজি তার বিচরণ ক্ষেত্র প্রসারিত করার সাহস পাচ্ছে এদেশে। বলা যায় যে, ১৯৪৭ সালের পরবর্তীকালে নেহরু সমাজতন্ত্র গড়ে ওঠার পিছনে পুঁজিবাদের বিপরীত মতাদর্শের বিশ্বব্যাপী ইতিবাচক প্রভাবের যেমন একটা ভূমিকা ছিল, ১৯৯১-এর উল্টো যাত্রার পিছনে আছে এই বিপরীত মতাদর্শের বিশ্বব্যাপী পরাজয়ের প্রেক্ষাপট। পাল্টা মতাদর্শপন্থীদের চোখে সমাজতন্ত্র মৃত। পুঁজিকে তাই আর ভদ্র পোষাক পরিয়ে জনসমাজে হাজির করার দরকার নেই। এখন স্বচ্ছন্দে বলা যায়, উন্নয়নের সহজ পথ হল পুঁজিকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা আর শ্রমকে নিয়ন্ত্রণে আনা। পুঁজি চলবে তার নিজের নিয়মে, তার শাসনে থাকবে শ্রম, সে কাজ করবে বাজার নামক নৈর্ব্যক্তিক ব্যবস্থার মধ্যে। রাষ্ট্র হবে তার ফেসিলিটেটর বা সাহায্যকারী। এই ব্যবস্থাতেই বাড়বে বিনিয়োগ, বাড়বে উৎপাদন এবং আসবে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য। উন্নয়নের গল্পটা এতটাই সরল। এটাকে অনাবশ্যকভাবে জটিল করেছে সমাজতন্ত্রীরা পুঁজিকে শ্রমের শাসনে আনতে গিয়ে। যে সংস্কার কর্মসূচি আমরা আজ দেখে চলেছি ভারতবর্ষে, তার ভাবাদর্শগত প্রেক্ষাপট এটাই।

বাকি ইতিহাস

সংস্কারপন্থীদের সমস্যা হল, যত সহজে বাজারমুখী সংস্কার ধরে চলা যাবে বলে ভাবা হয়েছিলো, কার্যত দেখা যাচ্ছে, অত সহজে এই সংস্কারের কাজ করে ফেলা সম্ভব নয় এদেশে। না হওয়ার কারণ নেহরু-ইন্দিরা শাসনের দীর্ঘ সময় জুড়ে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক উন্নয়নের যে প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোটি গড়ে উঠেছে সেটা এখনও

এই অর্থনীতিতে যথেষ্ট মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এতটাই মজবুত যে চোরাগোপ্তা আক্রমণ করে এটাকে টলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, ভাঙতে হলে আঘাত করতে হবে সরাসরি আর এই সরাসরি আক্রমণের জন্য যে জনস্বীকৃতি আদায়ের দরকার, সেটা আদায় করা আদৌ সম্ভব হচ্ছে না সংস্কারমুখী নীতি-প্রনেতাদের পক্ষে। না হবার কারণ, ব্যবস্থাটি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে নানা ধরনের সুবিধে দিয়েছে, যে সুবিধাটা এক কথায় ছেড়ে দিতে কেউ রাজী নয়।

কৃষি অর্থনীতির কথাই ভাবা যাক। আধাখেঁচড়া ভূমিসংস্কার এদেশে শক্ত করেছে গ্রামীন কুলাকদের অর্থনীতি। কৃষিভিত্তিক রাজনীতির ওপর দাঁড়িয়ে যে কুলাকরা এই বিশাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছে। কৃষকদের খুশি করতে আনা হয়েছে ভর্তুকি-ভিত্তিক সবুজ বিপ্লব, যাতে সেচের জল, সার, কীটনাশক থেকে উৎপন্ন ফসল পর্যন্ত সব কিছুই পেয়েছে সরকারি সাহায্য। এক কথায় তা নাকচ করলে দিল্লীর শাসনই টলে যাবে। বাজারমুখী সংস্কার নিয়েছে চোরাগোপ্তা আক্রমণ করে কৃষির ভর্তুকি নির্ভরতা তুলে দেবার পথ। এতে একদিকে বাড়ছে নানা মাত্রায় কৃষক অসন্তোষ, যার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটছে কৃষক আত্মহত্যায়। অন্যদিকে এটা কৃষি-সংকট বাড়িয়ে অর্থনীতিকেই সার্বিকভাবে বিপন্ন করে তুলছে। সংস্কার অর্থনীতি চালু হবার কুড়ি বছর পরেও এ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না সংস্কারপন্থীরা। সমস্যা বাড়ছে ম্যানুফ্যাকচারিং শিক্ষা থেকে সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রির সর্বত্র। এই ক্ষেত্রগুলিকে উন্মুক্ত করা হয়েছে বিদেশি প্রতিযোগিতার কাছে, আমদানি-পরিবর্ত প্রযুক্তি নীতির অবসান ঘটেছে। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্যোগগুলির ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছে। আপসমুখী দেশি বুর্জোয়া তার চরিত্র অনুযায়ী বিদেশি পুঁজির দুর্বল পার্টনার হয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে, একটা কোনো উৎপাদন ক্ষেত্র নেই যেখানে ভারতবর্ষের পুঁজি বিশ্বমানের প্রতিযোগী হয়ে উঠতে পেরেছে। ভারতের বিদেশি মুদ্রা আহরণের প্রধান উৎস এখনও হীরে কাটার মিস্ত্রিদের শ্রম, কম্পিউটার শিল্পে আমাদের অর্থ আসে সফ্টওয়ার রপ্তানি করে— হার্ডওয়ারে আমরা নেই কোথাও। সঙ্গে আবার এই বিপদ দেখা দিয়েছে যে দেশি বুর্জোয়ার ওপরের অংশের মধ্যে 'ক্রোনি ক্যাপিটাল'-এর চরিত্র আরও জোরদার হয়েছে। আগে এরা শিল্প মন্ত্রকে ঘুষ দিয়ে লাইসেন্স যোগাড় করতো কিংবা অন্যের লাইসেন্স পাওয়া আটকাতো। এখন এরা বিচরণ করে আরও উচ্চস্তরে এবং সামাজিক সম্পদকে বাজার অর্থনীতির নিয়মে বাঁধার কথা বলে জল জমি জঙ্গল আকাশ লুঠ করার ব্যবস্থা করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অর্থবাহিত প্রভাব খাটিয়ে। এই অবস্থায় বাজারমুখী সংস্কার যা হচ্ছে তা সংস্কার কর্মসূচির ন্যায্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলছে।

কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে সংগঠিত শ্রমিক এবং এমনকি অসংগঠিত শ্রমিকদের কেন্দ্র করেও। নেহরু-ইন্দিরা অর্থনীতি নানা কারণে এদের জন্যও এনেছিলো নানাবিধ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। পুঁজি যখন শ্রমের ওপর নিজ শাসন চাপাতে চায়, তখন তাকে আক্রমণ করতে হয় এই সামাজিক নিরাপত্তা বিধিগুলির ওপর। যে দেশে এই বিধির চাপ বেশি, সংস্কার বেশি কঠিন হয়ে পড়ে সে দেশে। ভারতবর্ষ এই এরকম এক সামাজিক সুরক্ষা বিধি শাসিত দেশ। সুরক্ষা বিধিগুলিতে দুর্বলতা আছে সন্দেহ নেই, আছে অসম্পূর্ণতাও। কিন্তু তার জন্য এগুলোকে তুলে দেওয়ার পক্ষে কোনো জনমত গড়া সম্ভব, এমন অবস্থাও নেই। শ্রমিকদের জন্য ইএসআই-এ ত্রুটি আছে। বাজারমুখী সংস্কার চাইবে এই ত্রুটিযুক্ত ব্যবস্থা তুলে দিয়ে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিমা কেনানোর জায়গায় নিয়ে ফেলতে। কোন্ শ্রমিক চাইবে এই বাজারমুখী সংস্কার? কোন্ সঞ্চয়কারী চাইবে পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা শেয়ার বাজারে ঢোকাতে? সংস্কারপন্থীদের পক্ষে পরিস্থিতি সত্যিই কঠিন করে রেখে গেছে প্রাক-সংস্কার ভারতবর্ষ।

সংস্কার কঠিন হয়ে পড়েছে আরও এই কারণে যে সোভিয়েত ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে, পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির পক্ষে জনমত সেই প্রেক্ষিতে জোরদার হয়ে পড়বে সেই সম্ভাবনাও কমছে সাম্প্রতিক কালে। কমার কারণ পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে পুঁজির বিপুল বিপর্যয়, যা স্পেনের বেকারির হারকে একলাফে তুলে দিয়েছে ৪০ শতাংশে আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এনেছে এক দীর্ঘস্থায়ী মন্দা, সম্ভবত যুদ্ধ ছাড়া যা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় নেই পুঁজিবাদের। পুঁজিবাদের এই বিপুল সংকটের খবর ভারতবাসীর অজানা নয়। এই অবস্থায় মুক্ত বাজার অর্থনীতির পক্ষে জনমত গড়ে তোলা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে এদেশের সংস্কারপন্থীদের কাছে।

নেহরু-ইন্দিরা উন্নয়নপন্থা গড়ে তোলার পেছনে অদৃশ্য দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে কাজ করেছিল সোভিয়েত উন্নয়ন মডেল। এই দ্বিতীয় পক্ষটি এখন আর নেই। দ্বিতীয় পক্ষের চাপ কিন্তু এখনও থেকে গেছে পুঁজির পছন্দমতো উন্নয়নপন্থীদের ওপর। এই দ্বিতীয় পক্ষটি তৈরি করে পুঁজি নিজেই। পুঁজিবাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসেই তার প্রমাণ আছে। পুঁজিবাদী বাজারমুখী সংস্কার পথ এ কারণেই এখনও মসৃণ নয় ভারতবর্ষের সংস্কারপন্থীদের জন্য।

বিশ্বপুঁজির আবর্ত : আমাদের সঞ্চয় থেকে ওদের পুঁজি

সুতনু ভট্টাচার্য

বিশ্ব বাজার অর্থনীতি গড়ে তোলার বিশ্বায়ন ও সেই সূত্রে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সংস্কার জমানার দুই দশক পূর্ণ হলো। গত শতাব্দীর নয়ের দশকের প্রথম থেকে এ পর্যন্ত অর্থনৈতিক সংস্কার হিসাবে দেশের সরকার নানাবিধ নতুন আইন বা নিয়মনীতির প্রণয়ন ও পুরোনো নিয়মনীতির পরিবর্তন করেছে। এর তালিকা অতি দীর্ঘ যা তৈরি করা কষ্টসাধ্য কারণ এগুলির অনেকটাই আবার ঘটেছে সাধারণ আলাপ-আলোচনার অগোচরে। কয়েকটি বিশেষ নতুন আইন প্রবর্তন ও পুরোনো আইনের সংস্কার নিয়ে সরকারপক্ষ ও বিরোধীপক্ষের তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সেগুলি খানিকটা হলেও সাধারণের নজরে এসেছে। কিন্তু এর বাইরেও অজস্র পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, পুরোনো আইনগুলির কিছু কিছু অনুচ্ছেদের ধারা ও উপধারার সংশোধন ও সংযোজনে— যা সহসা দৃষ্টিগোচর হয়না। ফলে আজ দুই দশক পার করে অর্থনৈতিক সংস্কারের কারণে কোথায় কোথায় কী কী পরিবর্তন ও প্রবর্তন করা হলো, তার কোনও পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা বোধহয় সরকার বাহাদুরের কাছেও কষ্টসাধ্য ঠেকবে। এগুলির প্রত্যেকটির আলাদা করে যৌক্তিকতা বিচার ও ফলাফলের পর্যালোচনা তাই দুঃসাধ্য কাজ। তাছাড়া সেটা করতে গিয়ে গাছের ভিড়ে জঙ্গলটাই যেতে পারে হারিয়ে।

আসলে অর্থনৈতিক সংস্কারের গোলে-হরিবোলে অনেক কিছুটা ঘটানো হয়ে গেছে। অজস্র পরিবর্তনের সবগুলিই যে ঘোষিত অর্থনৈতিক সংস্কার তা নয়। এগুলি ঘটেছে অর্থনৈতিক সংস্কারের অঘোষিত পথে— ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবসা-বাণিজ্যকে সুবিধা পাইয়ে দিতে। তার ওপর সম্প্রতি এসেছে কর্পোরেটদের বিশ্ব আর্থিক সংকটের প্রেক্ষিতে সরকারি ত্রাণ বা স্টিমুলাস প্যাকেজ দেওয়া। প্রত্যক্ষ কর ছাড় ও ভর্তুকি ছাড়াও আছে কর্পোরেটদের বিভিন্ন অপ্রত্যক্ষ সুবিধা করে দিতে সরকারি নিয়ম-নীতির অবস্থান বা স্টেটমেন্ট অফ পজিশনস। সবেরই কারণ হিসাবে সামনে রাখা হয়েছে অর্থনৈতিক সংস্কার।

অর্থনৈতিক সংস্কার নিয়ে আরেক কাণ্ড ঘটিয়েছে কর্পোরেট পরিচালিত অথবা প্রভাবিত মিডিয়া বা প্রচারমাধ্যমগুলি। ক্রমাগত প্রচারে এরা দুই দশক যাবৎ জনমানসে এটাই প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে চলেছে যে মহান ভারতের মহান কর্তব্য এখন অর্থনৈতিক সংস্কার। এ ছাড়া দেশের ও দশের উন্নতির আর কোনও উপায় নেই। অতএব যে কোনও মূল্যে অর্থনৈতিক সংস্কারটা আমাদের করতেই হবে। এ নিয়ে প্রশ্ন তোলে কেবল দুর্জনেরা। তাই কোনও বিতর্ক হলেই এরা উঠে পড়ে লেগে প্রচার শুরু করে দেয়— হায়, হায়, এমনটা হলে সংস্কার হবে কী করে, আমরা উন্নতি করবো কী করে। এই সুযোগে অর্থনৈতিক সংস্কার ধারণাটিকে ব্যাপ্ত করা হয়ে গেছে অর্থনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে। শুধুমাত্র 'রিফর্ম' কথাটিকে ঘিরেই সৃষ্টি করা হয়েছে এক মোহময় আবরণ, যার নিচে চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলেছে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, প্রতিবাদ ও আন্দোলনের অধিকার। রিফর্মের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে এমনটাই প্রচারিত যে এতকাল নাকি ওই আন্দোলন করেই চলেছে। আর নয়, এবার আমাদের রিফর্মড হতে হবে। রিফর্ম শব্দটির এমন সর্বব্যাপী প্রবল প্রয়োগে আমাদের ভাবনা-চিন্তায়, আলাপ-আলোচনায় জারি হয়ে যায় এক ধরনের জরুরি অবস্থা, আর তারই গোলে-হরিবোলে গুলিয়ে দেওয়া যায় অর্থনৈতিক সংস্কার ব্যাপারটা ঠিক কী— খায়, না মাথায় দেয়!

বর্তমান অর্থনৈতিক সংস্কারের মূল উদ্দেশ্যকে এক কথায় বলা চলে বেসরকারি আর্থিক পুঁজির সৃষ্টি, আহরণ, অবাধ গমনাগমন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রসারিত করা। এই উদ্দেশ্যে নতুন নিয়মনীতির কাঠামো গড়ে তোলা ও পুরোনো নিয়ম-নীতির কাঠামোয় যা কিছু এর বাধা তাকে অপসারিত করাই এই অর্থনৈতিক সংস্কার। প্রাথমিকভাবে একে শুধুমাত্র আর্থিক সংস্কার (ফাইনান্সিয়াল রিফর্ম) বলে মনে করা হলেও এর সীমা বিস্তৃত হয়েছে অর্থনৈতিক সংস্কারে (ইকনমিক রিফর্ম), ও পরিশেষে তাকেও ছাপিয়ে ব্যাপ্ত হয়েছে ভাবনা-চিন্তার দৃষ্টিভঙ্গির রিফর্মে, যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের নীতিনির্ধারক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মহল দুই দশক যাবৎ এই কাজটাই করে চলেছে ও সেই অবকাশে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক সংস্কারের প্রাথমিক কর্মসূচির প্রায় সবটাই প্রায় সাঙ্গ করে এনেছে। বৈদেশিক মুদ্রার চলতি খাতে অবাধ বিনিময় ও মূলধন খাতে কিছু বিধিনিষেধ সাপেক্ষে বিনিময় তো আছেই, সেই সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিলগ্নিকরণ; ব্যাঙ্ক, বিমা ও পেনশন ফান্ডে বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শহরের পরিষেবা, যোগাযোগ ও পরিকাঠামো নির্মাণের বেসরকারিকরণ; আধুনিকীকরণের মোড়কে বিমানবন্দরের বেসরকারিকরণ; বেসরকারি সমুদ্রবন্দর প্রতিষ্ঠা; খনি ও খনিজ উত্তোলনে বেসরকারি শিল্প, এবং সেই সঙ্গে শেয়ার বাজারের পুনর্গঠন, কমোডিটি ফিউচারস ও অপশনস ট্রেডিং ব্যবস্থা, ইত্যাদি সব ব্যবস্থাই প্রায় করা হয়ে গেছে। এর পাশাপাশি পারমাণবিক শক্তি চুক্তি, কৃষিক্ষেত্রে বীজ আইন, কৃষিপণ্যের বাজারিকরণ আইন, দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের ডাক ইত্যাদি কথা আর্থিক সংস্কারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও এদেরকেও ভোলা চলে না। আসলে যা ঘটছে গত দুই দশক যাবৎ তাকে শুধুমাত্র কয়েকটি বিশেষ আর্থিক সংস্কার হিসাবে দেখার চেষ্টা ভুলই হবে।

সংস্কার সাধনে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নাছোড়বান্দা

মনোভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথম ইউপিএ সরকারের আমলে বামপন্থীদের প্রতিরোধের কারণে কয়েকটি সংস্কার কর্মসূচি, যেমন লাভজনক রাষ্ট্রীয় সংস্থার বিলগ্নিকরণ, পেনশন প্রকল্পে বিদেশি সংস্থার প্রত্যক্ষ প্রবেশ ইত্যাদি বাধা পেলেও কেন্দ্রীয় সরকার হাল ছাড়েনি। সংস্কারগুলিকে বড়োজোর স্থগিত রেখেছে, বাতিল করেনি। দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের সামনে কিছু শরিকি রাজনীতির টানাপোড়েন ছাড়া তেমন কোনও সরকারপক্ষীয় বাধা নেই। ফলে এই সুযোগে একের পর এক সংস্কার ঘটিয়েছে বর্তমান সরকার। রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মহল তথা সরকারের উচ্চতম নীতি-নির্ধারকদের সংস্কার সাধনে নাছোড়-বান্দা মনোভাবের প্রমাণ মেলে খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বহুজাতিক পুঁজির বিনিয়োগের সাম্প্রতিক প্রস্তাবে। এর ফলে খুচরো ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বহু মানুষের জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে ও ভারতীয় আর্থব্যবস্থায় এক বিশেষ দুর্যোগ আসবে এই আশঙ্কায় নানা স্তর থেকে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। লক্ষণীয় যে এমনকি শরিক দলগুলির বিরোধিতার চাপে পড়েও কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবটিকে আপাতত স্থগিত বলে ঘোষণা করেছে মাত্র, বাতিল কিন্তু করেনি।

অর্থনৈতিক সংস্কার জমানার দুই দশক পরে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে ভারতীয় আর্থব্যবস্থার বর্তমান হাল কী দাঁড়াল, আর দুই দশক আগে কী ছিল। সার্বিক পর্যালোচনায় যে মূল চিত্রটি ফুটে ওঠে, তাতে দেখা যায় ভারতীয় আর্থব্যবস্থায় বর্তমানে সৃষ্টি হয়েছে এক অভূতপূর্ব অস্থিরতা আর অনিশ্চয়তা। কয়েক বছর আগেও বিশ্বব্যাপী কর্পোরেট আর্থিক সংকটে (২০০৮) দেশের উচ্চতম নীতি-নির্ধারক ও অর্থনীতিবিদেরা বলতে পেরেছিলেন যে আমাদের গায়ে এর আঁচ তেমন লাগবে না কারণ দেশের আর্থব্যবস্থা শক্তিশালী বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত— 'আওয়ার ফানডামেন্টালস আর স্ট্রং'। কয়েক বছরের মধ্যেই, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রমাণ করছে তেমনটা আর নেই। রিফর্ম-পূর্ব আর্থব্যবস্থার যে শক্তিশালী বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, রিফর্মের ঠেলায় তা ক্রমশ নড়বড়ে হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে অভূতপূর্ব উভয় সংকট যার কোনও সমাধান নেই। গত কয়েক বছর যাবৎ ক্রমাগত পণ্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটে চলেছে, বিশেষত খাদ্যপণ্যের। আর্থিক সংস্কারের জমানায় সরকারের হাতে পণ্যমূল্যবৃদ্ধি রোধে সুদের হার বাড়ানো ছাড়া আর কোনও পন্থা, যেমন সর্বজনীন গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ, নেওয়া চলবেনা। অথচ দেখা গেল পণ্যমূল্যবৃদ্ধি রোধে দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মারফত সুদের হার বারংবার বাড়িয়ে এক অসহায় নিষ্ফলতার প্রমাণই শুধু হলো, মূল্যবৃদ্ধি কমল না। পাশাপাশি আরেক বিপত্তি ঘটছে— বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে ডলার প্রতি ভারতীয় মুদ্রার ক্রমাগত মূল্য হ্রাস পাওয়া। ফলে আমদানির খরচ বাড়ছে অথচ বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার কারণে রপ্তানি যে এই কারণে বাড়বে, সেটা হচ্ছে না। স্বভাবতই বৈদেশিক বাণিজ্য খাতে ক্রমাগত ঘাটতি ঘনীভূত হয়ে এক নতুন সংকট সৃষ্টি করতে চলেছে। একে রোধ করতে পন্থা হিসাবে ভাবতে হয় ঠিক উল্টোটা— সুদের হার কমানো। আপাতত ভারতীয় আর্থব্যবস্থা এই উভয় সংকটের গাড্ডায় পড়েছে।

ভারতীয় আর্থব্যবস্থায় যে সংকট ঘনীভূত হচ্ছে তার চিত্রটি বেশ আশঙ্কাজনক। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার কমতে কমতে সম্প্রতি শিল্পোৎপাদনই কমে গেছে। ক্রমাগত কমেছে শ্রমিক কর্মচারিদের কর্মসংস্থান, কমেছে তাঁদের আয়। কৃষির অবস্থাও তথৈবচ। বেশ কয়েক বছর যাবৎ দেশে ক্রমাগত কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে চলেছে। অর্থনৈতিক সংস্কারের সুফল বলতে যে বিষয়টিকে প্রচারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা হলো দেশের জাতীয় আয় তথা জিডিপি-র দ্রুত বৃদ্ধির হার। রিফর্ম-পূর্ব আর্থব্যবস্থায় জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল অতি শ্লথ, যা মোটের ওপর তিন শতাংশে আটকে ছিল। রিফর্ম জমানায় দেখা গেল হঠাৎ-ই মোটামুটি আট-নয় শতাংশ হারে জিডিপি বাড়তে শুরু করে দিল। ব্যাপারটা চমকপ্রদ। যেকথা বলা হয় না তাহল জিডিপির এই বৃদ্ধি এসেছে মূলত পরিষেবা ও আর্থিক ক্ষেত্রের আয় বৃদ্ধি থেকে, যার কোনও শক্তপোক্ত বনিয়াদ নেই এবং যার ফলে সার্বিকভাবে দেশের সাধারণ মানুষের আয়বৃদ্ধির ঘটে না; আয়বৃদ্ধির ঘটে কেবলমাত্র বিত্তবান ও অতি বিত্তবান শ্রেণীর, আর্থিক ক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধিতে যারা লাভবান হয়। এই কারণেই দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক রিফর্মের ফলে এই শ্রেণী অতি দ্রুত ফুলেফেঁপে উঠেছে। ভারতবর্ষ আজ অতি বিত্তবান বিলিওনিয়ার সৃষ্টিতে পৃথিবীর মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছে। মাত্র এক বছরে (২০০৭-০৮) দেখা গেছে ভারতীয় নাগরিক বিলিওনিয়ারদের সংখ্যা একলাফে ২৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫২। এর পাশাপাশি স্তম্ভিত করে দেবার চিত্র হলো পৃথিবীতে সর্বাধিক গরিব মানুষের দেশ ভারতবর্ষ, এবং ২০২০ সালের মধ্যে পৃথিবীর মোট গরিব মানুষের অর্ধেকেরও বেশি থাকবে এই ভারতবর্ষেই।

অর্থনৈতিক সংস্কার নিয়ে প্রচারধর্মী আলোচনায় আর একটি কথা উল্লেখ করা হয় না। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যাঙ্ক, বিমা, পেনশন, খুচরো ব্যবসা, ইত্যাদি সর্বত্র বিদেশি বহুজাতিক পুঁজির আগমনের দ্বার প্রশস্ত না করলে নাকি এসব ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগের অভাবে উন্নতি করা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে যুক্তিটা হলো, দেশীয় পুঁজির বিনিয়োগ যথেষ্ট নয়, বিদেশি পুঁজি চাই। আদৌ কি তাই? ভারতীয় পুঁজির কি অভাব? এই প্রশ্নের উত্তরে আবার অবাক হতে হবে, কারণ বাস্তব বলে অন্য কথা। অর্থনৈতিক সংস্কার জমানায় সুবিধা পেয়ে ভারতীয় পুঁজি ফুলে ফেঁপে উঠে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে— বিদেশে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) ভারতীয় পুঁজির আগ্রহ ক্রমাগত বেড়েছে। ভারতীয় পুঁজির বিদেশে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ২০০৪-০৫ সাল থেকে ২০০৭-০৮ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ১০০.৯ শতাংশ হারে বেড়েছে, যা সারা পৃথিবীর গড় হার থেকে অনেক বেশি।

একথায় বলা হয় ভারতীয় পুঁজির চোখে দেশের থেকে বিদেশই অনেক বেশি পছন্দের। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী ২০১০ সালে বিদেশে ভারতীয় পুঁজির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ঘটেছে ৪৩.৯ বিলিয়ন ডলার, যা এক বছর আগেও ছিল ১৮ বিলিয়ন ডলার। বর্তমান বছরে এই প্রবণতা প্রাথমিক হিসাবে আরও বেশি হয়েছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় ভারতীয় শিল্পপতিরা খনি ও খনিজ শিল্পের মালিকানা কিনতে বিদেশে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ করে চীনকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে। ভারতীয় পুঁজির বিদেশে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ঘটেছে মূলত সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, মরিশাস, আফ্রিকা, নেদারল্যান্ডস্ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

সাধারণ বিবেচনায় বিষয়টি হতবাক করার মতো। আমরা বসে আছি অর্থনৈতিক সংস্কারে বিদেশি বহুজাতিক পুঁজির জন্য দ্বার উন্মুক্ত ক'রে, আর সেই ফাঁকে দেশের পুঁজি বেরিয়ে চলে যাচ্ছে বিদেশে। আর্থিক সংস্কারের প্রয়োজন কেন এই প্রশ্নের উত্তরে এক ধারণা দেওয়া হয় যে যেন এর ফলে পুঁজির বিনিয়োগে দেশের উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি শক্তিশালী হবে, আসবে উন্নত প্রযুক্তি, বাড়বে উৎপাদন ক্ষমতা। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে বক্তব্যটি আদৌ সত্য নয়। বিদেশি পুঁজির মূল লক্ষ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) নয়, এর মূল লক্ষ্য আর্থিক পণ্যের বাজারে ফাট্‌কা বিনিয়োগ (ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট)। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় আর্থিক পণ্যের বাজারে (যেমন শেয়ার বাজার) দামের ওঠা-পড়ায় নির্ধারক ভূমিকা নিয়েছে ফরেন ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টমেন্ট (এফআইআই) বলে পরিচিত বিদেশি পুঁজির ভাণ্ডারগুলি (যেমন, হেজ ফান্ড)। বিদেশি পুঁজির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ যেটুকু হয় তার বড়ো অংশই হলো দেশীয় সংস্থাগুলির মালিকানা হস্তান্তর— মার্জার ও অ্যাকুইজিশন। এতে করে আসলে কিন্তু দেশে কোনও নতুন পুঁজির বিনিয়োগ হয়না। সংস্থাগুলির মালিকানায় দেশীয় পুঁজির পরিবর্তে স্থান করে নেয় বিদেশি পুঁজি। বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের বাকি যা কিছু দেখা যাচ্ছে তার লক্ষ্য ব্যাঙ্ক, বিমা, পেনশন ইত্যাদি আর্থিক পরিষেবা, কৃষিজ পণ্য বিপণী, খুচরো ব্যবসা, এবং খনিজ শিল্প। উন্নত প্রযুক্তি, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি, যাকে বলা হয় গ্রিন ফিল্ড ইনভেস্টমেন্ট, ভারতে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মূল চরিত্রে আদৌ নেই। অন্যদিকে ভারতীয় পুঁজির এ ধরনের বিনিয়োগে আগ্রহ নেই। বিদেশে সম্পদ সৃষ্টিতেই এদের অধিক আগ্রহ।

ভারতে শিল্পসম্পদ সৃষ্টিতে দেশি বা বিদেশি পুঁজির অনাগ্রহের কারণ দু'টি। প্রথমত, শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে সামগ্রিক মন্দা তো আছেই। তার ওপর মুনাফার হার, যে পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হয়, সে তুলনায় কমই। মুনাফালাভও ঘটে দীর্ঘ মেয়াদি পথে। আর্থিক পণ্যের মতো দ্রুত মুনাফা আসেনা। দ্বিতীয় কারণ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের বাজারে ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার মূল্যের অনিশ্চয়তা। সহজ উদাহরণ হিসাবে ভাবা যাক, ভারতে শিল্প-সম্পদ সৃষ্টিতে একলক্ষ ডলার বিদেশি পুঁজির শিল্পবিনিয়োগ ঘটল, যখন ডলার প্রতি ভারতীয় মুদ্রার মূল্য ৪৫ টাকা। অর্থাৎ একলক্ষ ডলার বিনিয়োগ করে বিদেশি পুঁজিপতি ভারতে ৪৫ লক্ষ টাকার শিল্পসম্পদ সৃষ্টি করলো। এবারে অল্প কিছুকালের মধ্যেই যদি ভারতীয় মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য কমে গিয়ে দাঁড়ায় ডলার প্রতি ৫০ টাকা, তাহলে ৪৫ লক্ষা টাকার ভারতীয় সম্পদের দাম গিয়ে দাঁড়াবে ৯০ হাজার ডলার। অর্থাৎ এই কারণেই এক লক্ষ ডলারের বিদেশি পুঁজির ১০ হাজার ডলার লোকসানে উঠে যাবে। এই একই কারণে ভারতীয় পুঁজির লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদেশে পাড়ি দিয়ে ডলারে সম্পদ সৃষ্টি। তাই বিদেশি পুঁজি এখানে আসছে মূলত ফাটকা খেলতে আর দেশীয় পুঁজি বিদেশে চলে যাচ্ছে সেখানে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করতে।

বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক সংস্কার জমানার এই দুই দশকে পুঁজির অভিমুখের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছে। সাবেকি শিল্পায়ন উন্নয়নের পথে দেশের ও দশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনেই আর্থিক সংস্কার এমন বলা নেহাতই কথার কথা। পুঁজি বিনিয়োগের অভিমুখে প্রধান হয়ে স্থান করে নিয়েছে আর্থিক পণ্য, ব্যাঙ্ক, বিমা, পেনশন ও প্রভিডেন্ড ফান্ড, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ইত্যাদি পরিষেবা, কৃষিফার্ম, কৃষিজ পণ্য ব্যবসা, ও কর্পোরেট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় জল, জমি, জঙ্গল, খনি ও খনিজ মালিকানা এবং উপনগরী নির্মাণ। আজ দুই দশক পর একথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে আর্থিক তথা অর্থনৈতিক সংস্কারের কোনও জনহিতকর দিক নেই। বরং পুঁজির অবাধ গমনাগমন ও বিচরণ ক্ষেত্রের প্রসার এবং সাধারণের সঞ্চয়কে আত্মসাৎ করে নতুন পুঁজি সৃষ্টিই এই সংস্কারের অবদান। স্বভাবতই গত দুই দশকে, বিশেষত সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে একের পর এক পরিবর্তন এনেছে যা স্পষ্টতই দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী। এগুলি নিয়ে বিভিন্ন স্তরে প্রতিবাদ ধ্বনিত হলেও কেন্দ্রীয় সরকার পিছপা হয়নি। বড়োজোর সাময়িকভাবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংস্কার স্থগিত রেখেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী যা সব কাণ্ড বা আইন প্রণয়ন করেছে, ইতিপূর্বে আর কোনও সরকারকে এতটা করতে দেখা যায়নি। এর প্রতিফলন দেশের আগামী সাধারণ নির্বাচনে (২০১৪) যে বর্তমান শাসক দলের বিরুদ্ধে যাবার সম্ভাবনা সে বিষয়ে শাসক দলও যথেষ্ট অবহিত। এমনটা নয় যে তারা ভোটে জিতে পুনরায় রাজত্ব করতে চান না। তাহলে কোন্ অদৃশ্য শক্তির কাছে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রভাব প্রতিপত্তিশালী রাজনীতির কারবারিদের টিকি বাঁধা পড়েছে যে তাঁরা অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনে নাছোড়বান্দার মতো লেগে রয়েছেন একান্ত বাধ্য হয়ে? কোথায় কীভাবে এঁদের টিকি বাঁধা পড়ল যে ভোটে হারতে হতে পারে জেনেও এঁরা নিরুপায় — জনবিরোধী হলেও নানাবিধ কাণ্ড করে যেতে হচ্ছে অর্থনৈতিক

সংস্কারের মোড়কে? দেশের উন্নতির জন্য তাদের এই আত্মত্যাগ এমন কথা শুনলে 'কর্তা, ঘোড়ায় হাসব'।

অর্থনৈতিক সংস্কার জমানার ফসল হিসাবে একটি বিশেষ তথ্য উল্লেখ করতে হয়। বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, বিশেষত ট্যাক্স হ্যাভেন বা কর্পোরেট হ্যাভেন ও অফশোর ফাইনান্সিয়াল সেন্টার নামে পরিচিত অতি ক্ষুদ্র স্বাধীন দেশগুলির ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের গচ্ছিত কালোটাকার পরিমাণ অকল্পনীয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কালোটাকা উদ্ধার ও কারা এই টাকা রেখেছে সেই নামগুলি জানা এবং প্রকাশ করার ব্যাপারে সরকারি মহলের অনীহা অতি স্পষ্ট। সর্বোচ্চ আদালতের আদেশ সত্ত্বেও অজুহাত খাড়া করা হয়েছে আন্তর্জাতিক আইন নামক এক ধোঁকাবাজির আশ্রয় করে। এমন কোনও আন্তর্জাতিক আইন আদৌ নেই। আসলে রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী মহলের টিকি বাঁধা পড়ছে অন্যভাবে। বিদেশি এই ব্যাঙ্কগুলি সবই কর্পোরেট পরিচালিত অথবা প্রভাবিত। ভারতীয় কর্তাব্যক্তিদের কার কত কালো টাকা কোথায় গচ্ছিত আছে প্রমাণসহ সেই তথ্য কর্পোরেটদের আঙুলের ডগায় আছে। তাদের নির্দেশিত পথে না চললে এই তথ্য প্রকাশ করে দিতে আন্তর্জাতিক কর্পোরেট মহল দ্বিধা করবে না— এক লহমায় ধূলিসাৎ হবে ভারতের বহু কর্তাব্যক্তির রাষ্ট্রক্ষমতার সাজানো সংসার। তাই টিকি ধরে ওঠ-বোস করানোর মতোই ভারতকে অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে যেতে বাধ্য করানো সম্ভব হয়েছে এই তুরুপের তাসটিকে দেখিয়ে।

অর্থনৈতিক সংস্কার কী ও কেন, কেন ভারতের সরকারি মহল এই সংস্কার জনবিরোধী হওয়া সত্বেও নাছোড়বান্দার মতো লেগে রয়েছে, এই প্রশ্নের উত্তর পেতে অর্থনীতির তত্ত্বকথা ঘেঁটে লাভ হবে না। যে সব অর্থনীতির যুক্তিজাল বিস্তার করার চেষ্টা হয়েছে সে যে একেবারেই ছেলে-ভোলানো রূপকথা— সে কথা বলাই বাহুল্য আজ দুই দশক পার করে। প্রয়োজন তাই বোঝা ভারতের মতো দেশের রাষ্ট্রক্ষমতার রাজনীতি, দুর্নীতি, ও আন্তর্জাতিক কর্পোরেট মহলের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের অলিগলিকে।

ভারতীয় কর্তাব্যক্তিদের টিকি বাঁধা। তাই তাঁরা জনবিরোধী ও ভোটবাক্সে বিরূপ প্রভাব পড়বে জেনেও নিরুপায়— সংস্কার করে যেতেই হচ্ছে কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে। মার্কিন দেশের সরকারকে কর্পোরেট লবি চাপ দেয়— কিছু করে দেখাও, নয়তো সমর্থন পাবে না। ছুটে আসেন মার্কিন দেশের রাষ্ট্রসচিব এদেশে। বৈঠক করেন এদেশের সচিবদের সাথে। তার দু'দিন পরেই দেখা যায় বিভিন্ন বিভাগীয় সচিবরা মিলে খুচরো ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব তৈরি করে। এই ঘটনাপ্রবাহ দেখা গেছে গত ১৯-২৪ জুলাই, ২০১১। কিন্তু এ তো হলো ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার গল্পটির অর্ধাংশ মাত্র। মুদ্রার এক পিঠের উলটো দিকে অন্য পিঠও থাকে। এই গল্পেরও তাই আরেকটি অর্ধাংশ আছে। সে হলো অদৃশ্য শক্তি হিসাবে আন্তর্জাতিক কর্পোরেট মহলই বা কেন ভারতীয় কর্তাব্যক্তিদের টিকি ধরে টেনে অর্থনৈতিক সংস্কার করাচ্ছে। ভারতকে নিয়ে তাদের কীসের এত আগ্রহ? তারা কি ভারতীয় শিল্পোৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগ করে শিল্পায়ন-উন্নয়ন করে সাদামাঠা মুনাফা করতে আগ্রহী? সেসব যে বিশেষ দেখা যাচ্ছে না সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সংস্কারের স্বপক্ষে পথচলতি মেঠো যুক্তি হিসাবে পত্র-পত্রিকায় এমনই এক ধারণা প্রচার করা হয় যে ভারতে ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশাল বিস্তৃত বাজার আছে, যাকে ধরতে বিদেশি পুঁজি এসে এদেশে বড়ো বড়ো শিল্প প্রতিষ্ঠা করবে, ও ফলে দেশে শিল্পায়ন ও উন্নয়ন জোরদার হবে, কর্মসংস্থান হবে। এমন ধারণা নেহাতই বাতুলতা। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পুঁজির চরিত্র ও অভিমুখ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা থাকলে এমন স্বপ্ন কেউ দেখবে না। আন্তর্জাতিক কর্পোরেট পুঁজির ভারতের প্রতি আগ্রহ সাধারণ শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে আদৌ নয়, আগ্রহ ভারতের সঞ্চয়কে আত্মসাৎ করে তাদের পুঁজিতে রূপান্তরিত করা। অর্থাৎ পুঁজি বিনিয়োগ নয়, পুঁজি আহরণই এর মূল লক্ষ্য।

ভারতীয় আর্থব্যবস্থার একটি বিশেষ দিক আছে। সব ক'টি উন্নত দেশের গৃহস্থ ক্ষেত্রে (হাউসহোল্ড সেক্টর) সঞ্চয় প্রায় নগণ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সঞ্চয়ের হার ঋণাত্মক হতেও দেখা গেছে। এর ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা যায় ভারতে। ভারতের গৃহস্থ ক্ষেত্রে নেট রিয়েল সেভিং, অর্থাৎ ধার দেনা বাদ দিয়ে, মূল্যবৃদ্ধিকে হিসেবে এনেও দেখা যায় ভারতীয় গৃহস্থ ক্ষেত্রে বিশাল পরিমাণ সঞ্চয় হয়। এই সঞ্চয়কে শোষণ করতে পারলে বিশ্ব পুঁজি ব্যবস্থায় নতুন পুঁজি আসে। সেটাই ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কার করানোর অন্যতম মূল লক্ষ্য।

বিশ্বায়নের সংজ্ঞা নিরূপণ ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে নানা দিক থেকে। এগুলি নানা দিক থেকে সার্বিক হলেও এদের ভিড়ে অনেক সময়েই হারিয়ে যায় বিশ্বায়নের মূল চরিত্রটি। এই মূল চরিত্রটি হলো বিশ্বায়নের পথে বিশ্ব পুঁজির এক আবর্ত সৃষ্টি করা, যার সঙ্গে সংযুক্তিকরণে শোষিত হতে থাকে দেশ-দেশান্তরে, এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জের মানুষের সঞ্চয়। এই প্রক্রিয়ার এমনটাই যে হয়তো আপনার-আমার মতো এদেশের গরিবের সঞ্চয়, যা ব্যাঙ্কে অথবা মিউচুয়াল ফান্ডে রাখা, তা এক লহমায় চলে যায় মার্কিন দেশে। সেই থেকে সৃষ্ট ঋণ যায় মার্কিন নাগরিকের হাতে। তারা তো সঞ্চয় করার অবস্থায় আর নেই। তাই আপনার-আমার সঞ্চয়ের টাকা ঋণ হিসাবে নিয়ে তারা হয়ত লাস ভেগাসে জুয়া খেলছে অথবা বিয়ার বারে বিয়ার টানছে ক্রেডিট কার্ডে। আমরা জানতেও পারছিনা। অথচ কত কষ্ট করে আমরা এই সঞ্চয়টা করেছি। অথবা এই পথে আমাদের কষ্টের সঞ্চয়ের টাকা গিয়ে ঢুকছে ঋণ-পুঁজি হিসাবে বিত্তবান কর্পোরেটের ঘরে। এসবই ঋণ-নির্ভর তো হয়েছেটো কী। কথায় আছে, 'ঋণং কৃত্যা ঘৃতং পিবেৎ' অথবা 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না'। ব্যাপারটা 'গল্প হলেও সত্যি'। এরই নাম

বিশ্বায়ন। এই পথে ক্রমাগত স্ফীত হতে থাকে বিশ্ব আর্থিক পুঁজির আবর্ত, সৃষ্টি হয় আরও বেশী আর্থিক মুনাফা। কোনও কারণে এই আবর্তের স্ফীতি অবরুদ্ধ হলে মুনাফার হার কমে ঘটতে শুরু করে লোকসান, যা আবর্তটির মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়ে আসে পুঁজির ক্ষয়। এই সংকট থেকে উদ্ধার পেতেও আরও বেশি প্রয়োজন হয় বাইরে থেকে নতুন পুঁজি এনে ফেলা— আবর্তটির বাইরে যেখানে যা কিছু সাধারণের মানুষের সঞ্চয় আছে তাকে শোষণ করে আবর্তটির নতুন পুঁজি সংযোজন (রি-ক্যাপিটালইজ) ছাড়া সংকট মুক্তির আর কোনও পথ থাকে না।

বিশ্ব আর্থিক পুঁজির আর্বতে সাধারণ মানুষের সঞ্চয়কে টেনে আনা চলে তিন ভাবে। প্রথম পথটি আর্থিক পণ্যগুলির প্রতি সাধারণ মানুষের সঞ্চয়কে আকৃষ্ট করা। গৃহস্থ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সঞ্চয় থাকে স্থাবর সম্পদ হিসাবে (জমি-জমা, বাড়ি-গাড়ি ইত্যাদি) অথবা অস্থাবর আর্থিক সম্পদে (নগদ টাকা, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আমানত, সরকারি ও বেসরকারি ঋণপত্র, শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড, ইত্যাদি)। অর্থনৈতিক সংস্কারের একটা বিশেষ লক্ষ্য হলো আর্থিক সম্পদের প্রতি গৃহস্থের সঞ্চয়কে আকৃষ্ট করা। অর্থনৈতিক সংস্কার জমানায় তেমনটাই ঘটতে দেখা গেছে। আর্থিক সম্পদে গৃহস্থ সঞ্চয়ের হার ১৯৭০ দশকে ছিল মাত্র ছয় শতাংশ, যা সংস্কার জমানায় ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১৫ শতাংশ। মোট গৃহস্থ সঞ্চয়ের বেশির ভাগটাই (৫৬ শতাংশ) এই সময়ে দেখা যায় চলে যাচ্ছে আর্থিক সম্পদে।

সাম্প্রতিক বিশ্ব আর্থিক সংকটে এই প্রক্রিয়াটি খানিকটা ব্যাহত হতে শুরু করেছে। আর্থিক সম্পদগুলির প্রতি আস্থার অভাব ঘটায় ও সেই সঙ্গে আর্থিক সংকটের মোকাবিলায় সুদের হার কমানোর ফলে গৃহস্থ সঞ্চয় আর্থিক সম্পদ ছেড়ে পুনরায় স্থায়ী সম্পদের দিকে ঝুঁকেছে, আর্থিক সম্পদে গৃহস্থ সঞ্চয়ের হার ১৫ শতাংশ থেকে কমে ১১ শতাংশ হয়ে গেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক কালে রিজার্ভে ব্যাঙ্কের ক্রমাগত সুদের হার বাড়িয়ে চলাকে বুঝতে হবে। মূল্যবৃদ্ধি রোধের উদ্দেশ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত এক বছরে বারংবার সুদের হার বাড়িয়েছে এমন একটা জিগির সামনে রাখলেও আসল উদ্দেশ্য তা নয়। সুদের হার বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি কমে বটে, কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি কমবে এমনটা বলা যায় না, বিশেষত সেই মূল্যবৃদ্ধি যদি সাধারণের মূল খাদ্যপণ্যে ঘটতে থাকে। বাস্তবে তাই বারংবার সুদের হার বাড়িয়েও মূল্যবৃদ্ধি কমতে দেখা যায়নি। তা সত্ত্বেও সুদের হার বাড়িয়ে চলার মূল কারণ গৃহস্থ সঞ্চয়কে আর্থিক সম্পদে টেনে আনার স্রোতটিকে অব্যাহত রাখা।

গৃহস্থ সঞ্চয়কে শোষণের দ্বিতীয় পথটি সাধারণ খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি। এর ফলে গৃহস্থের সঞ্চয়টাই যায় কমে, কারণ তার আর সঞ্চয় করার সামর্থ্য থাকে না। আর সেটাই বাড়তি আর্থিক মুনাফা হিসাবে সরাসরি জমা হতে থাকে প্রাথমিক ভাবে খাদ্যপণ্য ব্যবসায়ীদের খাতায়, যেখান থেকে তা চলে যায় আর্থিক পুঁজির আর্বতে। এমনটাই যে ঘটছে তার প্রমাণ মেলে গৃহস্থ সঞ্চয়ের হার সাম্প্রতিক কালে কমে আসার তথ্যে। ভারতীয় আর্থব্যবস্থার একটি শক্তিশালী বনিয়াদ ছিল গৃহস্থ ক্ষেত্রে নেট রিয়েল সেভিংস। ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফলে এটাও ক্রমশ কমছে। সাধারণ গৃহস্থ মানুষ ক্রমাগত সম্পদহীন হয়ে পড়ছে।

গৃহস্থের সঞ্চয়কে পুঁজির আর্বতে নিয়ে ফেলার তৃতীয় পন্থাটি হলো বিমা, পেনশন, প্রভিডেন্ড ফান্ড প্রকল্পগুলিকে বেসরকারি ও বিদেশি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া ও আর্থিক পণ্যের বাজারে বিনিয়োগ করা। ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারের একটি অন্যতম দিক এটাই। যদিও শিল্পায়ন-উন্নয়নের যুক্তি সামনে রাখা হয়, কিন্তু তার কারণে এর কী প্রয়োজন সে কথা ব্যাখ্যা করা হয় না।

বিশ্ব আর্থিক পুঁজি আবর্তটির প্রয়োজন যে ভারতের গৃহস্থ সঞ্চয়কে শোষণ করেই মিটে যাবে তা নয়। এর ক্ষুধা অসীম। যত পাবে ততই তার প্রয়োজন বাড়বে। তার ওপর সাম্প্রতিক আর্থিক সংকটে আর্থিক পুঁজির ক্ষয় হয়েছে। নতুন পুঁজি এনে তাকে মেরামত না করলে আবর্তটি ঠিক মতো চলতে পারছে না আগের মতো তেজি হয়ে। সঞ্চয়ের আগে তো আয়। সুতরাং এই পর্যায়ে এসেছে পুঁজি আবর্তের বাইরে অবস্থিত আয় বা জীবিকার ক্ষেত্রগুলিকে কর্পোরেট ব্যবস্থায় এনে ফেলে এই আয়কেই শোষণ করা। সম্প্রতি কৃষিতে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং বা চুক্তি-চাষ এবং খুচরো ব্যবস্থাকে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এই উদ্দেশ্যে।

সাধারণ কৃষক তার উৎপাদনকে বিক্রি করে যাবতীয় খরচ মেটানোর পর যা পায়, অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা দোকানদার কেনাবেচা করে যা পায় তাকে আক্ষরিক অর্থে মুনাফা বললেও তা আদৌ নয়। এগুলি তাদের জীবিকা, এই দিয়েই তাদের বেঁচে থাকা, সংসার চালানো। কিন্তু এদেরকে উৎখাত করে যদি এই আয়গুলি কর্পোরেটদের ঘরে ঢোকে তাহলে তা হয়ে দাঁড়ায় বিশুদ্ধ মুনাফা ও তা যুক্ত হয়ে যায় বিশ্বপুঁজির আর্বতে। সারা পৃথিবী জুড়ে এই কারণেই এক অবাক করার মতো ছবি তৈরি হয়েছে— গড় আয় হিসাবে অতি বৃহৎ ১৫টি কর্পোরেট সংস্থার এক একটির আয় অধিকাংশ দেশের জাতীয় আয়ের থেকেও বেশি (মাত্র ৩৫টি দেশ বাদে) হয়ে গেছে।

ভারতীয় আর্থব্যবস্থা আজ আক্রান্ত। অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে বিশ্বপুঁজি তথা কর্পোরেট পুঁজির আক্রমণে গত দুই দশক যাবৎ, বিশেষত সাম্প্রতিক কয়েক বছরে, ভারতীয় আর্থব্যবস্থায় নানান ওলট-পালট ঘটে চলেছে। সৃষ্টি হয়েছে অভূতপূর্ব অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা। আশঙ্কা হয় বিশ্ব আর্থিক সঙ্কটের ফলে এই আক্রমণ তীব্রতর হবে। দুর্নীতি ও কালোটাকার কানা গলিতে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী কর্তাব্যক্তিদের টিকি বাঁধা পড়েছে। এই আক্রমণ প্রতিরোধ তো নয়ই, এঁরা বাধ্য আরও বেশি করে এই পথেই দেশকে চালিত করতে।

'বিশ্বায়ন' সংকটে, এ সংকট বিশ্ব পুঁজিবাদেরই সংকট

ফারুক চৌধুরী

বিশ্বায়ন নতুন কিছু নয়। এ প্রক্রিয়া চলছে কয়েকশো বছর ধরে। পুঁজিবাদের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ১৪৯২ সাল থেকে, এমনকি তারও আগে থেকে ভালভাবেই চলছিল। বিশ্বায়ন একটা প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা নয়। তবে এ প্রক্রিয়া একই ধরনের নয়, তা আমূল নতুন কোনো পর্বেও প্রবেশ করেনি। মার্কস ও এঙ্গেলস যা বলেছেন, সেটা বিশ্বায়নেরই বিবরণ।

তবে, মূল ধারার বুদ্ধিবৃত্তিগত চর্চায় বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন, আলোচনা ও প্রচার করা হয়, যেন বিশ্বায়ন নতুন কিছু। উচ্ছ্বাস, আবেগ, ভাবালুতার পাশাপাশি নতুন নতুন তত্ত্ব পেশ করা হতে থাকে। মূল ধারার গবেষণায়, অধ্যয়নে, বিষয়টি স্থান পায় ১৯৭০-এর দশক থেকে। এদের এক অংশ বিষয়টিকে দেখেন উৎপাদন, লগ্নি, ভোগ ও বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংযুক্তি হিসেবে; আরেক অংশ দেখেন নতুন বহুজাতিক বা বিশ্ব জোড়া সাংস্কৃতিক ধরন, চর্চা, প্রবাহ ও বিশ্বসংস্কৃতি হিসেবে; অপর অংশ দেখেন বিশ্বজোড়া রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসাবে; চতুর্থ অংশটি দেখেন পৃথিবীর নানা দিকে জনসাধারণের অভূতপূর্ব বহুমুখী চলাচল, অভিবাসন হিসেবে; এবং পশ্চিম অংশটি দেখেন নানা ধরনের বৈষম্য, বিশ্বে আধিপত্য হিসেবে। ফলে, মূল ধারাতেই বিশ্বায়নের নানা সংজ্ঞা দেখা দেয়।

তবে, সারবস্তুগত দিক থেকে কোনো সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যাই পুঁজির ক্রমবিস্তারকে এবং পুঁজির মূল ভূমিকাকে অস্বীকার করতে পারে নি বা পারে না। কারণ, বিশ্ব জুড়ে যা কিছু বিস্তার, চলাচল, প্রবাহ ইত্যাদি, তার সবই ঘটাচ্ছে পুঁজি, নিজ প্রয়োজনে, প্রকৃত অর্থে, লোভে। ফলে বিশ্বায়ন বলতে যে বাস্তবতা ফুটে উঠলো, তা পুঁজিবাদের বিশ্বায়ন, সাম্রাজ্যবাদের যুগে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, তা ঘটলো পুঁজির ক্ষেত্রে, শ্রমের ক্ষেত্রে, আর এর ফলে জ্ঞানে ও প্রযুক্তিতে, এ বাস্তবতাই ফুটে উঠলো তথাকথিত বা বহুপ্রচারিত বিশ্বায়ন নিয়ে মূল ধারার নানা আলোচনা, বক্তব্যে, তথ্যে, যেমন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) এক বক্তব্যে পণ্য, পুঁজি ও জনসাধারণ বিশ্বায়িত হওয়ার উদাহরণ হিসেবে বলা হলো:

(১) বিশ্ব জিডিপি-র শতাংশ হিসেবে বাণিজ্যের (সামগ্রী ও পরিষেবা) মূল্য ১৯৮০ সালে ৪২.১% থেকে বেড়ে ২০০৭ সালে দাঁড়ায় ৬২.১%;

(২) বিশ্ব জিডিপি-র অংশ হিসেবে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ১৯৮০ সালে ৬.৫% থেকে বেড়ে হয় ২০০৬ সালে ৩১.৮%;

(৩) বিশ্ব জিডিপি-র অংশ হিসেবে প্রাথমিক ব্যাংক ঋণ ১৯৮০ সালে প্রায় ১০% থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ২০০৬ সালে ৪৮%;

(৪) মাথাপিছু হিসেবে আন্তঃসীমান্ত টেলিফোন কলের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সময়কাল ১৯৯১ সালে ৭.৩ মিনিট থেকে বেড়ে হয় ২০০৬ সালে ২৮.৮ মিনিট; এবং

(৫) বিদেশি মজুরের সংখ্যা ১৯৬৫ সালে ৭৮ মিলিয়ন বা ৭ কোটি ৮০ লাখ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ২০০৫ সালে হয় ১৯১ মিলিয়ন বা ১৯ কোটি। এ হার ১৯৬৫ সালে ছিল বিশ্ব জনসংখ্যার ২.৪% এবং ২০০৫ সালে ছিল ৩%। বিশ্ব লগ্নি বাজার বেড়েছে নাটকীয়ভাবে। বিশ্ব পুঁজি প্রবাহ ২০০৬ সালে দাঁড়ায় ৭.২ ট্রিলিয়ন ডলার বা ৭.২ লক্ষ-কোটি ডলার। এ পরিমাণ ১৯৯৫ সালের তুলনায় তিনগুণ।[১]

এভাবে, নানা প্রতিবেদনে, গবেষণা নিবন্ধে উল্লেখ পাওয়া যাবে কথিত বিশ্বায়নের "সুফল" অর্থাৎ, পুঁজির প্রায়-নিরঙ্কুশ অবাধ প্রবাহ, প্রায়-নিরঙ্কুশ নিশ্চিন্ত পরিবেশে মুনাফা বৃদ্ধি, বড় আকারের পুঁজির প্রবল আধিপত্য। মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। হার্লে-ডেভিডসন মোটর কোম্পানি ২০০৩ সালে কোম্পানি গঠনের শতবর্ষ উদযাপন করে। সেই সাথে, ঘোষণা করে যে, এ নিয়ে পর-পর ১৮ বছর ধরে কোম্পানির রেকর্ড পরিমাণ আয় হয়েছে। উত্তর আমেরিকায় বাজারের ৪৮% এ কোম্পানির দখলে। অথচ, ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বাজারে এ কোম্পানির দখল নেমে গিয়েছিল ২৫%-এ। উন্নত প্রযুক্তি ও উৎপাদনের উন্নত ধরন ব্যবহারের পাশাপাশি বাণিজ্য আয়োজন, পুনর্গঠন, সংস্কার ইত্যাদি বাজার দখল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতায় ভারত ওইসিডি ভুক্ত দেশগুলোর চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। অথচ, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে, বিশেষ করে সফ্টওয়্যার ও টেলিযোগাযোগ পরিষেবা ক্ষেত্রে এ পার্থক্য হ্রাসমান। ভারত ১৯৯০-এর দশকে পরিষেবা রপ্তানি ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষ ১৫ রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে সর্বাধিক প্রবৃদ্ধি দেখায়। একইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় গাড়ি শিল্প, অস্ট্রেলিয়ায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প, স্লোভাক প্রজাতন্ত্রে বস্ত্র শিল্প; কেনিয়ায়, চিলিতে, লেসোথোতে; এবং নানা ক্ষেত্রে, শিক্ষা-শিল্পে/বাণিজ্যে[২], স্বাস্থ্য-শিল্পে/বাণিজ্যে এমন "সুফলে"র বয়ান পাওয়া যাবে।[৩]

এগুলোর সারকথা: পুঁজি প্রবাহ বেড়েছে, বাণিজ্য বেড়েছে, মুনাফা বেড়েছে, পুঁজি ও মুনাফা আনা-নেওয়ায় বাধা কমেছে, এ সবের অনুকূল রাজনীতি, শাসনব্যবস্থা সবল হয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এ সব 'বৃদ্ধি', 'সবল', 'অনুকূল' কাদের

স্বার্থে যায় বা কার পকেটে জমা হয়।

'বিশ্বায়ন' বলতে যা বোঝানো হয়, তার একটি বাস্তবানুগ জনস্বার্থানুকূল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ফিদেল কাস্ত্রোর একটি বক্তৃতায়।[৪] তবে, মূলধারায়, এমনকি, কথিত বিশ্বায়নের পক্ষে কাজ করেন, গলা চড়ান যারা/যেসব প্রতিষ্ঠান, তাদের মধ্য থেকেও এই বিশ্বায়নের সমালোচনা, ত্রুটি, অসঙ্গতি, ক্ষতিকর দিকগুলো উল্লেখিত হচ্ছে। আজ এমন সমালোচনা অনেক। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ স্টিগলিৎসের একটি বক্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ করলে এ বিশ্বায়নের চরিত্র ও চেহারা, কর্ম ও ফল স্পষ্ট হবে। তাঁর কথা, সংক্ষেপে এইরকম:

উন্নয়ন ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এসেছে। প্রবৃদ্ধির সুবিধা পেয়েছে বেশি আয়ের লোকেরা। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অপরাধ, বৈষম্য, অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত মানুষদের সংখ্যা বেড়েছে। চাকরির সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই। আয় কমেছে ব্যাপকভাবে। দেশে-দেশে এবং অধিকাংশ দেশের ভেতরে বৈষম্য বাড়ছে। পুঁজি-বাজারের উদারীকরণ লাতিন আমেরিকাকে অস্থিরতার মধ্যে ঠেলে দেয়। আফ্রিকায় মাথাপিছু আয় কমে। ব্যক্তি-মালিকদের কাছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ/প্রতিষ্ঠান বিক্রি করার কাজটি ছিল দুর্নীতিগ্রস্থ। লগ্নি ক্ষেত্রে অস্থিতি। গত ৩০ বছরে ১০০টি সংকট দেখা গেছে। অর্থ গরিব দেশগুলো থেকে যাচ্ছে ধনী দেশগুলোতে; ঝুঁকির বোঝা বইছে গরিব দেশগুলো। এ দেশগুলোর মধ্যে অনেকের ঘাড়ে বিপুল ঋণের বোঝা। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ-রক্ষায় অনেক করা হয়েছে, কিন্তু বিনিয়োগকারীদের হাত থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর পরিবেশ রক্ষায় করা হয়েছে সামান্যই। প্রাকৃতিক সম্পদরাজি নিয়ে নেওয়ার পরে বিনিয়োগকারীরা নিজেদের রক্ষায় সীমিত দায়ের ব্যবস্থাকে কাজে লাগায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি যথাযথ নয়। ৭০% সুবিধা পেয়েছে উন্নত দেশগুলো, অধিকাংশ সুবিধা পেয়েছে ধনী দেশগুলো, একেবারে কম উন্নত ৪৮টি দেশকে আরো খারাপ অবস্থায় ঠেলে দেয়া হয়েছে। গরিব দেশগুলো থেকে আসা পণ্যসামগ্রীর ওপর ওইসিডি-ভুক্ত দেশগুলোর আরোপিত শুল্কের গড় হার ওইসিডি-ভুক্ত দেশগুলো থেকে আসা সামগ্রীর ওপর আরোপিত শুল্ক হারের চেয়ে চার গুণ বেশি। ধনী দেশগুলো গরিব দেশসমূহকে মোট যে পরিমাণ উন্নয়ন সহায়তা দেয়, বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের ফলে গরিব দেশগুলোর কাছ থেকে মাসুল তোলে তার চেয়ে তিন গুণ বেশি। কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতি সামান্য। ওই সিডিভুক্ত দেশগুলো কৃষিতে ভর্তুকি দিয়ে চলেছে, এ হার মোট কৃষি উৎপাদনের ৪৮%, এটা ১৯৮৬ সালের তুলনায় মাত্র ৩% কম। কৃষিক্ষেত্রে এ সব দেশ চড়া শুল্ক হার বজায় রেখেছে; উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নতুন বোতলে পুরনো মদ তুল্য, এমনকি কোনো কোনোটি উন্নয়ন বিরোধী। এমনকি উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা যদি সফলও হয়, তাহলেও তা উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামান্যই কল্যাণ করবে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের প্রতিশ্রুতিগুলো ভেঙ্গেছে।

সমস্যা কেবল কৃষিতে নয়, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতেও। সেখানেও শুল্ক হার বাড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজ বাজার গরিব দেশগুলোর কাছে খুলে দিতে অস্বীকার করছে। পৃথিবী গরম হয়ে চলেছে; এটা বিশ্বজোড়া সামাজিক অবিচারের আরেকটি ক্ষেত্র। দূষণের প্রধান উৎস উত্তর গোলার্ধ, এর প্রধান পরিণতি ভোগ করে দক্ষিণ গোলার্ধ। স্বল্প-মেয়াদি বাণিজ্যিক স্বার্থে পরিবেশকে বলি দেয়া হয়। জীবন রক্ষার ওষুধ মানুষ পাচ্ছেন কম। পরিবেশ বাবদ উন্নয়নশীল দেশগুলো কোন খেসারত পায় না। ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান রক্ষা করা হচ্ছে না; ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি কম-জোর করে দেয়া হচ্ছে। ডব্লুটিও বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম-কানুনের কারণে এ সংস্কৃতিকে সহায়তা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের নানা শর্তসহ অন্যান্য কারণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ভন্ডুল হচ্ছে। বিশ্ব পরিচালন ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক হয়ে পড়ছে আরো বেশি। উন্নয়নশীল দেশগুলোর কথা শোনা হয় না, কখনোও শোনা হলেও তা কানে তোলা হয় না। বিশ্ব পরিচালন ব্যবস্থায় উত্তর গোলার্ধের ও বিশেষ স্বার্থগুলোর আধিপত্য। অগ্রসর দেশগুলো বিধিবিধান তৈরি করে নিজেদের জন্য বা তাদের মধ্যে থাকা বিশেষ স্বার্থগুলোর জন্য। বিশ্ব পরিচালন ব্যবস্থার সমস্যাগুলো ফুটে ওঠে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল পরিচালনার সমস্যাগুলোর মধ্যে। এ ব্যর্থতা অগ্রসর, শিল্পায়িত দেশগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের ব্যর্থতাগুলোর প্রতিফলন। বিশ্বায়নকে যেভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে তা গণতন্ত্রকে ভন্ডুল করেছে, গণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ কমিয়েছে। গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার, "সামাজিক সংহতি", এমনকি, "আইনের শাসন" সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি সীমান্তে গিয়ে পাল্টে যায়। বাণিজ্যিক স্বার্থ হাসিল করতে "যুক্তরাষ্ট্র নতুন অবস্থানকে কাজে লাগিয়েছে, প্রায়ই তা করেছে এক তরফাভাবে। বিশ্বায়নের বাড়াবাড়িকে প্রশমিত করার পন্থা আমাদের শিখতে হবে।[৫]

স্টিগলিৎসের এ বক্তব্যের পরে কথিত বিশ্বায়নের চরিত্র, প্রকৃতি, 'সুফল', ইত্যাদি নিয়ে আর আলোচনার দরকার হয় না।

'বিশ্বায়নের' বাস্তবতার আরেকটি দিক ফুটে উঠেছে একটি গবেষণার সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদনে।[৬] জুরিখে সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (ইটিএইচ) প্রকাশিত এক গবেষণা-প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: সারা দুনিয়ায় সব বহুজাতিক কোম্পানির মোট আর্থিক মূল্যের ৪০% নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র ১৪৭টি কোম্পানি। এগুলোর মধ্যে শীর্ষ ৪৫টি কোম্পানি কাজ করে আর্থিক শিল্পে। নিয়ন্ত্রণের বিপুল অংশ প্রবাহিত হয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে।

পুঁজিবাদের বহু প্রশংসিত বিশ্বায়নের প্রকৃতি খাদ্য নিয়ে ফাটকাবাজির দিকে তাকালে স্পষ্ট ধরা পড়ে। এ বিষয়ে এক খবরে বলা হয়: লগ্নি পুঁজি নিয়ে আর্থিক ফাটকাবাজি করেছিল যারা, তারাই খাদ্যের বাজারেও ফাটকাবাজি শুরু করে। খাদ্য বাজারে ফাটকাবাজি নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয় ১৯৯০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে। আর্থিক সংকটের পরে ফাটকাবাজরা যায় খাদ্য বাজারে। খাদ্য ফাটকাবাজির নতুন, অবাস্তব বাজার তৈরি হয়। এটা ২০০৭-২০০৮ সালে বৃদ্ধি পায়।[৭]

শ্রম বাজারের চিত্রও আশাপ্রদ নয়। নয় স্বস্তিকর। বরং, তা শঙ্কা জাগায়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বিভিন্ন প্রতিবেদন এ কথাই বলে। খোদ ওইসিডি বলেছে: অফশোরিং বা অন্য দেশে কাজ করিয়ে নেয়া মজুরদের বিপন্ন করার অন্যতম উৎস। কারণ, তা করা হলে কাজ ও মজুরি আরো কমে যেতে বাধ্য। ওইসিডি-র সদস্য-দেশগুলোর মধ্যে ১৭টিতে মজুরি বৈষম্য দেখা দেয়; ১৯৯৫-২০০৫ সালে সর্বোচ্চ উপার্জনকারীদের আয় সর্বনিম্ন উপার্জনকারীদের চেয়ে অধিকতর দ্রুত বাড়ে।[৮]

বিরোধটি পুরনো

একেবারেই সংক্ষেপে পেশ করা এ সব তথ্য থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিশ্বায়ন নামে কথিত পুঁজিবাদী প্রক্রিয়াটির চরিত্রগতভাবেই কয়েকটি বিরোধ বা দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি পদানত করছে জগৎ-সংসার আর তীব্রতর করছে দ্বন্দ্বগুলোকে। এগুলো পুঁজিবাদের সূচনাপর্ব থেকেই চলছে। এর সাথে যোগ হয়েছে পুঁজিবাদের তৈরি করা নতুন-নতুন সংকটের, দ্বন্দ্বগুলির তীব্রতা বৃদ্ধি। পুরনো দ্বন্দ্বগুলির কয়েকটি হচ্ছে:

(১) শ্রমের সাথে বিরোধ;

(২) জীবন ও পরিবেশ প্রতিবেশের সাথে বিরোধ;

(৩) অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা হেতু বিরোধ;

(৪) পুঞ্জীভবনের ক্ষেত্রে বিরোধ;

(৫) নবায়নযোগ্য নয়, এমন সব উপাদান/কাঁচামাল কুক্ষিগত করা, ক্ষয় করা ও এগুলো ছাড়া গতি বজায় রাখতে না পারার বিরোধ;

(৬) ব্যাপক জনগণের সাথে বিরোধ। মূল বিরোধ রয়েছে উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যেই।

এগুলো থেকে মুক্ত হতে পারেনি বিশ্বায়ন নামের প্রক্রিয়াটি। ফলে তা পড়েছে সংকটে। ফলে প্রক্রিয়াটি আজ প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

এর সাথে দুটি দিক যোগ হয়েছে, যা এ প্রক্রিয়ার সংকটটি বাড়িয়ে দিয়েছে। এর একটি হচ্ছে: গত কয়েক দশক ধরে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চলতে থাকা স্থবিরতা এবং এর ফল হিসেবে দ্বিতীয়টি, চলতি আর্থিক তথা অর্থনৈতিক সংকট। স্থবিরতার মধ্যে থেকে, একচেটিয়া লগ্নি পুঁজির ফাটকাবাজির দাপট বজায় রেখে দিকে-দিকে বিস্তৃত হওয়ার জন্য পুঁজিবাদের অভিযান তাই সংকটে পড়েছে। আজ বিশ্ব পুঁজিবাদের কোনো কোনো অংশে ক্ষয়, কোনো কোনো অংশে ফাটল, কোথাও কোথাও তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ফলে, বিশ্বায়ন নামের প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এ বাস্তবতার স্বীকৃতি পাওয়া যায় মূলধারারই স্বীকৃতিমূলক উচ্চারণে। তার মাত্র কয়েকটি এখানে অতি সংক্ষেপে উদ্ধৃত হলো:

(১) বিশ্ব অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা আবার দেখা দেওয়ার সময় এখন। ২০১১ সালের শুরুতে মনে হয়েছিল অর্থনীতির স্থবিরতা কেটে যাবে। কিন্তু, ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় বছরের মাঝামাঝি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ইউরোপে রাজনৈতিক বিবাদ চলছে। তা সরকারগুলোর সামর্থ্য সম্পর্কে প্রত্যাশাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে।

(২) বিশ্বায়নের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই সংকটে। দেশটি সমস্যার পর্বে প্রবেশ করছে একেবারে অর্থনীতির অন্তঃস্থল থেকে। এখন ইউরোপেও ভেতর থেকে ধ্বসে পড়া শুরু হয়েছে। ইউরোপ সংহত হচ্ছে, এমন ধারণা বিদায় নিচ্ছে। বিশ্ব রয়েছে বিরাট ঝুঁকির মধ্যে। বড় ধরনের নতুন কোনো ধাক্কা সামলানোর সামর্থ্য পুঁজিবাদী বিশ্বের নেই। আর্থিক সংকট বিশ্বের অর্থনৈতিক সহ্যক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইনস্টিটিউট ফর সিকিউরিটি স্টাডিজ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স কাউন্সিলকে উদ্ধৃত করে গ্লোবাল রিস্কস্ প্রতিবেদনে বলা হয়: ব্যাপক সংস্কার না করা হলে চলতি পরিচালন কাঠামো বিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলোর সাথে তাল মেলাতে পারবে না।[৯]

সংকটটি একমুখী নয়

যে সংকটের কথা এখানে মূলধারা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, তা একমুখী নয়। তা কেবল অর্থনৈতিক বা কেবল রাজনৈতিক নয়; নিরাপত্তা বা ঝুঁকিও কেবল রণনীতিগত বা রণকৌশলগত বা সামরিক নয়। তা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক; তা অন্যান্য ক্ষেত্রে ধরা পড়ছে। এই সংকট ও ঝুঁকি বিশ্ব অর্থনীতির। এ বিশ্ব অর্থনীতি পুঁজিবাদী, আর কথিত বিশ্বায়ন ও পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির অন্তর্জাত একটি প্রক্রিয়া মাত্র। তাই, সংকটটি কথিত বিশ্বায়নেরই। যে পৃথিবীতে রাশিয়ায় দাবানল শুরু হলে বিশ্ব খাদ্য বাজারে দাম চড়ে আর তার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে বিস্ফোরিত হয় চাপা থাকা সামাজিক অসন্তোষ, সে পর্বের পৃথিবীতে বিশ্বায়নের সংকট চিনে নিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এর পর ৫৮ পৃষ্ঠায়

বিশ্বায়নের জলছবি

আশিসকুসুম ঘোষ

দুই দশক ধরে ভারত বিশ্বায়নের রথে। দেশের বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন ও অন্যান্য ব্যবস্থা কেবলমাত্র মুনাফা ভিত্তিক। মূল লক্ষ্য দেশি ও বিদেশি শিল্প মালিকদের সব থেকে বেশী মুনাফা করার পথে সব বাধা হটিয়ে দেবার।

এই প্রক্রিয়ায় সব থেকে বেশি আক্রান্ত দেশের সাধারণ শ্রমিক। দিনের পর দিন কমছে মজুরি। বাড়ছে কাজের সময়। নেই কাজের সাথে যুক্ত থাকার সামান্য নিরাপত্তা। দেশের শ্রমশক্তির ৯৪ শতাংশ শ্রমজীবী মানুষ যাঁদের অবদান জিডিপি-র ৬০ শতাংশের বেশি তাঁরা মালিকপক্ষের খেয়ালখুশির ও দয়ার দানে জীবন ধারণ করেন। সামান্য মর্যাদা নেই। আগামীকাল কী হবে এই ভাবনায় সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রতি রাতে পরিবারসহ খিদে পেটে ঘুমোতে যেতে হয়।

একটি প্রতিষ্ঠিত ও নামী স্কুলে অভিভাবকদের ডাকা হয়েছিল। অভিভাবকেরা ভেবেছিলেন ছেলে-মেয়েরা হয়ত স্কুলের নিয়ম ভেঙেছে বা পরীক্ষার ফল আরও ভাল করার কথা হবে। যা আগেও হয়েছে। চোখ গোলগোল করে তাঁরা শুনে এলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছেন এই ছাত্রছাত্রীরা আগামী দিনে যখন কাজের বাজারে যাবে ততদিনে স্থায়ী কাজ বলে কিছু থাকবে না। থাকবে না কোন রকম সহায়তা। আজ এখানে কাল ওখানে, আজ এই কাজ কাল সেই কাজ এইভাবে চলতে হবে। টিকে থাকতে হবে। এদের মানসিকতা যাতে সেইভাবে তৈরি হয় সেই ব্যবস্থা শুধু তারা করলেই হবে না, অভিভাবকরাও নিজেদের অতীত ধ্যানধারণা ছেড়ে এগিয়ে চলুন। আজকের সময় তাই বলছে।

বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ার তৈরির কলেজ থেকে পুত্র ডিগ্রিধারি ইঞ্জিনিয়ার। কলেজের পড়ার খরচা যোগাতে শেষ সম্বল প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুইটির টাকা শেষ। তবু সন্তান থাকবে দুধে-ভাতে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। চতুর্থ বছরেই কলেজে এসে বহুজাতিক সংস্থা নিয়োগের আশ্বাসপত্র দিয়ে গেছে। ডিগ্রি পকেটে। আশ্বাসপত্র থাকা সত্ত্বেও বহু সময় পার করে আমন্ত্রণ এল কাজে যোগদানের। রাজ্যের বাইরে। বহুজাতিক সংস্থার কর্ণধাররা বললেন থাকার ব্যবস্থা নিজ খরচায়। খাওয়া নিজের। নিয়োগপত্র ও মাইনে দেবে আমাদের এজেন্সি (পড়ুন ঠিকাদারি সংস্থা)। এদের অনেক কটা মেস, অসুবিধা হবে না। আইডেনটিটি কার্ড থেকে সবকিছুতেই বহুজাতিকের লোগো। আপাতত বেতন হাজার দশেক। এর থেকে কাটা যাবে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ইএসআই-র জন্য দেয় টাকা। সকাল ৭টার মধ্যে গাড়ি নিয়ে আসবে। সন্ধ্যে ৭টায় আমরা সবাই এক সাথে কোম্পানির দেওয়া টিফিন খাই। তারপর যখন কাজ শেষ হবে গাড়ি পৌঁছে দেবে। ছুটির দিন কাজ করতে হয়। আমাদের গর্ব আমরা ১৫ই আগস্ট বা রবিবার বলে থেমে থাকি না। দেশের সর্ববৃহৎ স্টিল উৎপাদনের সরকারি সংস্থা তোমার কাজের জায়গা। আগামী দুই-তিন বছর নিজেকে তৈরি কর। যোগ্যতা প্রমাণ কর। আমরাই তোমায় সুযোগ করে দেব। তোমারও আলাদা এসি চেম্বারের হবে। বিএমডাব্লু চেপে কাজে আসবে। ক্লায়েন্ট আমাদের ধ্যানজ্ঞান। শুধু এই প্রোজেক্ট নিয়ে ভাব। সব দায়িত্ব তোমার।

ফোনে খবর এল বাড়িতে। আত্মীয়রা ছেলের বিখ্যাত বহুজাতিক সংস্থায় চাকুরি হওয়ায় নকুড়ের কড়াপাক সন্দেশ খাচ্ছে। বাবা আড়ালে ফোনে ছেলেকে জিগ্যেস করছেন যা পাচ্ছিস তাতে তোর চলবে তো? অসুস্থ হয়ে পড়িস না। মাছওয়ালার অনুযোগ, ছেলে এত বড় চাকুরি পেল এখনও কুচো মাছ কিনছেন! সমব্যথী পাওয়া গেল। আরেক বাবা বললেন, আপনার ছেলে কোর সাবজেক্টে ইঞ্জিনিয়ার কত বড় চাকুরি পেয়েছে। আমার ছেলেটি আইটি নিয়ে পাশ করল। সেক্টর ফাইভে অত বড় ঝাঁ চক্চকে অফিস নিয়োগপত্র দিল। পঞ্চাশ হাজার টাকা সিকিউরিটি জমা নিল। এখন শুনছি সংস্থাটি ভুয়ো। কেউ দায় নিচ্ছে না। খবরের কাগজে ছোট করে খবর করেছে— চোখে পড়েনি বোধহয়। আপনিতো জানেন দীর্ঘদিন কারখানা বন্ধ থাকায় বকেয়া কোন টাকাই পাইনি। মামলা চলছে। কবে কিছু পাব জানি না। ছেলে ও ছেলের মা কী রকম চুপচাপ হয়ে গেছে— ডাক্তার বলছেন ডিপ্রেশন। এডুকেশন লোনের টাকা কি ভাবে শোধ হবে জানি না। বোধহয় বসতবাড়িটাও থাকবে না।

দুর্গাপুর স্টেশনে ওভারব্রিজ দিয়ে ওপারে গিয়ে নামলে বাজার ও রিক্সা স্ট্যান্ড। চওড়া সোজা রাস্তা গিয়ে মিশেছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে। রাস্তার বাঁদিকে বহু ছোট ছোট কারখানা, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। ডানদিকে ফুড কর্পোরেশনের বিশাল গোডাউন। রুগ্ন বন্ধ সরকারি সার কারখানা আর সাগরডাঙা হাউসিং এস্টেট। ১৯৫২ সালে এখানে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। পুরনো রেলের প্লাটফর্ম এখনও আছে। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের থাকার জন্য সেই সময় তিনতলা দুই কামরার রান্নাঘর, খাওয়ার ছোট জায়গা ও বাথরুম সহ শয়ে শয়ে ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি হয়েছিল। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট তৈরি হবার সময় শ্রমিকদের থাকার জন্য এই ফ্ল্যাট প্রথমে নেওয়া হয়েছিল অধিবেশন হয়ে যাবার পরে। দুর্গাপুর স্টিলের নিজের টাউনশিপ তৈরি হবার পরে বিভিন্ন ছোট ছোট কারখানার শ্রমিকদের খুবই কম ভাড়ায় থাকার ব্যবস্থা হয়। এই সব ছোট

ছোট কারখানাগুলি বহু বছর বন্ধ। শ্রমিকদের কিছু টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনে নিতে বললে সেই সামান্য টাকা দেবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। এখনও তারা ভাড়ায় আছেন। কান পাতলে শোনা যায় এক সময় গমগম করা শ্রমিক মহল্লার নাম হয়েছে এমআইএস কলোনি। বন্ধ কলকারখানার শ্রমিকরা সামান্য যে টাকা পেয়েছিলেন তার সুদের টাকায় (এমআইএস) বেঁচে আছেন। একদা দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকরা এখন তাড়াতাড়ি পরপারে যাবার দিন গুনছেন। মাসের প্রথম দিকে যখন সুদের টাকা ওঠে তখন বহু পুরনো ঘোষবাজার জেগে ওঠে আর অন্য সময় টিমটিম করে বাতি জ্বলে। আগে দুর্গাপুরের পরিচিতি ছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন। বর্তমানে পরিচিত এড়ুকেশনাল হাব-এর জন্য। বন্ধ হয়েছে একের পর এক ছোটবড় সরকারি ও বেসরকারি কারখানা। জমিয়ে বসেছে একের পর এক বেসরকারি কলেজ, ইনস্টিটিউট।

ওষুধসহ মানুষের ব্যবহার করার কারখানায় উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য বড় বড় শহরে ছিল সেই সব সংস্থার অফিস ও গোডাউন। এখানে যারা কাজ করতেন তারা সবাই স্ব স্ব সংস্থার কর্মী ছিলেন। কারখানার কর্মী এবং এই সব শ্রমিক কর্মচারীর একই রকম চাকুরির শর্ত ছিল। মালিকের সাথে দরকষাকষি করার অধিকার ছিল, ইউনিয়নের সদস্য হবার সুবাদে। মালিক পক্ষ এখন প্রায় সব সংস্থায় অফিস ও গোডাউন তুলে দিয়েছে। কাজ করানো হচ্ছে তৃতীয় পক্ষ দিয়ে। সিএন্ডএফ— ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট। উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি অফিস ও গোডাউনের শ্রমিক কর্মচারীদের কোথাও ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট স্কিম (পড়ুন বাধ্যতামূলক)-এর মাধ্যমে অথবা ক্লোজার কমপেনসেশনের মাধ্যমে কিছু টাকা দিয়ে ছাঁটাই করে দিয়েছে। বেশির ভাগ জায়গায় এই অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবাদ হয়নি। গাছের পাতাও নড়েনি। বাধ্য হয়ে অনেকে কাজ খোয়ানোর আবেদনে আত্মসমর্পণ করে আত্মঘাতী হয়ে আত্মগ্লানি মুক্ত হয়েছেন। অনেকে আবার এই এজেন্টদের কাছে কাজ করছেন। একই ধরনের কাজ। আগে মর্যাদা ছিল, অধিকার ছিল, এখন সবটাই ছোট মালিকের খেয়ালখুশি। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম, সম্পূর্ণ অসংগঠিত, প্রায় ক্রীতদাস। উৎপাদিত সংস্থাগুলির লাভই লাভ। এজেন্টকে সমস্ত বিক্রির ১.৬ থেকে ১.৭ শতাংশ কমিশন দিয়ে সব দায় মুক্ত। বিক্রির টাকা আদায় এই এজেন্টরা করে। ডিস্ট্রিবিউটরদের সাথে চুক্তি থাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পেমেন্ট করার। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এই পেমেন্ট চেক্ বা ড্রাফট নিয়ে নেয়। দেরিতে পেমেন্ট হলে দায় সেই সংগ্রাহক ব্যঙ্কের। ব্যাঙ্ক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংস্থাকে পেমেন্ট করে। ব্যঙ্কের লাভ কিছু কমিশন, মালিকের বাড়ে আরও মুনাফা।

পরিষেবা ব্যবসায় এখন বাড়বাড়ন্ত। ব্যাঙ্কে চেক্ জমা দিয়ে হাতে টোকেন নিয়ে বসে থাকার কথা ভুলতে বসেছেন মানুষজন। এটিএম মেসিন সব মুশকিল আসানের ভূমিকায়। এই মেশিনে যারা টাকা ভরেন তারা কেউ ব্যাঙ্কের নিজের কর্মচারী নয়। দেশি-বিদেশি সব ব্যাঙ্ক এজেন্সির মাধ্যমে এই কাজ করায়। যারা এই কাজ করেন তাদের বলা হয় ক্যাশ অফিসার। ৩৬৫ দিন কাজ। দিনে রাতে যে কোন সময় নির্দেশমত টাকা ভরতে যেতে হয়। অতি স্বল্প বেতন। পিএফ কাটে কিন্তু জমা দেয় কিনা জানা কঠিন। ইএসআই-র টাকা কাটে। সুযোগ সুবিধা পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন আছে। দেশের আইনে এখনও আছে যে ৭জন হলেই ইউনিয়ন তৈরি করতে পারে। প্রায় ৫০০ ক্যাশ অফিসার ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টা করে। যে ক'জন উদ্যোগ নিয়েছিল তাদের রাজ্যের বাইরে বদলি করা হয়েছে। মাইনে বন্ধ। বদলির জায়গায় কাজ শুরু করলে মাইনে পাওয়া যেতে পারে। সবাই মিলে ধর্নায় বসেছিল অফিসের সামনে। আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। বিভিন্ন সহায়তায় জামিন হয়েছে। যদিও সংগঠিত হবার অধিকার ভারতের সংবিধান-স্বীকৃত মৌলিক অধিকার। ছাঁটাই-এর মধ্যে একটা নিষ্ঠুর বর্বরতার প্রকাশ হয়। অনেকের বিবেক দংশন হয়। তাই উচিত শিক্ষা দেবার জন্য মালিকদের অব্যর্থ অস্ত্র বাড়ি থেকে বহু দূরে বদলি। হয় আত্মসমর্পণ না হয় কাজ নিজের থেকে ছেড়ে দেওয়া।

দেশের শ্রম-আইন এখনও সেইভাবে পরিবর্তন হয়নি। তাই শ্রমিকদের সংঘ-শক্তি ভাঙার নিত্য নতুন কৌশল চলছে। শ্রমিকদের ইউনিয়নের বাইরে করে দিতে হবে। একই কাজ করানো হচ্ছে কিন্তু বলা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট স্টাফ। প্রথমে ভয়ভীতি দেখিয়ে না হলে কিছু বাড়তি টাকাপয়সার প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে যে এটি একটি পদোন্নতি এবং তিনি এটা আবেদন করেই নিয়েছেন। কোথাও আবার নিয়োগ করা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ক্যাডার হিসেবে। কাজ একই, ওয়ার্কমেনের মত। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। সদ্য চাকুরিপ্রাপ্ত মানসিক ভাবেও থাকছেন দলছুট।

দেশের আইনপ্রণেতারা মালিকপক্ষের জন্য আগেই সুবিধা করে রেখেছেন। শ্রমিকদের প্রাপ্য দেবার ক্ষেত্রে অনেক অন্তরায়। প্রভিডেন্ট ফান্ডের সীমা ৬৫০০ টাকা। তার বেশি মাইনে হয়ে গেলে বাড়তি মাইনের জন্য না দিলেও আইনত সিদ্ধ। ১৯৯৫ সালে বেসরকারি ক্ষেত্রে চালু হওয়া পেনশনের ক্ষেত্রেও একই ভাবে প্রযোজ্য। ন্যূনতম বেতন আজও প্রহসন। ২৭০০ কিলো-ক্যালোরির হিসাব বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানা হয় না। হলেও তার মধ্যে নানা কারচুপি ধরা পড়েছে। একই সরকার রাজ্য বা কেন্দ্র তার নিজের কর্মচারীর বেতন কমিশনের সময় গ্রুপ ডি-র কর্মীদের যে বেতন দিয়ে থাকেন হিসেবে দেখা গেছে ন্যূনতম বেতন বেসরকারি ক্ষেত্রে সম কাজের ক্ষেত্রে বহুগুণ কম। ভাতা ইত্যাদি অন্যান্য সুযোগ দূরঅস্ত। মজুরি নিয়ে আমাদের দেশে শুরু থেকেই অরাজক অবস্থা। পেমেন্ট অফ ওয়েজ অ্যাক্ট থাকলেও মালিক পক্ষ তার নানা ফাঁক দিয়ে শ্রমিকদের বঞ্চিত করে চলেছে। উদ্বৃত্ত মূল্য তথা মুনাফা বাড়ানোর জন্য

পুঁজিপতিদের পক্ষ মসৃণ ছিল এবং আছে। বিভিন্ন সময় মালিকপক্ষ যে মজুরি বৃদ্ধি করে তার বেশির ভাগই বিভিন্ন ভাতা বৃদ্ধি। মূল বেতন কমই থেকে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মহার্ঘ্যভাতা দেওয়া হয় না। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। ফলে ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে।

মজুরি বৈষম্য নিয়ে কোথাও সেভাবে আলোচনা হয় না। যে কোন একটি সংস্থায় বেতন পাওয়া সব থেকে উচ্চপদে থাকা শ্রমিক-কর্মচারীর সাথে নিম্নপদে থাকা শ্রমিক-কর্মচারীর মজুরি ইত্যাদির মধ্যে বিশাল ফারাক। ১৯৭৮ সালে কেন্দ্রে জনতা সরকার থাকার সময় বহু-বিতর্কিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস্ (কুখ্যাত আই-আর বিল) বিল আনার চেষ্টা করছিল। পরবর্তীতে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এই বিল ঠান্ডাঘরে পাঠায় এবং জনতা দলও এই বিলের ব্যাপারে উৎসাহ হারায়। সেই সময় কেন্দ্রের জনতা সরকার শ্রী ভূতলিঙ্গমকে (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সচিব) চেয়ারম্যান করে 'ওয়েজ এবং প্রাইস' এই বিষয়ে 'স্টাডি রিপোর্ট' করায়। ১৯৭৭ সালে আক্টোবর মাসে কাজ শুরু করে ১৯৭৮ মে-মাসে রিপোর্ট পেশ হয়। স্বাধীনতার পরে পেশ হওয়া সব থেকে বেশি বিতর্কিত ও সমালোচিত বিলগুলির মধ্যে এই বিলটি অন্যতম। এহেন বিলেরও অন্যতম সুপারিশ ছিল কোন সংস্থায় ন্যূনতম মজুরি-প্রাপ্ত শ্রমিকের থেকে ওই সংস্থায় সব থেকে বেশি মজুরি-প্রাপকের মধ্যে ফারাক ৪ থেকে ৫ গুণিতকের মধ্যে রাখার। বর্তমানে এই ফারাক যে কত শত গুণিতক তা হাতে গোনা সম্ভব নয়।

বেসরকারি বহু ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগ করলে নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না। আগে খাতায় দস্তখত করিয়ে মাইনে দেওয়া হত। এখন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা জমা করে দেওয়া হয়। প্রভিডেন্ট ফান্ড, বোনাস ইত্যাদি দেবার প্রশ্নই থাকে না। পাঁচ বছরের আগে ছাঁটাই করে দেওয়া হয় বা এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হয় যাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। যদি বা টিকে থাকে তাকে পাঁচ বছরের আগে বসিয়ে দিয়ে আবার নতুন করে শুরু করানো হয়। ফলে গ্রাচুইটি অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রাপ্য টাকার অধিকার থাকে না। লেবার কোর্ট বা ট্রাইবুনালে তিনি যে সেই সংস্থার শ্রমিক তা প্রমাণ করার কোন ডকুমেন্ট থাকে না।

বহু জায়গায় নিয়োগপত্রে অবসরের বয়স ৫০ বছর বা ৫৫ বছর করে রাখা আছে। এমন দেখা যাচ্ছে চুক্তিতে লেখা থাকছে অবসরের বয়স ৫৮, কিন্তু ২৫ বছর কাজ হয়ে গেলে আপনার যে বয়সই হোক অবসর নিতে হবে। হিসেবে দেখা যাচ্ছে ২২ বছর বয়সে কোন শ্রমিক কাজ শুরু করলে ৪৭ বছর বয়সে বিদায় করে দেবে। আইডি অ্যাক্টে লিখিত আছে অবসরের বয়সসীমা নিয়োগপত্রে কিছু উল্লেখ না থাকলে ৫৮ বছর। আর নিয়োগপত্র যে হেতু শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র, সেই নিয়োগপত্রে অবসরের বিষয়ে যা উল্লেখ আছে তাই মান্যতা পাবে। শ্রমিক বঞ্চিত শুধু কর্মরত অবস্থায় নয়, ভবিষ্যতও অন্ধকার। যত কম বয়সে অবসর করাবে মালিকের তত লাভ। কম দিতে হবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য, গ্রাচুইটির জন্য। শ্রমিক আরও হারাবেন। ৫৮ বছর না হলে বর্তমান পেনশন স্কিমের টাকা আনুপাতিক হারে কাটা যাবে। ভারতবর্ষে মানুষের গড় আয়ু আগের তুলনায় বেড়েছে আর অবসরের বয়স বেসরকারি ক্ষেত্রে কমানো হচ্ছে। আসলে জীবন-যৌবন নিংড়ে নিয়ে ছিবড়ে করে ফেলে দাও— কোনও দায় নেই। প্রতিনিয়ত 'কার পকেটের টাকা কার পকেটে যাচ্ছে'— তার ভাবনা কোথায়?

ভারতে শ্রমিকদের বিষয়ে ঠিক করার জন্য আছে ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্স। কেন্দ্রীয় শ্রম দফতর এটি পরিচালনা করে। অতীতে এর গুরুত্ব এত বেশি ছিল যে একে বলা হত 'লেবার পার্লামেন্ট'। বহু গুরুত্বপূর্ণ নীতি এখানে গৃহীত হয় সরকার, শ্রমিকপক্ষ ও মালিকপক্ষের সহমতে। বর্তমানে এটি একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান। মালিকপক্ষ বা বিভিন্ন কর্পোরেট মালিকরা এর তোয়াক্কা করে না। সামান্য মান্যতা দেয় না আইএলও কনভেনশনে গৃহীত আন্তর্জাতিক সুপারিশগুলির।

'উদ্বৃত্ত মূল্য' আরও বেশি করে তৈরি করার জন্য স্পেশাল ইকনমিক জোন (*সেজ*) হয়েছিল। বহু আলোচিত বিষয়। বর্তমানে অসংগঠিত এবং সংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীরাও একই অবস্থার মধ্যে। শ্রমিকদের জন্য সারা দেশটাই স্পেশাল ইকনমিক জোন।

ভারত সরকার ১৫ই অক্টোবর ১৯৯৯ প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী রবীন্দ্র ভার্মাকে চেয়ারম্যান করে দ্বিতীয় জাতীয় শ্রম কমিশন গঠন করে। সেপ্টেম্বর ২০০২ শ্রম কমিশন লিখিত রিপোর্ট পেশ করেছিল। গঠনপর্বেই বহু বিরোধ ও আপত্তি ছিল। প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতার জন্য এই রিপোর্টের সুপারিশ থমকে গেলেও পরোক্ষভাবে কার্যকর হচ্ছে। শ্রমিক হারাচ্ছেন অধিকার, পাচ্ছেন বিভিন্ন অনুদান প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি। এই প্রকল্পগুলির দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে এনজিও সংস্থাগুলিকে। ট্রেড-ইউনিয়ন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্রাত্য।

২০১১ সালে ২রা সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশান বেঞ্চ রায় দিয়েছে একটি বহু আলোচিত মামলায় "মালিক পক্ষ শ্রমিকরা কনট্রাকটারের কাজ করছেন বলে তাদের মাইনে ও ভাতা ইত্যাদি নিয়ে এইভাবে শোষণ করতে পারবেন না। দেশের সর্বোচ্চ আদালত মালিকপক্ষের এই জাতীয় অনুশীলন অনুমোদন করতে পারে না। ভুবনায়ন ও উদ্ধারিকরণের নামে, অগ্রগতির নামে, মানবিকতা ধ্বংসকারী শ্রমিক শোষণ আর করা যাবে না।"

আগের তুলনায় এখন শ্রমিক-এর ওপর আক্রমণ আরও লাগামছাড়া। বিষয়টা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক। দায় শুধু শ্রমিকের নয়, সবার। বিশ্বায়ন শ্রমিকদের আরও শৃঙ্খলিত করেছে। শ্রমিকদের এই শৃঙ্খল ছাড়া আর হারাবার কিছু নেই।

বিশ্বায়নের দুই দশক

বিশ্বায়ন ও শ্রমিকের অধিকার

নব দত্ত

যেমনটা আমরা দেখছি

মানবাধিকার সংগঠন পিইউডিআর এবং আরও দুটি সংস্থা, 'কমনকজ' ও নির্মান মজদুর পঞ্চায়েত সংঘম যৌথভাবে দিল্লী হাইকোর্ট একটি জনস্বার্থ মামলা করে। মামলায় বলা হয় যে কমনওয়েলথ গেমসে কর্মরত শ্রমিকদের আইনসম্মত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে যা কিনা অপরাধ বলে গণ্য হয়। মুখ্য নিয়োগকর্তা দিল্লি ডেভলপমেন্ট অথরিটি, কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তর ইত্যাদি সরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, যেহেতু তাদের মনোনীত ঠিকাদার সংস্থা এইসব কর্মীদের আইনসম্মত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, তাই সেই দায় তাঁদের নিতে হবে। অভিযোগগুলি কী ছিল? ন্যূনতম মজুরি না দেওয়া, ওভার টাইম ও সাপ্তাহিক ছুটি না দেওয়া, মজুরি অনিয়মিত দেওয়া, পরিচিতপত্র ও বেতনস্লিপ না দেওয়া, শ্রমিক কল্যাণ পর্যদে এই শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত না করা, আইনসম্মতভাবে মাস্টাররোল এবং অন্যান্য রেকর্ড না রাখা। পাশাপাশি ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, যা বিনামূল্যে শ্রমিকদের দেওয়ার কথা ছিল, তা না দেওয়া, অভিবাসী শ্রমিকদের আসা-যাওয়ার খরচ না দেওয়া, নারী শ্রমিকদের পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় কম বেতন দেওয়া, সুস্থভাবে বসবাস করার মত যথোপযুক্ত ঘর না থাকা। এই ক্ষেত্রে নির্মাণ শ্রমিকদের আইন, ন্যূনতম মজুরি আইন, আন্তঃরাজ্য অভিবাসী শ্রমিক আইন, ঠিকা শ্রমিক আইন, সমকাজে সম মজুরি আইন স্পষ্টভাবে ভঙ্গ করা হয়েছে।

জানুয়ারি, ২০১০ এই মামলাটি নথিভুক্ত হয়। তারপর একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিও গঠিত হয়। কমিটি সরজমিনে অনুসন্ধান করে। অবশেষে কমিটি রিপোর্ট জমা দিয়ে জানিয়ে দেয় যে অভিযোগ 'যথেষ্টই সঠিক'। কমিটি চারদফা সুপারিশ করে এবং শ্রম আইন ভঙ্গ করার জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হয়। হাইকোর্ট ৭ই এপ্রিল মুখ্য নিয়োগকর্তাকে নির্দেশ দিল কমিটির সুপারিশ মতো এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সব ধরনের শ্রম আইন এখানে রক্ষিত হয়।

তারপরেও পিইউডিআর এর অভিযোগ, বঞ্চনার ছবিটা প্রায় একই রকম রয়েছে। অভিযোগটির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এই যে শ্রমিকদের আইনসম্মত প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো তাতে আর্থিক দিক দিয়ে শ্রমিকের কত ক্ষতি হলো এবং মালিকের বা নিয়োগ কর্তার কত বাড়তি অর্থ লাভ হলো— রিপোর্টে এবিষয়ে বিশদভাবে তথ্য দেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে মোট পরিমাণটি এখানে উল্লেখ করছি। শ্রমিককে শ্রম আইন মোতাবেক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিয়োগকর্তা বা মালিকের বাড়তি লাভের পরিমাণ হলো মাসে ৩০কোটি টাকা বা বছরে ৩৬০ কোটি টাকা। এখানে মোট শ্রমিক প্রায় ৪০ হাজার ধরে নিয়ে হিসাবটা করা হয়েছে।

২২ মে, ২০১১ ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (ইউপিএ-দুই) এর চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী তাঁর সরকারের দুবছরের 'রিপোর্ট কার্ড' প্রকাশ করতে গিয়ে দাবি করলেন, তাঁর সরকার জনগণের একাধিক অধিকার আইনের মাধ্যমে সুনিশ্চিত করেছেন। অনেক আইন সংযোজন হয়েছে এটা ঠিক। কিন্তু অধিকাংশ আইনের অস্তিত্ব কাগুজে বা কোন কোনও ক্ষেত্রে সারা দেশে যৎসামান্য কার্যকর হয়েছে। তালিকায় লক্ষণীয় যে প্রায় ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ে গেছে অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা আইন ২০০৮। অথচ ভারতে অসংগঠিত শ্রমিকদের সবার জন্য এই সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি স্বীকৃতি পেয়েছে। আসলে ২০০৮ আইনটি শুরুতেই ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হয়, কারণ আইনটি, কথা ছিল, সব ধরণের অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য হবে। কিন্তু পরে দেখা গেল এই আইনকে কার্যকর করা হবে শুধুমাত্র বিপিএল-ভুক্ত শ্রমিকদের জন্য; ফলে প্রায় ৮০ শতাংশ শ্রমিক এই আইনের আওতার বাইরে চলে গেল। কোথাও কোন রকম 'সামাজিক সুরক্ষা তহবিল' বানাবার ব্যবস্থা রাখা হল না।

রিপোর্ট কার্ডের ওই তালিকায় অসংখ্য স্কিম বা প্রকল্পের কথা বলা আছে যা প্রায় সবই সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত :

১) ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওল্ড এজ পেনসন স্কিম
২) ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিম।
৩) জননী সুরক্ষা যোজনা
৪) হ্যান্ডলুম উইভারস কমপ্রেহেনসিভ ওয়েলফেয়ার স্কিম
৫) হ্যান্ডিক্রাফ্‌ট আর্টিজান কমপ্রেহেনসিভ ওয়েলফেয়ার স্কিম
৬) পেনশন টু মাস্টার ক্রাফ্‌ট পার্সনস
৭) ন্যাশনাল স্কিম ফর ওয়েলফেয়ার অফ ফিশারম্যান অ্যান্ড ট্রেনিং অ্যান্ড এক্সটেনশন
৮) জনশ্রী বিমা যোজনা।
৯) আম আদমি বীমা যোজনা
১০) রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা।

এসব দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি— অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য তাঁরা বিরাট সাফল্যের কাজ করেছেন। 'অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা আইন' তাঁরা শিকেয় তুলে রাখলেন, কিন্তু সামাজিক সুরক্ষা বাবদ ২০১০-১১-তে যে হাজার কোটি টাকার কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ রাখার মৌখিক

ঘোষণাটুকু হয়েছিল তাও ২০১১-১২ বাজেটে অদ্ভুতভাবে মুছে গেল। এবার বোঝা যাচ্ছে ইউপিএ-দুই-এর রিপোর্ট কার্ড থেকে কেন অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা আইনের অস্তিত্বটি হারিয়ে গেল।

শ্রমিক ও আইন

সরকার প্রচুর আইন করেছেন শ্রমিকের স্বার্থে। সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায় শ্রমিককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বেশ কিছু কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু হয়েছে। লক্ষণীয় হল, এটা একটা নতুন ধারা। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রমশই শ্রমিকের যে ন্যায্য আইনি অধিকার, আইনি সুরক্ষা ছিল সেগুলোকে রাষ্ট্র সংকুচিত করে ফেলতে চাইছে। অধিকারগুলো পেছনে ঠেলে দিয়ে সামনে এনে ফেলেছে প্রকল্প প্রজেক্ট, স্কিম ইত্যাদি। এর মাধ্যমে দাতা গ্রহীতার অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস চলছে।

আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় ভাবে শ্রম এবং কর্মসংস্থান সংক্রান্ত আইনগুলি হলো তার সক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ—

১) শ্রমিকদের কল্যাণ সম্পর্কিত আইন হলো ৯টি
২) শিল্প সম্পর্কিত আইন হলো ৩টি
৩) বেতন ও মজুরি সম্পর্কিত আইন হলো ৪টি
৪) কাজের সময়, কাজের পরিবেশ, কর্মসংস্থান পরিষেবা সম্পর্কিত আইন হলো ১৬টি
৫) অনগ্রসর শ্রেণীর শ্রমজীবীদের জন্য শ্রম আইন হলো ৩টি
৬) সামাজিক সুরক্ষা মূলক আইন ৩টি
৭) কর্মসংস্থান ও ট্রেনিং সংক্রান্ত আইন ২টি
৮) অমান্য আইন ১০টি

মোট ৫২টি কেন্দ্রীয় স্তরে শ্রমিক/কর্মচারীর জন্য আইন বা অধিকার দেওয়া আছে। এর পরে রয়েছে রাজ্যে রাজ্যে তাদের নিজস্ব আইন।

অধিকারের বদলে স্কিম

গত দু'দশক ধরে সরকারগুলির তরফে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শ্রমজীবীদের অধিকার সম্পর্কিত আইনগুলির বিলুপ্তি ঘটিয়ে বা অকার্যকর বা নিষ্ক্রিয় করে রেখে 'ত্রাণ' জনিত স্কিম দেওয়ার প্রবণতা এবং এটা শ্রমিক আন্দোলনের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। একদিকে যেমন শিল্পের স্থায়িত্বের দায়, উন্নয়নের দায় তাঁদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং শ্রমিকের ক্রমশ আরও আরও আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। শ্রমিকের কাজের অধিকার, ন্যায্য মজুরির অধিকার, সামাজিক সুরক্ষা, চিকিৎসা, অবসরকালীন সুবিধা, বাসস্থানের অধিকারগুলি অনিশ্চিত করে, শিকেয় তুলে দিয়ে সরকারি স্কিম চলে আসছে, ব্যক্তি মালিকের ন্যূনতম মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা না দেওয়া জন্য ছাড় দিয়ে বঞ্চিত শ্রমিককে 'ত্রাণ' স্কিম দেওয়ার মাধ্যমে পুঁজিকে তার মুনাফার গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে।

'উদারগণতন্ত্রের' মুখোসের আড়াল নিয়ে শ্রমিকের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে স্কিমের আমদানি হলো, শ্রমিক সংগঠন কি তবে পিছু হাঁটল? বেজায় খুশি অবশ্য আরেক দল— প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেতে উন্মুখ এনজিওরা যারা ট্রেড ইউনিয়নের সমপরিমাণ গুরুত্ব পেয়ে এইসব 'স্কিম' নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের উদ্যোগী হয়ে উঠেছে।

সামাজিক সুরক্ষার নামে হরেকরকমের বিভ্রান্তি, এলেমেলো কিছু প্রকল্প যা অনেক ক্ষেত্রেই ঘোষণার পরে অস্তিত্বহীন। সরকারের মুখ্য দায় হলো শ্রমিকের জীবিকার নিরাপত্তা, অর্থাৎ ছাঁটাই, শিল্প বিরোধ, শ্রমিকের কম মজুরি পাওয়া, আট ঘন্টার বেশি কাজ করানো, চুক্তি শ্রম, ঠিকাশ্রম ইত্যাদি প্রতিরোধ করা। শোষণ, নির্যাতন, বঞ্চনার ছবিটা পাল্টাল না, বরং বলা ভালো, আরও বেশি বেশি করে তীব্র হয়েছে। বিশ্বায়ন-পরবর্তী অর্থব্যবস্থায় সামগ্রিকভাবে শ্রমসংক্রান্ত বিষয়ে যে দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষনীয়ভাবে সামনে এসেছে তা হলো শ্রমিকের মজুরি ও যাবতীয় সুবিধার ক্ষেত্রে মালিকের দায় (Employers' liability) একদিকে কমানো হচ্ছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা (State liability) বাড়ানো হচ্ছে। অর্জিত অধিকারগুলো থেকে বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরকারি নিষ্ক্রিয়তা প্রকট হয়ে উঠেছে।

শ্রমিকদের জন্য সরকারি কল্যাণকর কর্মসূচির আড়ালে রয়েছে পুঁজিকে শ্রমের বাজারে যথেষ্ট শোষণ করার অধিকার দেওয়া, তাই আইনভঙ্গ করলে যে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা, তাকে দুর্বল করা হয়েছে। কেন আমাদের এমন ধারণা হচ্ছে তার স্বপক্ষে একটি সমীক্ষার ফলাফল এখানে উল্লেখ করব। ২০০০ সালে দেশের ১৭টি রাজ্যে ন্যূনতম মজুরির কতটা শ্রমিকরা পান তা নিয়ে একটি সমীক্ষা হয়। দেখা যায়, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ এইসব রাজ্যগুলিতে সরকার নির্ধারিত মজুরির ৭০ শতাংশ শ্রমিকরা পায়। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকরা শহরে ৩০.৪ শতাংশ ও গ্রামে ৩০.১ শতাংশ মজুরি পায়। গুজরাটে গ্রামে ৮৩ শতাংশ ও শহরে ৫৪.৪ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে গ্রামে ৮৯ শতাংশ ও শহরে ৬৭ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে গ্রামে ৭৮ শতাংশ ও শহরে ৪০ শতাংশ, পাঞ্জাবে গ্রামে ১৬.৯ শতাংশ ও শহরে ১৯.৯ শতাংশ, ওড়িশায় গ্রামে ৯০ শতাংশ ও শহরে ৭৬ শতাংশ মজুরি শ্রমিকরা পায়। মজুরের সঙ্গে পুঁজির যে সম্পর্ক তার প্রধান একটা জায়গা হলো শ্রমের বেচাকেনার মধ্য দিয়ে শ্রমিকের জীবন ধারনের জন্য মজুরিবাবদ কিছু অর্থ তাকে পুঁজি প্রদান করে। পুঁজি এই চাহিদা পূরণ করার জন্য কিছু শর্ত দেয়। সে শর্ত অবশ্যই অসম। শ্রমিকের কাছ থেকে পুঁজি বাড়তি কাজ দাবি করে। কিন্তু এই বাড়তি কাজের বিনিময়ে শ্রমিক বাড়তি পাওনা দাবি করতে পারবে না। যতটা পরিমাণ কাজ সে করবে সেই পরিমাণ মজুরি যেন সে দাবি না করে। শুনতে হয় এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কী আছে— এমনকী আমরা যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আছি সেখানে রাষ্ট্রের তরফ থেকে দোষারোপটা চলে আসে শ্রমিকদের ওপর। শ্রমিকের স্বাভাবিক দাবি— অধিকারকে তখন 'অন্যায়' দাবি, না মানার জন্য সব

ধরনের প্রক্রিয়া কৌশল গ্রহণ করা হয়। বলা হয় শিল্পপতি, শিল্প বা পুঁজির চাহিদা শ্রমিককেই পূরণ করতে হবে। এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি, হচ্ছেও না। লক্ষ্য করার বিষয় শ্রম সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে সব সময় বলার চেষ্টা হয় একটা সংকটের কথা, এবং এই সংকটের কথা বলেই শ্রমিককে স্বল্প মজুরিতে মানিয়ে নেওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়। এটাকে এভাবেই সামাজিক মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা চলে। যখনই কাজের কথা আসে তখন শুরুতেই বলা হয় উৎপাদনের কথা। শ্রমিক কতটা উৎপাদন করবে সেই কথা। অথচ বাড়তি মজুরির কথা বলা চলবে না।

শ্রমের বাজার ও শ্রমনীতি

দেশে প্রথম শ্রম কমিশন হয় ১৯৬৯ সালে। তার ত্রিশ বছর বাদে দ্বিতীয় শ্রম কমিশন হয় ১৯৯৯। প্রথম শ্রম কমিশন অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য আইন রচনার কথা বললেও কিছুই হয়নি, দ্বিতীয় শ্রম কমিশনের সুপারিশ খুবই বিশদভাবে অসংগঠিত শ্রমিকদের অবস্থা ও অধিকারের কথা তুলে ধরে। যাবতীয় শ্রম আইনের যে অধিকার ও সুবিধা তার কত শতাংশ শ্রমিক পেয়ে থাকে সেটা একটা প্রশ্ন। ১৯৯৯-২০০০ এনএসএস সংগঠনের সমীক্ষায় জানা যায় যে দেশে সংগঠিত ২ কোটি ৮০ লাখ এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবী ৩৬.৯ কোটি - দুটো মিলিয়ে ৩৯.৭ কোটি। ২০০৪-০৫ 'ন্যাশনাল কমিশন অন এন্টারপ্রাইসের ইন দি আনঅর্গানাইসড সেক্টর' রিপোর্টে জানা যায়, দেশে মোট শ্রমজীবী ৪৫ কোটি ৮০ লক্ষ, এর মধ্যে ৯২ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রের। এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের ২৫ কোটি ৬০ লক্ষ, অর্থাৎ ৬১ শতাংশ শ্রমজীবী যুক্ত কৃষি ক্ষেত্রে আর বাকি ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ অকৃষিক্ষেত্রে যুক্ত। অসংগঠিত শ্রমিক বা অসুরক্ষিত শ্রমিক তাঁরাই অর্থাৎ কিনা যাঁদের সামাজিক সুরক্ষা নেই, থাকলেও তা রয়েছে ছিঁটেফোঁটা ত্রাণের মোড়কে। এরা অতি দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছেন, অর্জুন সেনগুপ্ত-র নেতৃত্বে ঐ কমিটি রিপোর্টে জানালেন, দেশের ৭৭ শতাংশ, অর্থাৎ ৮৩ কোটি ৬০ লাখ মানুষ দৈনিক ৬ টাকা থেকে ২০ টাকার মধ্যে আয় করেন। এদের সামাজিক নিরাপত্তা বলে কিছুই নেই।

বিশ্বের বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশেই শ্রমজীবী মানুষের বৃহদাংশই শ্রম আইনের নিয়মে সুরক্ষিত নয়। বিশ্বজুড়েই বেকারত্ব বাড়ছে। নিয়মিত বা সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মসংস্থান মোট শ্রমজীবির তুলনায় কমছে। এই যে ফর্মাল সেকটারে কর্মসংস্থান কমছে তার ফলে ক্রমশ ভিড় বাড়ছে অসংগঠিত বা ইনফর্মাল সেকটারে। বাড়ছে স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থান, দেশে নারী শ্রমজীবির মোট সংখ্যা কমবেশি ১৫ কোটি। এর মধ্যে ১৫ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত। অসংগঠিত অকৃষি ক্ষেত্রে নারীদের ৫০ শতাংশ স্বনিযুক্ত। বাকি নারী শ্রমিকরা মজুরি শ্রমিক (২৯ শতাংশ) আর গৃহ শ্রমিক (২১ শতাংশ)।

আসলে এশিয়ার দেশগুলিতে এই ধারাতেই 'কাজের নারীকরণ' হচ্ছে। সস্তায় শ্রম পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে ক্যাজুয়াল শ্রমিক নিয়োগ, অস্থায়ী কাজ যখন খুশি ছাঁটাই-এর স্বাধীনতা— মালিকরা এটাই চেয়েছে। এই সমস্তটাকেই বলা হচ্ছে শ্রমের বাজারে ওঠানামা। বর্তমান সময়ে এশিয়ার একাধিক দেশে লক্ষনীয় ভাবে দেখা যাচ্ছে যে, নারী শ্রমিকদের অনেকেই রপ্তানি-নির্ভর কাজকর্মে অনেক বেশি মাত্রায় যুক্ত হচ্ছেন, একাধিক দেশে তো রপ্তানি-নির্ভর কাজে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একশ শতাংশ নারীশ্রমিক কাজ করছেন, এদের কাজে নিয়োগ করতে পেরে মালিকরা সন্তুষ্ট, কারণ কম মজুরিতে, যে কোন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এঁরা কাজ করছেন, অবস্থার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে ইউনিয়ন নেই, নেই কাজের পরিবেশ নিয়ে কোনো দরকষাকষির ঝাঁমেলা। মালিকরা এদের যখন খুশি কাজ থেকে সরিয়ে দিতে পারছেন। এদের কাজের সময়কাল হলো বিয়ে বা শিশু জন্মানো পর্যন্ত। তারপর নতুন মেয়েরা এদের জায়গায় আবার নিয়োগ হবে। এই বিষয়ে খুব ভাল আলোচনা করেছেন জয়তী ঘোষ, *মান্থলি রিভিউ* পত্রিকায় জানুয়ারি ২০১২ সংখ্যায়।

বিশ্বায়নের নীতির ফলেই সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষদের কর্মসংকোচন ঘটছে, সভ্য সমাজের সাধারণ নিয়ম মেনে যে বিভিন্ন ধরনের আইন, সুরক্ষা তৈরি হয়েছে তার থেকে এঁদের বঞ্চিত করা হয়েছে। নিজেদের দেশের সরকারের অমানবিক নীতির ফলে একটা দুঃসহ ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিকরা বাঁচতে বাধ্য হচ্ছে; তারা আসলে একটা কাঠামোগত হিংসার (স্ট্রাকচারাল ভায়লেন্স) শিকার। এটা রাষ্ট্রীয় হিংসা। পুলিশ গুলি চালালে বা লাঠির বাড়ি মারলে সেই হিংসাটা আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এই যে মানুষগুলোকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এটা বড়ো কম অপরাধ নয়। মজুর তার মজুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেনা, দর-কষাকষি করতে পারবে না, ফুটপাতের ধারে থাকবে, রেললাইনের ধারে থাকবে। কুড়ানি বাজারে বাজার করবে। পুরোনো বাজার থেকে জামাকাপড় কিনবে। চাহিদা প্রয়োজনকে কমাতে কমাতে শুধুই ন্যূনতম পুষ্টি নিয়ে বেঁচে-বর্তে থাকা— এটাই জীবনযাপন? হ্যাঁ, পুঁজির হাতের পুতুল করে শ্রমের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এই শ্রমজীবী মানুষদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে।

সামাজিক সুরক্ষার পরিণতি

সামাজিক সুরক্ষার সবচেয়ে পুরোনো এবং বহুল প্রচারিত প্রকল্প প্রভিডেন্ট ফান্ড সংগঠনটির সাথে যুক্ত আছেন প্রায় ৪ কোটি ৭ লাখ শ্রমিক এবং কর্মচারী। বছরে সদস্য চাঁদা বাবদ আদায় হয় ৩৯,৫১৫.৫৩ কোটি টাকা। মোট গচ্ছিত টাকার পরিমাণ ৩১,৭৩৭৭.১১ কোটি টাকা। ভাবতে পারেন, সারা দেশে প্রায়

১৫ হাজার কোটি টাকা দাবিদারহীন অবস্থায় পড়ে আছে। এখানে এমন অনেক অ্যাকাউন্ট আছে যাতে হাজার টাকার কম রয়েছে। এসব তথ্য জানার পরেও পিএফ পেনশন অ্যাকাউন্টে সুদের হার কমিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার দেন এবং দেশের বহু শিক্ষিত মানুষকে বলতে শোনা যায়— সরকার সুদের হার না কমিয়ে করবেটা কী? কারণ সরকার আর্থিক সংকটে (!)

শ্রমিকদের জন্য আরও একটি সরকারি সামাজিক সুরক্ষা স্কিম ইএসআই (কর্মচারী রাজ্য বীমা)। চিকিৎসা, অসুস্থতাজনিত ও দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য এই বীমা ১৯৫৫ থেকে দেশে চালু। বর্তমানে প্রায় ২কোটি শ্রমিক ও তার পরিবার এর আওতায় সুবিধা পেয়ে থাকেন। ইএসআই-এর রিজার্ভ ফান্ড প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যেও সেখানে ১০ লাখের মত শ্রমিক ও তাদের পরিবার এই বীমা প্রকল্পের আওতায়, সেখানে বিগত বছরে যাবতীয় খরচ বাদ দিয়েও ১০০ কোটি টাকার ওপর উদ্বৃত্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে বোধহয় বলাই যায়, সামাজিক সুরক্ষার নামে এ একধরণের লাভজনক ব্যবসা চলছে। শুধু তাই নয় এক ঢিলে অনেক পাখি মারা হচ্ছে। 'টাই-আপের' নামে বে-সরকারি চিকিৎসাকে 'সাহায্য' করা গেল। এছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনায় তো গোটাটাই প্রাইভেটে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কোথাও কোথাও নেওয়া হচ্ছে। বীমা ক্ষেত্রে বিদেশি কোম্পানির আগমনের ছাড়পত্রের পেছনে এটা একটা উদ্দেশ্য।

সরকারি সংস্থার পরিণতি

বিএসএনএল কাজ করেন প্রায় তিন লাখ কর্মচারী, স্যাম পিত্রোদা কমিটি ২০১০ জুলাই মাসে রিপোর্ট জমা দিলেন। পিত্রোদা কমিটির প্রস্তাব ৩০ শতাংশ অর্থাৎ ১ লাখ শ্রমিককে ভিআরএস দিতে হবে। বিলগ্নিকরণ করতে হবে। বিএসএনএল দেশের তৃতীয় বৃহত্তম নিয়োগ কর্তৃপক্ষ বলা হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং রেলের পরই। বিএসএনএলের ৮১ শতাংশ নেট প্রফিট কমছে। ২০০৭-০৮ সালে ৩০০৯ কোটি টাকার জায়গায় ২০০৮-০৯ ৫৭৫ কোটি টাকা হয়। এর একটা কারণ হচ্ছে ল্যান্ডলাইন কমে যাওয়া এবং ৪৫ শতাংশের বেশি ব্যবসা চলে গেছে বে-সরকারি সংস্থাগুলির কাছে। ইউনিয়নের পরামর্শ সরকার অন্তত ৩০ শতাংশ শেয়ার বিলগ্নিকরণ করুক। ইউনিয়ন আরও বলছে ৩৫ হাজার কোটি টাকার ক্যাশ রিজার্ভ রয়েছে। তাঁরা আরও বললেন চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ৬০ হাজার কর্মচারী অবসর নেবেন এবং বাকি ৪০ শতাংশ অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা হোক। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। একদিকে সরকারি সংস্থার তুলে দেওয়ার কৌশল, অন্য দিকে বে-সরকারি কোম্পানির হাতে গোটাটা তুলে দেওয়া। দেশে ২০০৩-এ প্রায় ৫.৫ কোটি মানুষ টেলিফোনের গ্রাহক ছিলেন ২০০৯-এ যা হয়েছে ৫৬ কোটি। ১৯৯৯ সাল যেখানে মোট টেলিফোন সংযোগের মাত্র ৫ শতাংশ বে-সরকারি কোম্পানিগুলির হাতে ছিল, সেখানে ২০০৯ সালে ৮২.৩ শতাংশ বেসরকারি কোম্পনিগুলির কব্জায়।

শ্রমিকদের পরিণতি

নতুন আর্থিক ব্যবস্থায় বিশ্বায়ন-পরবর্তী অবস্থায় ১৯৯০ সালের পরে থেকেই স্থায়ী শ্রমিকের জায়গা নিচ্ছে ঠিকা শ্রমিক। কন্টাক্ট লেবার (রেগুলেশন অ্যান্ড অ্যাবলিশন) অ্যাক্ট ১৯৭০, যা আমাদের দেশে সংসদে সমর্থন নিয়ে আইনে রূপান্তরিত হয়, তাতে বলা আছে, সরাসরি উৎপাদনে ঠিকা শ্রমিককে কাজে লাগানো যাবে না। প্রয়োজনে মরশুমি এবং 'নন-কোর' কাজকর্মে নিয়ন্ত্রিতভাবে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করা যেতে পারে। ১৯৯৭ সালে কোর্ট ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিয়োগের অধিকার রয়েছে বলে নির্দেশ দিলেন, ২০০১ স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম ন্যাশনাল ইউনিয়ন ওয়াটারফ্রন্ট ওয়ার্কাস মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ঠিকাশ্রমিককে স্থায়ী নিযুক্তির বিরুদ্ধে রায় দিলেন, এরপর ২০০৬, ৯ই এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট রায় দিলেন দৈনিক মজুরি পান যে ঠিকা-শ্রমিক, তিনি একনাগাড়ে দশবছর কাজ করলেও নিয়মিত শ্রমিক তাঁর হিসাবে দাবি করার অধিকার নেই। আদালতের আদেশ এক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ/সম্প্রসারণের বদলে সংকুচিত করল।

জাতীয় কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প

ইউপিএ-দুই-এর রিপোর্ট কার্ড-এ খুব বড় মুখ করে সাফল্যের যে খতিয়ান দেওয়া হয়েছে তাতে যে আইনের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো মহাত্মাগান্ধী জাতীয় কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প (এমজি.এন.আর.ই.জি.এ)। এই আইন যখন হয় তখন থেকেই, কর্পোরেট সেক্টরের আপত্তি ছিল। তবু এই প্রকল্প এবং আইন তৈরি হলো। এটা ঠিক যে এর সম্ভাবনা ছিল বিশাল। যেমন—

১) পরিবারগুলিকে দরিদ্র্য ও ক্ষুধা থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে। হয়তো ন্যূনতম মজুরিতে একশো দিনের রোজগার বিরাট কিছু একটা নয়, কিন্তু যাঁরা প্রান্তিক মানুষ, তাঁদের পক্ষে এটি সহায়ক ভূমিকা নেবে।

২) এই প্রকল্প অনেকাংশে শ্রমিকদের গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার প্রবণতা আটকাবে। যদি গ্রামেই কাজ পাওয়া যায় তাহলে অনেক পরিবার গ্রামেই থেকে যাবে।

৩) কর্মনিশ্চয়তা আইনে মহিলাদের কর্মসংস্থান আরও বাড়বে।

৪) একজন ব্যক্তির রোজগার বাড়ার বিষয় শুধু জড়িয়ে নেই, এর সঙ্গে আছে সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি। অর্থাৎ, যে কাজগুলি এই শ্রমের মাধ্যমে গড়ে উঠবে তা হলো, জল সংরক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষুদ্র সেচ, ভূমি সংরক্ষণ, রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা ইত্যাদি। 'ফিকি' সম্প্রতি জানিয়েছে, একশো দিনের কাজের ফলে ভালো দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের এই সমীক্ষার ফলাফল এবং তার সুপারিশ নিয়ে দেশে

খুব হৈচৈ হচ্ছে। 'ফিকি' ২০১১ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর জুড়ে তাদের সংগঠনভুক্ত ১০টি অ্যাসোশিয়েশন সদস্য ১০০টি কম্পানির কাছে একটি প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে উত্তর চায়। প্রশ্ন হলো ফিকির এই সমীক্ষার প্রয়োজন পড়ল কেন? 'ফিকি' জানাচ্ছে, ভারতীয় শিল্পে অনেকদিন ধরেই দক্ষ শ্রমিকের একটা সঙ্কট দেখা দিয়েছে। তাদের মতে, এর জন্য দায়ী হলো 'একশ দিনের কাজ' প্রকল্পটি। এই কর্মসংস্থান প্রকল্পের ফলেই আধা-শহরে বা গ্রামে শ্রমিক তাঁর 'পছন্দের কাজ' বেচে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন, এমত পরিস্থিতিতে 'ফিকি' তাদের ধারণার সত্যতা খুঁজতেই বলা যায় এই সমীক্ষা। 'ফিকি'র পাঠানো প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণকারী কোম্পানির বার্ষিক লেনদেন পরিমান ২৭০০ কোটি টাকা এবং এর অর্ধেক কোম্পানি হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প।

সমীক্ষার ফলাফল

ভারতীয় শিল্প এখন গভীরভাবে শ্রমিক-না-পাওয়ার সমস্যায় ভুগছে। একাধিক কোম্পানি জানিয়েছে শ্রমিকরা এখন অনেক বেশি বেতন দাবি করছে। এর ফলে কোম্পানির সমস্যা বাড়ছে, অনেকেই নির্দিষ্ট সময়ে অর্ডার অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করতে পারছে না। এর কারণ হলো শ্রমিক না পাওয়া। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কোম্পানির ৯০ শতাংশ জানাচ্ছে, তাদের কাজকর্ম চালাতে উপযুক্ত পরিমাণ শ্রমিক তারা যোগাড় করতে না পারায় সংস্থা বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; ৯৫ শতাংশ কোম্পানি জানিয়েছে, পর্যাপ্ত শ্রমিক না পাওয়ায় তাদের বেতন বাড়াতে হয়েছে। সমীক্ষায় অংশ নিয়েছে এমন ৮৯ শতাংশ কোম্পনির বক্তব্য তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারে চাহিদা যে পরিমাণ বেড়েছে তা মেটাতে তারা সক্ষম নয়, কারণ শ্রমিক না পাওয়া। এসব দেখে 'ফিকি'-র পরামর্শ : সরকারকে একশো দিনের কাজ সংক্রান্ত আইনটি সংশোধন করতে হবে, প্রকল্পটি কার্যকর হোক একমাত্র 'নন-পিক' (non-peak) কৃষি মরশুমে ও ঘন-শিল্প অধ্যুষিত এলাকার শিল্প-সংস্থার ক্ষেত্রে। রাজ্যের ভিতর থেকেই শ্রমিক নিতে হবে— রাজ্য সরকার এমন ধরনের বাধ্যতামূলক নির্দেশ জারি করা বন্ধ করুন।

দেশে কি এমন একটাও রাজ্য পাওয়া যাবে করা যেখানে আইনের ঘোষণামতো কাজের দাবিদার মানুষ একশ দিন কাজ গোটা বছরে পেয়েছে? যে রাজ্য সর্বাধিক কাজ দিয়েছে তাও গড়ে ৫০-৬০ দিন। পশ্চিমবঙ্গে ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে গড়ে ৪৫ দিন। ২০১০-১১ আর্থিক বছরে আরও কমে হয়েছে ৩১ দিন। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত ৩৬.৮২ শতাংশ অর্থ এই খাতে খরচ করতে পেরেছে সরকার। দেশের ৩৪টি রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ২৮তম, আইনটি মোতাবেক যেখানে ৩০ শতাংশ মানুষকেও সরকার কাজ দিতে পারছে না সেখানে 'ফিকি'-র এই বিরোধিতা তাদের শ্রেণীগত অবস্থানকে আরও স্পষ্ট করে। কার্ল মার্কস এর কথায় : Thou shall not hurt thy own class interests.

বিশ্বায়ন এক পরিকল্পিত আক্রমণ

বিশ্বায়ন হঠাৎ করে লাফিয়ে ঘাড়ে পড়েনি। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন জনদরদী বা জনবিরোধী নীতিগত সিদ্ধান্ত নয়। এ এমনই এক অর্থ-ব্যবস্থা যা অধিকাংশ মানুষকে উন্নত জীবন যাপনের বোধটাকে অনেক উপরে ঠেলেঠুলে তুলে দেবে বলা হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভালোমানুষি প্রতিনিধিত্বের আড়াল নিয়ে দেশের স্বাধীনতা, স্বাভিমান, সার্বভৌমত্বের ক্ষতিসাধন করে। দেশের ভেতরে, দেশের বাইরে বিভিন্ন স্তরে স্থায়ী শোষণের নিখুঁত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এটা ভেবে দেখার মত বিষয় যে স্বাধীনতার পর সাম্রাজ্যবাদীদের এত বিশ্বস্ত অনুচর আগে কখনও এই দেশে কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসীন থাকেনি।

১৯৮৯ ওয়াশিংটন কনভেনসানে এক ধরনের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় :

১) বিশ্বের কর্পোরেশনদের জন্য অভ্যন্তরীণ বাজারের বাণিজ্যিক যেসব বাধা আছে তা মুক্ত করা।
২) বাজারে বিনিয়োগে পুঁজির ক্ষেত্রে কোনরকম বাধা থাকবে না। সরকারের যাবতীয় পরিচালনায় সুযোগ সুবিধার বেসরকারিকরণ, শিল্পকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা।
৩) বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সম্পত্তির অধিকার রক্ষা।
৪) ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস-এর (বা সেবাস্বত্ব, যেমন পেটেন্ট ইত্যাদি) রক্ষা। কিন্তু শ্রম, পরিবেশ সম্পর্কিত কোনও সুরক্ষা নয়।

দু-দশক ধরে পুঁজির আক্রমণের প্রেক্ষিতে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে ট্রেড ইউনিয়নগুলো পুরোনো পদ্ধতিতে শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিবাদ গড়ে তুলে এই ভয়াবহ রকমের শোষণ, নির্যাতন, অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না। অন্যদিকে বামপন্থীরা গত সাড়ে তিন দশক ধরে মহাকরণের মন্ত্রী হয়ে যা করলেন তাতে তাদেরকে শ্রেণীসংগ্রামে সহযোগী শক্তি হিসেবে ভাবা সম্ভব নয়। আসলে এই বামপন্থীরা এখনও ভালো একটা বুর্জোয়া বিকল্প চাইছেন তাই সরকার বিরোধিতায় তাদের এখন যতটুকু পাওয়া যাবে তা আসলে নির্বাচনী ব্যবস্থায় শাসকদলের বিকল্প হিসাবে নিজেদের তুলে ধরতে যতটুকু করা যায় ততটুকুই।

এই অবক্ষয়িত বামপন্থীদের বাদ দিয়েই তাই ভাবতে হবে। বর্তমানে যে নতুন ধরনের আক্রমণ নেমে এসেছে তার লক্ষ্যবস্তু শুধুমাত্র শ্রম বা শ্রমিকের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয় এবং নির্দিষ্টভাবে কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও সীমাবদ্ধ নয়। পুঁজির এই শোষণমূলক আচরণের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত এবং সংগঠনগত ঐক্য গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে শ্রমিকের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম, মানবাধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ও তাকে সুরক্ষিত রাখতে গরীব, প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের জোট গড়ে তুলতে হবে।

বিগত দুই দশকে ভারতীয় মিডিয়ার বিবর্তন

সুচরিতা সেন

বিগত দুই দশকে গোটা দুনিয়ার যা পরিবর্তন ঘটেছে তা হয়ত অভূতপূর্ব, অকল্পনীয়। কোনো ভিন্‌গ্রহের বাসিন্দা যদি কুড়ি বছর আগে ও পরে পৃথিবীতে আসত, তাহলে সে চিনতে পারত কিনা সন্দেহ। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটেছে মিডিয়ার ক্ষেত্রে। ইন্টারনেট, ই-মেল ইত্যাদি যোগাযোগের দিগন্ত অকল্পনীয়ভাবে বিস্তৃত করেছে, এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নেই। কিন্তু মিডিয়ার পরিবর্তন কোন্ দিকে যাচ্ছে, তার ভূমিকাই বা কী, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

প্রচার বা মতাদর্শ গঠনের চেষ্টা সম্ভবত মানবসমাজের আদি যুগ থেকে আছে। প্রথম দিকে এ দায়িত্ব পালন করত যাদুকর বা পুরোহিত শ্রেণী। ইউরোপে মধ্যযুগে বিভিন্ন খৃস্টান সংগঠন। আধুনিক প্রেস তার স্থান নিয়েছিল। সাংবাদিকদের বলা হতো, চতুর্থ এস্টেট। প্রথম তিন এস্টেট, গির্জা, অভিজাত সমাজ ও ব্যবসা বা শ্রমজীবীদের পরই। প্রেসের ক্ষমতা ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ ছিল না। বলা হয়, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট থেকে অ্যাসকিমকে সরিয়ে লয়েড জর্জকে বসাবার পেছনে ব্রিটিশ প্রেস, বিশেষত লন্ডন টাইমসের ভূমিকা কম ছিল না। লয়েড জর্জ স্বয়ং ভেবেছিলেন টাইমস-এর সম্পাদক হবেন। কারণ প্রধানমন্ত্রীর তুলনায় ঐ সংবাদপত্রের সম্পাদকের ক্ষমতা বেশি। বৈদ্যুতিন মিডিয়ার প্রভাব তো আরো শতগুণ বেশি।

তবে ক্ষমতার সঙ্গে মিডিয়ার স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রীকরণ বাড়ে নি। বরং তার একচেটিয়া চরিত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। দৈনিক সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক পত্রিকা, প্রকাশনা, রেডিও বা টিভি চ্যানেল, সব কিছু আজ একই মালিকানার ছত্রছায়ায়। গড়ে উঠছে দৈত্য-সদৃশ মিডিয়া কার্টেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থা এইরকম:

> "Robert Murdoch owns major newspapers in Australia, England, Chicago and New York, an European cable network and is part-owner of a chain of television stations in the United State, including 20th Century Fox. The Tribune Company owns The Chicago Tribune and the New York Daily News among the newspapers, television stations in Los Angeles, Atlanta and New Orleans, five radio stations and 15 cable television systems and the Chicago Cubs. In 1993, the New York Times Co. took over the Boston Globe, in a billion dollar deal when it already owned the International Herald Tribune (with the Washington Post) and more than 30 regional newspapers, 5 T.V. stations, radio stations an New York City and several magazines.
>
> "Eighty per cent of the so-called independent television channels are affiliates of three major networks... Within a space of nine months in 1986 ABC was bought by Capitol Cities, a media conglomerate, NBC by General Electric, the tenth largest industrial firm in the world and CBS by Laurence Tirch...
>
> "The newspaper ownership pattern is similar to that of television with two-thirds of the 1700 dailies controlling 80 per cent of circulation owned by channels like Cannett and Knight-Ridder. This constitutes a monopoly Press because less than four per cent of the American cities have competing newspapers under seperate ownership.[১]"

মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজি। নিয়ন্ত্রণ প্রধানত দুভাবে হয়, সরাসরি মালিকানা আর বিজ্ঞাপন নামক গাজর ও লাঠি। বিজ্ঞাপনের প্রকোপ অবিশ্বাস্য গতিতে বেড়েছে। দ্রব্য বা পরিষেবা যোগান দেবার তুলনায় সেসবের বাজার সৃষ্টি বা বিস্তৃত করা এখন বেশি জরুরি মনে করা হয়। ১৯৭২ সালে মার্কিন অভিনেতাদের গিল্ড বা সংগঠন জানিয়েছিল, তাদের যত সদস্য মঞ্চ, ছোট বা বড় পর্দায় কাজ করে, তার চেয়ে বেশি করে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে। পরবর্তী চার দশকে এই সংখ্যা বেড়ে কত হয়েছে তা কেবল অনুমান করা যায়। আমাদের দেশের দিকে তাকানো যাক। বেশ কিছু খবরের কাগজ খবরের চেয়ে বেশি জায়গা দেয় বিজ্ঞাপনে। টিভি প্রোগ্রামের মধ্যে কবার দেখা যায় 'ছোট্ট বাণিজ্যিক বিরতি'? তা সে সিরিয়াল বা টক-শো যাই হোক না কেন। অর্থাৎ সিরিয়াল বা টক-শো চলছে অনেকাংশে বিজ্ঞাপনদাতাদের সহায়তায়। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাঘা বাঘা 'মিডিয়া মোগল'রাও বিজ্ঞাপনদাতাদের সমঝে চলেন। একবার শক্তিশালী নাইলন কোম্পানি, আর একবার মেডিক্যাল পেশাকে চটিয়ে মিডিয়ার একাংশ বিপদে পড়েছিল। বিজ্ঞাপনের উৎস শুকিয়ে যাবে, এই ভয়ে বাধ্য হয়েছে পিছু হটতে। এ কথা মনে রাখতে হবে, 'মেডিকাল পেশা' বলতে

পশ্চিমে এখন আর হাতে কালো ব্যাগ, স্টেথোস্কোপ গলায় ঝোলানো ডাক্তার বোঝায় না। বহু হাসপাতাল, নার্সিং হোম, ওষুধ শিল্প ইত্যাদি মিলিয়ে এলাহি কারবার।

অবশ্য মিডিয়া কোনো যুগেই নিরপেক্ষ ছিল না। তবে নিও লিবারাল যুগে বৃহৎ পুঁজি ও বৃহৎ মিডিয়ার 'পার্টনারশিপ' যেমন বিস্তৃত ও খোলাখুলিভাবে চলছে, তেমনটাও বোধহয় দেখা যায়নি। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের এক মিডিয়া বিশেষজ্ঞের মন্তব্য এই রকম:

> বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত গ্রামীণ ফোন কত কোটি টাকা মুনাফা নরওয়ে বা পশ্চিমে পাঠিয়েছে এর হিসাব আপনি দেখেছেন? গত কয়েক বছর গ্রামীণ ফোন, দশ বছর না? তার মানে এক দশক ধরে কাজটা চলছে— দশটা বছর। এই রিপোর্টটা নাই। কিন্তু গ্রামীণ ফোন গত বছর যে প্রচুর ট্যাক্স সরকারকে দিয়েছে এ রকম একটা বড় রিপোর্ট আমাদের পত্রিকাগুলোয় এসেছে। এই রিপোর্টটা কিন্তু কোনো রিপোর্টার গিয়ে অনুসন্ধান করে রচনা করেন নি, তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে একটা প্রেস কনফারেন্স টাইপ করেছেন গ্রামীণ ফোনের অফিসাররা, সেখানে তাঁরা জানিয়েছেন, আমরা এই পরিমাণ টাকা সরকারকে দিয়েছি। মানে আমরা সরকারকে উদ্ধার করেছি। আবার যেমন ধরেন বিএটি, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো। ওঁরা কিন্তু এমন কাজও করেছেন পাহাড়ী অঞ্চলগুলিতে ...স্বাভাবিক গাছগুলোকে কেটে তামাকের চাষে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছেন, যেন পাহাড়ী লোকেরা, যাঁরা সাধারণ ঝুম চাষটাষ করেন, তাঁরা যেন তামাক চাষ করেন।... একটা খবর ভোরের কাগজ-এ এসেছিল ধরেন যে বছর আট-নয়েক আগে, ধারাবাহিক ভাবে।... তো, যাঁরা স্বাভাবিক চাষাবাদকে নষ্ট করে দিয়ে তামাক চাষকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন, তার জন্য টাকা বরাদ্দ করছেন আগাম, চাষের আগেই আগাম কিনেও নিচ্ছেন তামাক,... তাঁরা বনায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার পাচ্ছেন পরপর তিন বছর ধরে। তো, এগুলো কি আমাদের অর্থনৈতিক রিপোর্টের আওতার মধ্যে পড়ে না?[২]

তারপর:

> ...পার্টনারশিপ, মূলতঃ একটা ব্যবসা-বাবদ এবং মিডিয়াই বলছে কারা কারা তার পার্টনার। পার্টনারশিপের এই ক্লাব একটা ব্যবসায়িক বন্দোবস্ত।... তারা তো আপনাকে (সাংবাদিককে) কর্মচারী হিসেবে নিয়েছেন, যেন আপনি তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাজ করেন। আর উদ্দেশ্য পূরণে যদি আপনি কাজ না করেন, তাহলে তো আপনাকে বিদায় করে দেবে।[৩]

এই কনট্রাক্ট ভারতীয় মিডিয়ার ক্ষেত্রেও কার্যকর হয় নি, এমন কথা বলা যাবে না। 'রাডিয়া টেপ' paid news, অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে খবর প্রকাশের কেলেংকারিটি অনাবৃত করেছে। একটি খ্যাতনামা ইংরিজি দৈনিকের সম্পাদক এর দরুন স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন, বা নিতে বাধ্য হয়েছেন। তবে এটাই তথাকথিত 'কনট্রাক্টের' একমাত্র উদহরণ, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। আর একটু সূক্ষ্মভাবে টাকার খেলা আমরা ঢের দেখেছি। রেলমন্ত্রী থাকার সময় মমতা বিভিন্ন সংবাদপত্রে নিজের শিলান্যাসে (অনেক ক্ষেত্রে তার বেশি অগ্রসর হয় নি) কত টাকার বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, তার খবর কে রাখে? বহু টিভি চ্যানেল 'পরিবর্তনের' বাণী দিয়ে বিজ্ঞাপন ফ্ল্যাশ করেছিল প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর, পশ্চিমবঙ্গের বিগত নির্বাচনের ঠিক আগে। সে টাকাই বা কোথা থেকে এসেছিল?

টিভি চালু হওয়ার পর অনেক দিন সরকারি দূরদর্শনের 'মনোপলি' ছিল। এখন কেবল কলকাতাতেই আক্ষরিক অর্থে একশোটি চ্যানেল। এর দরুন বৈচিত্র্য এসেছে। বেড়েছে মানুষের বেছে নেওয়ার ক্ষমতা। টক-শো-র মাধ্যমে শ্রোতার সঙ্গে টেলিযোগে যোগাযোগ হয়ত সাধারণ মানুষকে মতপ্রকাশের অধিক সুযোগ দিয়েছে। আর কাছাকাছি এনেছে বক্তা ও শ্রোতাকে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে বৈচিত্রে-এর অন্তরালে চোখে পড়ে পুনরাবৃত্তি, একদেশদর্শিতা। কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে বেশির ভাগ চ্যানেলের সংবাদ পরিবেশন ও বিশ্লেষণের ধারা এক গতে বাঁধা। বরং বিভিন্ন চ্যানেল থেকে একই দৃশ্য দেখে, একই কথা শুনে, দর্শক চালিত হয় এক বিশেষ পথে। তার উপর হিস্টিরিয়া জাগিয়ে তোলার ব্যাপারেও, টিভি দক্ষ। অবশ্য প্রিণ্ট মিডিয়াও এ ব্যাপারে কম যায় না। তবে স্বাভাবিক কারণে কথার হরফের তুলনায় চলমান ছবির প্রভাব আরো ঢের বেশি। কখনো কখনো, মানতেই হবে, মিডিয়ার সংঘবদ্ধ অভিযান দোষীকে চিহ্নিত করতে, ন্যায় বিচার অনুপ্রাণিত করতে সাহায্য করে। যেমন, জেসিকা লালের ক্ষেত্রে। মিডিয়ার 'ক্যাম্পেন' ছাড়া হয়ত একটি নির্দোষ, অসহায় মেয়ের খুনীর পুনর্বিচার ও উচিত শাস্তি হত কি না সন্দেহ। অর্থ ও রাজনৈতিক প্রভাবের সাহায্যে সে পার পেয়ে যেতো। কিন্তু মুদ্রার বিপরীত দিকও আছে। অনেক সময় মিডিয়া কোনো এক অভিযুক্তকে সাক্ষ্য প্রমাণ, বিচার ইত্যাদির অনেক আগেই দোষী বলে সাব্যস্ত করে ও তা নিয়ে জোরদার প্রচার চালায়। যাকে বলে 'ট্রায়াল বাই মিডিয়া'। এর দরুণ ন্যায় বিচার ব্যাহত হতে পারে। তাছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা, যা সত্যই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যেমন কার্গিল যুদ্ধ বা মুম্বাইতে পাক সন্ত্রাসবাদী হানা, তাও মিডিয়ার একাংশ এমন হিস্টেরিকাল ভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখায়, যাতে যুক্তিযুক্ত সমাধান আরো কঠিন হয়ে ওঠে। এমন কি খেলার মাঠেও এক রকম হিস্টিরিয়া তৈরি করা হয়। বিশেষ করে ভারত বনাম পাকিস্থান ম্যাচের ক্ষেত্রে।

When television and radio commentators are

> highly charged concepts of difference and identity in mediating sport— most obviously there relating to race and nation— they do so to provide effectless involvement for audiences but at the risk of giving sustenance to divisive and unacceptable attitude and behavior.[8]

এ কথা উল্লেখযোগ্য যে ভারত সরকার সম্প্রতি তিনটি বিখ্যাত ওয়েবসাইট ফেসবুক, গুগলস্ ও ইয়াহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে, তারা না কি বিভাজন ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেশের সংহতি নষ্ট করছে। আরো ১৮টি সাইট অনুরূপ অভিযোগের তালিকায় আসতে পারে। সরকারি অভিযোগ ষোল আনা সত্য কি না, তা এখনই বলা যায় না। তবে এ জাতীয় অভিযোগ বিভিন্ন মাধ্যমের বিরুদ্ধে আসে। এটা ঘটনা।

মিডিয়ার আর এটি দিক হলো কেবল প্রাইভেসি হরণ নয়, মর্মান্তিক ব্যাপারকে নিছক এনটারটেনমেন্টের পর্যায় ফেলা। সাদ্দামের শেষ মুহূর্তের ছবি তোলা হয়েছিল মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। এর অবশ্য সুফল হয়েছিল। জন-চেতনার প্রসার মার্কিন কুকীর্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ। কিন্তু এর অন্য দিকও আছে, যা আমাদের মিডিয়ার ক্ষেত্রে ধরা পড়ে। বিগত কয়েক বছরে কয়েকটি 'লিঞ্চিং', নিদেন পক্ষে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের প্রচণ্ড মারধর ও নির্যাতনের ছবি দেখা গেছে লাইভ টিভি-তে বা প্রিন্ট মিডিয়ার ফোটোতে। মিডিয়া-পার্সনরা নির্লিপ্তভাবে ছবি তুলছেন, যেন সবটাই স্টুডিয়োর মধ্যে অভিনয়। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

> A woman from Jharkhand was publicly beaten and stripped by a group in Patna…. The incident shown live in TV channels, appalled many, including the political class as well as the National Commission for Women, who denounced the public humiliation of the 20 year old.[৫]

যা ঘটেছিল, তা নিন্দা করার ভাষা নেই। কিন্তু এটাও উল্লেখযোগ্য যে টিভি-র ফোটোগ্রাফার-সাংবাদিক বাধা দেওয়ার কোনো চেষ্টা না করে বরং ঝালটক খাদ্যের মতো খবর ও ছবি দর্শকের সামনে পরিবেশন করেছিলেন। 'সেনশেনাল' ও 'কমার্শিয়াল' সিনেমার মতো সংবাদ সংগ্রহের এ এক নমুনা। যার সাথে অন্যায়কে অনাবৃত করার সম্পর্ক কম।

টিভির বিজ্ঞাপন বা সিরিয়ালের মধ্যেও অনেক সময়ে বিশেষ শ্রেণী ও নিজের প্রতি সূক্ষ্ম অথবা অনতিসূক্ষ্ম পক্ষপাতিত্ব ফুটে ওঠে। ফর্সা, সুন্দরী, সুসজ্জিতা গৃহিণী এক স্বচ্ছন্দ পরিবেশের মধ্যে অঙ্গসজ্জা বা গৃহসজ্জা করতে ব্যস্ত। অথচ 'আমুল বেবি' ধরণের শিশুদের পরিবেশন করছেন পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাদ্য। এই বৃত্তের বাইরে ছোট পর্দা পা না ফেলে এমন নয়, তবে খুব বেশিও নয়।

> Inevitably women with such facilities perform with tradition-dominated tires of control. The central focus is invariably the males within a home, women play secondary roles that advance the action. The marginalization of women as the primary focus is normative…
>
> Uma Chakravarti…. locates a paradigm shift from the earlier TV serials that was about national concerns and issues, spanning the historicity of the colonial experience and post-colonial….[৬]

অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। মধু ভাণ্ডারকরের corporate বা সন্দীপ রায়ের Hitbit-এ পরিবারেই বুদ্ধির খেলায়, এমন কি সম্মুখ সমরে পুরুষদের করছে পরাজিত।

ভারতীয় মিডিয়ার বিবর্তণ ও বিশ্বায়ন

স্বাধীন ভারত প্রথম দিকে বৃটিশ যুগের ধারাতেই মিডিয়া ব্যবস্থা পরিচালনা করেছিল। বৈদ্যুতিন মিডিয়া, রেডিও, খবর সেই সঙ্গে টিভি ছিল সরকার নিয়ন্ত্রিত। আর প্রিন্ট মিডিয়া অর্থাৎ প্রেস ছিল মূলতঃ ব্যক্তি মালিকানাধীন। বৈদ্যুতিন মিডিয়াকে সরকার থেকে স্বতন্ত্র করার বা একাধিক স্বয়ংশাসিত (autonomous) সংস্থার অধীনে রাখা যায় কি না, তা নিয়ে বহুদিন ধরে আলোচনা হয়েছে। সরকারি যুক্তি ছিল, উন্নয়ন ইত্যাদির ব্যাপার সরকারি মাধ্যম যতটা আগ্রহী হবে, বে-সরকারি মাধ্যম স্বাভাবিক কারণেই তা হবে না। যাকে বলে 'develppment journalism'। তাছাড়া বহু জাতি-ধর্ম অধ্যুষিত ভারতে বে-সরকারি মাধ্যম বিবাদ বাধাতে পারে। তবে বে-সরকারি প্রতিযোগিতার মুখে সরকারি মাধ্যমকেও কিছুটা নমণীয় হতে হলো। যেমন ১৯৫৭-এ শ্রীলঙ্কার একটি সঙ্গীত স্টেশন খুব জনপ্রিয় হওয়ার দরুণ আকাশবাণী অনুরূপ প্রোগ্রাম শুরু করে। কিছু কিছু বিজ্ঞাপনও ছিল। দুরদর্শন চালু হওয়ার পর প্রথম দিকে অনেক প্রোগ্রাম ছিল শিক্ষামূলক। স্কুল-কলেজ, পড়াশোনা, উন্নত কৃষি পদ্ধতি, পরিবার পরিকল্পনা, ইমিউনাইজেশন ইত্যাদি ঘিরে। একটি দরিদ্র দেশে ছোট পর্দার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে উত্তরে বলা হয়েছে, নিরক্ষর জনতার মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার এটাই উৎকৃষ্ট উপায়। অবশ্য তখন বেশি মানুষ টিভি-র মালিক ছিল না। অনেকে যাতে একসঙ্গে শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম দেখতে পারে, সে জন্য 'কমিউনিটি টিভি-র' কথা উঠেছিল। ১৯৮০-তে INSAT স্যাটেলাইট চালু হওয়ার আগে জনতার ২৮ শতাংশের বেশি টিভি নেটওয়ার্কের মধ্যে ছিল না।

পরবর্তী দেড়-দুই শতকে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে লাগল। আশির দশকে টিভি সেটের সংখ্যা অনেক বাড়ল। কোনও কোনও পর্যবেক্ষকের মতে এর মূলে ছিল রাজনীতি। ইন্দিরার

পরে রাজীবের ভাবমূর্তি প্রচারের তাগিদ। নব্বইয়ের দশকে কেব্‌ল নেটওয়ার্কের অকল্পনীয় প্রসার। এখন দরিদ্র বস্তিতেও টিভি বহিরাগত নয়। মনে করা হয় চীন ও ভারত মিলে প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ। ধরে নেওয়া যায়, যারা টিভি সেটের মালিক নয়, তারা দর্শক। প্রভূত প্রসারের সঙ্গে তাল রেখে যা বেড়েছে, তা হলো বাণিজ্যকরণ। অর্থাৎ বিজ্ঞাপন ও স্পনসরের গুরুত্ব। প্রাইম টাইমে সোপ অপেরা জনপ্রিয়। লঘু মেজাজের সিরিয়াল এবং এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বাণিজ্যিকরণের সঙ্গে যুক্ত নিও লিবারানিজম ও তার গুণগাথা।

মিডিয়ার পুঁজির প্রতি আনুগত্য অবশ্য নতুন নয়। বোধ হয় প্রেস বস্তুটির জন্মলগ্ন থেকেই এটা লক্ষণীয়। যেমন ১৯৬৯-এ ভারতে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় প্রেসের মিথ্যাচার ও পক্ষপাতিত্বের কথা। সে সময়ে অবশ্য মিডিয়া বলতে মূলত প্রিন্ট মিডিয়া বোঝাত। ইন্দিরা মিডিয়ার কাছে সাহায্য দাবি করেছিলেন। জরুরী অবস্থার স্বপক্ষে। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর নিওলিবারাল ঢেউ বিশ্বকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এ দেশের মিডিয়াতে তার প্রভাব পড়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। একই সঙ্গে মিডিয়ার প্রচার ও প্রসার বহুগুণ বাড়ায় দক্ষিণপন্থা আরও প্রকট ও প্রভাবশালী হয়েছে। এক মিডিয়া বিশেষজ্ঞের ভাষায়,

> The newspaper or TV channel lingo also reflects the hegemonic meaning of today's buzzwords suppressing all other meanings and correction. Now reform means pro-market and anti-labor changes dismantling the state sector, open economy means force flow of foreign direct investment, development means unbridled urbanization for the elite and upper middle classes at the cost of the peasants and urban poor, industrialization means the capitalist's right to gobble up peasants lands with government support and denial of alternative livelihood to thousands of land-losers, and so on.[৭]

যে কোন জনবিরোধী পদক্ষেপ চোখে পড়লেই মিডিয়ার সিংহভাগ প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে সমর্থন জানায়। বে-সরকারিকরণ, শ্রম-আইনের 'নমনীয়তা', ইন্দো-মার্কিন নিউক্লিয়ার চুক্তি, খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ, বে-সরকারি শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ। এমন কি 'সংস্কারের' তাড়নায় মাঝে মাঝে সাধারণ রাজনৈতিক সমীকরণও পালটে যায়। যেমন মিডিয়ার যে অংশ কট্টর বামফ্রণ্ট বিরোধী, তারাও সিঙ্গুরের প্রশ্নে (তবে নন্দীগ্রামের নয়) সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

কেবল নিও-লিবারাল নীতির সমর্থন নয়, তার সাথে যুক্ত হয়েছে ধনপতিদের ব্যক্তিগত আরাধনা। স্ট্যালিন, মাও প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতাদের ব্যক্তিপূজা ঘিরে অনেক কিছু বলা হয়েছে। হয়তো ব্যাপারটা সঠিকও ছিল না। কিন্তু ভারতীয় (এবং অন্য দেশের) মিডিয়া যে ভাবে সর্ব্বোচ্চ পুঁজিবাদী উদ্যোগপতিদের তুলে ধরেছে, তা অতুলনীয়। 'ইকনমিক টাইমস' বছরের ২০ জন সেরা উদ্যোগপতিকে পুরস্কার দেয় ও তাদের শিবির যা হৈ চৈ করে, তা নোবেল পুরস্কারের তুল্য। আরো মজার কথা, কোন ভারতীয়, এমন কি অনাবাসী ভারতীয় উদ্যোগপতি বিদেশে প্রতিপত্তি বাড়ালে আমাদের মিডিয়া তার জয়গান করতে ছাড়ে না। যেন এর দরুন দেশের আম-আদমির কোন সুরাহা হয়েছে। রতন টাটা যখন ইংল্যান্ডের একটি মোটর কোম্পানী অধিগ্রহণ করলেন, ভারতীয় মিডিয়া এমন করলো, যেন পলাশির প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। অথচ কিছুদিনের মধ্যে কোম্পানিটি আর্থিক সংকটে পড়ল আর 'বিজয়ী বীর' টাটা সাহায্যের জন্য বৃটিশ সরকারের দ্বারস্থ হলেন। বিহারি বংশজাত কিন্তু বহুদিন যাবত বিদেশবাসী লক্ষ্মী মিত্তল যখন বেলজিয়ামের 'আর্সেলর' নামক ইস্পাত সংস্থা প্রতিযোগিতার মুখে দখল করলেন, তখনও এ দেশের মিডিয়া আনন্দের ফোয়ারা ছোটাল। একবার এক অগ্রগণ্য ইংরাজি দৈনিক এই ভাষায় সম্পাদকীয় লিখল "Come back Lakshmi"। অর্থাৎ লক্ষ্মী মিত্তল ও ঐ নামের ধনদেবী সমার্থক। মিত্তল নিজের পূর্বপুরুষদের দেশে পদার্পণ করলে ভারতের দুঃখ ঘুচবে।

প্রেস ও বৈদ্যুতিক মিডিয়ার যোগসূত্রও উল্লেখযোগ্য। যেমন 'আনন্দ' গোষ্ঠির 'স্টার আনন্দ', 'প্রতিদিন' নামক দৈনিক সংবাদ পত্রের 'টেন টিভি'। একে অন্যের সহযোগী ও পরিপূরক।

ভারতীয় মিডিয়ার নিও-লিবারাল ও বিশ্বায়িত পথে বিবর্তন সম্বন্ধে দুই প্রখ্যাত মার্কিন মিডিয়া বিশেষজ্ঞের মন্তব্য দেখা যাক।

> This was the begining of a major influx, by early 1996 India had some forty cable and satellite channels operating including BBC, MTV, CNN, WorldNet, GulfNet and Prince (a Dallas-based Sport network). Perhaps the most important new channel was Zee TV, started in 1992, 49.9 per cent owned outdraw News Corporation (Murdoch), and offering popular programming to a broad middle class in Hindustani, Urdu and English. By early 1996, Zee TV reportedly outdraw Doordarshan in prime time by 37 to 28 per cent....[৮]

কেবল মালিকানা নয়। ছোট পর্দায় যা দেখানো হয়, তার চরিত্রও অনেকখানি পালটে গেল। আর এই পরিবর্তন শ্রেণী বৈষম্যর সঙ্গে সম্পর্কহীন ছিল না।

While programming for schools and forums persist to this day, there offerings are allotted shocking budgets and are pushed off the air when sponsored presentations like cricket matches have to be accommodated. Meanwhile on prime time, soap operas, sitcoms and films reign. Doordarshan's latest start at winning away from competing channels has been a film channel, the fact that this can be a priority in a country where a third of the population (some 300 to 500 people in a population of 950 million) still live at subsistence level is an indication of the waywardness of the television revolution.[৯]

প্রাক ১৯৯১ যুগে অবশ্য প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়। হয়তো কাম্যও নয়। আজকের প্রয়োজন একটি গণতান্ত্রিক মিডিয়া ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতাই হবে তার ভিত্তি। এই মিডিয়া হবে আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যপূর্ণ, বিভিন্ন মতের দর্পণ। অথচ প্রগতিশীল লক্ষ্যে স্থির। এ কাজ কঠিন, অথচ না করলেও নয়।

সূত্র:

১। Paul Kalra: *American Class System, Divide and Rule*, Antenna Publishers, California, 1995, pp. 205-06

২। সেলিম রেজা নিউটন; 'দীক্ষায়ণ— প্রকৌশলের আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়া', *বাজারের যুগে মিডিয়া*, সম্পাদনা : সুদীপ্ত শর্মা, জামশেরুল করিম, আদর্শ, ঢাকা, পৃ. ৪২

৩। ঐ, পৃ. ৫২

৪। Sanjukta Dasgupta, Dipankar Sinha, Sudeshna Chakravort: Media, Gender and Popular Culture in India, Sage 2011, p. 102

৫। Ibid p. 102

৬। Ibid pp. 106-07

৭। Biswajit Roy: 'The Politics of Development and Corporate Media, Paradigm Shift in Professional Benchmarks', *Beyond Developmentalism,* ed. Nilanjan Dutta, Shreya Publication, 2010, p. 163.

৮। Edward S. Herman & Robert W. McCherney: *Global Media : The New Missionaries of Corporate Capitalism*, 1998, p. 187

৯। Ibid p. 187

'বিশ্বায়ন' সংকটে, এ সংকট বিশ্ব পুঁজিবাদেরই সংকট

৪৫ পৃষ্ঠার পর

বিশ্বায়ন কেবল গরিব দেশগুলোকে পদদলিত করছে না, তা ব্যাংক পুঁজির ঘাড়ে চড়ে সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করছে এমনকি অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশ গ্রীস, ইটালি এবং এমন অনেক দেশের। এই আক্রমণমুখী অবস্থান প্রক্রিয়াটিকেই দুর্বল করবে। সব চেয়ে শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশ যখন ইউএনডিপির ইনইকুয়ালিটি এডজাস্টেড ইনডেক্স[১০] অনুসারে নিম্ন অবস্থানে নেমে আসে, তখন বলা যায় না যে, বিশ্বায়নের সুদিন চলছে। তাই, পুঁজিবাদ যতই আক্রমণমুখী হবে বিশ্বায়ন তত দুর্বল হবে। তাই, বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যে সংকট নানাভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, তা কথিত বিশ্বায়ন পুঁজিবাদ থেকে পৃথক কোনো সত্তা বা ঘটনা নয়। তাই, কথিত বিশ্বায়নের সংকট বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই সংকট।

টীকা

১। আইএমএফ, *গ্লোবালাইজেশন: এ ব্রিফ ওভারভিউ*, ইসু ব্রিফ, মে, ২০০৮

২। বহু দেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবাকে পুঁজি শিল্পে রূপ দিয়েছে, অনেক দেশে তা বিশাল বাণিজ্য, কোনো কোনো দেশে এ দুই খাত মোট অভ্যন্তরীণ আয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ যোগায়।

৩। ওইসিডি, *ট্রেড অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট*, ২০০৫; *বিশ্বব্যাংক, গ্লোবালাইজেশন, গ্রোথ অ্যান্ড পভার্টি*, জানুয়ারি ২০০২; ডব্লুটিও, *ওয়ার্ল্ড ট্রেড রিপোর্ট*, ২০১১

৪। ফিদেল কাস্ত্রো, *সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন* (ওমর তারেক চৌধুরী কৃত অনুবাদ), শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫

৫। জোসেফ স্টিগলিৎস, 'মেকিং গ্লোবালাইজেশন ওয়ার্ক ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিজ', স্যার উইনস্টন স্কট মেমোরিয়াল লেকচার, সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ বার্বাডোজ

৬। স্টেফানিয়া ভিটালি, জেমস গ্ল্যাটফেল্ডার, স্টেফানো ব্যাটিস্টন, *দি নেটওয়ার্ক অফ গ্লোবাল কর্পোরেট কন্ট্রোল*, ২০১১

৭। *অবজারভার ফুড মান্থলি*, ২০ জানুয়ারি ২০১১, 'ফুড স্পেকুলেশন: পিপল ডাই ফ্রম হাঙ্গার হোয়াইল ব্যাংকস মেক এ কিলিং অন ফুড'

৮। ওইসিডি, *এমপ্লয়মেন্ট আউটলুক*, জুন ২০০৬

৯। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম, *গ্লোবাল রিস্ক্স টু থাউসেন্ড ইলেভেন*, জানুয়ারি ২০১১

১০। এ সূচকে আয়, শিক্ষা ও আয়ের বিবেচনায় জীবনমান বিবেচনা করা হয়।

বিশ্বায়ন ও আদিবাসী : লড়াই-এর মূল

শুচিব্রত সেন

১৯৩৯, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আরণ্যক' উপন্যাসে এক আদিবাসী রাজকন্যা ভানুমতির চোখ দিয়ে ভারতবর্ষের আদিবাসী জীবনের এক ট্রাজেডি আবিষ্কার করেছিলেন।

—আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম জান?
—আমরা গয়া জেলায় বাস করি।
—ভারতবর্ষের নাম শুনেছ?
ভানুমতি মাথা নাড়াইয়া জানাইল সে শোনে নাই, কখনও কোথাও যায় নাই চকমকিটোলা ছাড়িয়া, ভারতবর্ষ কোন দিকে?

আজ শতাব্দী অতিক্রান্ত করে, অনেক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরেও এ প্রশ্ন তোলাই যায় ভারতবর্ষ কি আদিবাসীদের দেশ? সময়কাল ব্যতীত যেমন ইতিহাস হয় না, তাই ১৯৩৯ ও তার পরবর্তীতে ভারতবর্ষ যে দ্রুত বদলে যাচ্ছিল এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু এ বদল বা পরিবর্তনের চরিত্রটা এক ছিল না। স্থান ও সম্প্রদায়-ভেদে তার তফাৎ ছিল। একই ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে থেকে এবং একই রাজনৈতিক প্রভুর ছত্রচ্ছায়ায় ভারতীয় ইতিহাসে বদলের মাত্রার পার্থক্য তাই অনস্বীকার্য। আদিবাসী জীবনে এই বদলের প্রভাব এবং বর্তমান বিশ্বায়নের অভিঘাত এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

যাঁরা আদিবাসী জীবনের সঙ্গে সামান্যমাত্র পরিচিত তাঁরা জানেন যে, নাগরিক সভ্যতা থেকে অনেক দূরে লবটুলিয়া, নাড়া বইহার, ছোটনাগপুর, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের জঙ্গলই তাদের বাসভূমি। চাহিদা সামান্যই, তাই সেখানকার প্রকৃতি-দত্ত জল, জমিন নিয়েই তারা ছিল সন্তুষ্ট। উপরন্তু প্রভুত্বকারী হিন্দু, মুসলমান প্রতিবেশীদের তাদের প্রতি ঘৃণা ও অসভ্য বর্বর ইত্যাদি অভিধার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ না করেই তারা এক নীরব অভিমানে দূরে সরেছিল। আমরা মহাপণ্ডিতরা তাদের উপর হিন্দু প্রভাব নিয়ে বড় বড় তত্ত্ব আবিষ্কার করেছি, যেমন সংস্কৃতায়ন ইত্যাদি, কিন্তু কখনও ভেবে দেখিনি এই 'অসভ্য'দের সংস্কৃতি কী ভাবে একদিন সুদূর অতীতে Tribalisation of Hindu Culture ঘটিয়েছিল।[১] উৎসাহী পাঠক নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালির ইতিহাস' অথবা ক্ষিতিমোহন সেনের 'ভারতের সংস্কৃতি' পড়ে দেখতে পারেন। আজকের হিন্দুসমাজের শ্রাদ্ধকর্ম, অভ্যুদায়িক, অস্থিবিসর্জন সবই আদিবাসী সংস্কৃতি থেকে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করেছে।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আদিবাসী সমাজে যে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হল তা ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার মাত্র। ঔপনিবেশিক বনসংরক্ষণ নীতি জঙ্গলের উপর তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তবুও বহু পতিত জমি আবাদযোগ্য করে তারা একটু স্থিতু হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের উন্নয়নের রথের চাকায় আবার সেই ভূমিচ্যুত হবার পুরানো গল্পের নতুন করে শুরু। সম্ভবত সমগ্র আদিবাসী ইতিহাসকে সংক্ষেপিত আকারে কেবলমাত্র একটি বাক্যে প্রকাশ করা চলে আর তা হল আদিবাসী ইতিহাস ক্রমাগত ভূমিচ্যুতির ইতিহাস। অবশ্য মার্কসীয় সমাজ-বিজ্ঞানের ভাষায় এক শ্রেণীর শোষণের মধ্যে দিয়েই অপর শ্রেণীর উন্নতি। বৃহৎ বাঁধ, কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন নিঃসন্দেহে এক শ্রেণীর উন্নয়ন, কিন্তু তা কেবলমাত্র আদিবাসীদের উৎখাতের মধ্য দিয়ে। কেননা এরা সাংগঠনিকভাবে দুর্বল, অত্যন্ত সরল এবং শিক্ষার হার সবচেয়ে কম। সুবোধ ঘোষ তাঁর 'ভারতের আদিবাসী' গ্রন্থে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন যে, "দলিতরাও শোষিত, কিন্তু হরিজন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের রাজনীতিতে তারা একটা শক্ত স্থান দখল করে নিয়েছে। কিন্তু আদিবাসী আন্দোলনে কোন রাজনৈতিক নেতৃত্বই সেভাবে এগিয়ে আসে নি।" ঝাড়খণ্ড পার্টি গঠনের পর যেটুকু আশার সঞ্চার হয়েছিল সমাজের প্রতি নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতায় অচিরেই তা অকার্যকর হয়ে পড়ে। ১৯২৮-এর 'ছোটনাগপুর উন্নতি সমাজ' থেকে শুরু করে সত্তরের দশকের প্রথমদিকে 'ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা' গঠন হওয়া পর্যন্ত একে দীর্ঘ পরিক্রমার ইতিহাস। কিন্তু জয়পাল সিং থেকে শিবু সোরেনও এক দীর্ঘ বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। এলিট রাজনীতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে বিভিন্ন দল ও উপদলের সৃষ্টি হোল। তৈরি হল সোরেন, হোরো ও নরেন হাঁসদার দল। ১৯৮৭ সালে নির্মল মাহাতোর মত নেতৃত্বের হত্যার জন্যও দায়ী ছিল আদিবাসীদের নিজেদের রাজনীতি। এর উপরেও ছিল আজসু (বা অল ঝাড়খন্ড সুডেন্টস ইউনিয়ন) এবং জোহার (মানবাধিতার ভিত্তিক ঝাড়খণ্ড সংঘ)। ঝাড়খণ্ড রাজনীতির এই ঘূর্ণাবর্তে সাধারণ আদিবাসীদের মোহভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগে নি। সুবর্ণরেখা-করকাই বাঁধ নির্মাণের ফলে সিংভূমে প্রায় পাঁচহাজার আদিবাসী গৃহহারা হয়। এর বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ডীরা কোন সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে নি।

এই মোহভঙ্গের পরিণামে আদিবাসীদের মধ্যে যে অসহায়তার সৃষ্টি হল তার রাজনৈতিক পরিভাষা সমাজ-বিজ্ঞানে যে নুতন শব্দের সৃষ্টি করল তা হলো Identity Crisis বা আত্ম-পরিচয়ের সংকট। একদিকে সার্ব-অলটার্ন ঐতিহাসিকরা এদের স্বতন্ত্র করলেন, অন্যদিকে পার্থ চ্যাটার্জির মত সমাজবিজ্ঞানীরা fragmented বা বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস রচনায় তাদের পাণ্ডিত্য দিয়ে এক ভারত ইতিহাসে এক নূতন মাত্রা যোগ করলেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে, উভয় ক্ষেত্রেই প্রাধান্য পাচ্ছে ঐক্য নয়,

বিচ্ছিন্নতা। ভাবলে ভুল হবে যে, এটি শুধু ভারত ইতিহাসকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী জনগোষ্ঠীর আন্দোলনকে আত্ম-পরিচয়ের সংকট বা Identity Crisis দিয়ে ব্যাখ্যা করার একটা প্রবণতা।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বায়নের প্রভাবটি আলোচ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে লেনিন বলেছিলেন 'Third and permament crisis of Capitalism'। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজ বিভিন্ন কৌশলে সেই সংকট কাটিয়ে ওঠে। গত শতাব্দীর ৮০-র দশক থেকে ধনতন্ত্রে আবারও যে সংকট ঘনীভূত হয় তাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য নবতর অর্থনৈতিক দর্শন 'বিশ্বায়ন' বা গ্লোবালাইজেশনের সৃষ্টি। একটু অন্যভাবে মার্কসের কথায় বলা যায়, 'দুনিয়ার বুর্জোয়া এক হও'। মার্কসকে দিয়েই না হয় মার্কসকে ঠেকানো যাক।

৮০-র দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এক-মেরু বিশ্বে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া অনেক দ্রুততর হয়। ইতিহাসের প্রায় আদিপর্ব থেকে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান কোন নূতন ঘটনা নয় এবং এর ফলে লাভবান হয়েছিল বিভিন্ন দেশই। কিন্তু বর্তমান বিশ্বায়নের সঙ্গে রয়েছে পূর্বেকার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চরিত্রগত পার্থক্য। অধ্যাপক পার্থ চ্যাটার্জির মতে তথ্য প্রযুক্তিতে এক ধরনের বিপ্লব আসার ফলে মূলধনের বাজারের অবিশ্বাস্য ও দ্রুত প্রসার ঘটেছে যা পুঁজির ইতিহাসেও নিয়ে এসেছে এক বিপ্লব। আর এখানেই নিহিত তার শক্তি। উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলি এক নয়া সাম্রাজ্যবাদের শিকারে পরিণত। এই দেশগুলির বৃহৎ বাজার করায়ত্ত করাই এর লক্ষ্য আর তা করতে গিয়ে সেই দেশগুলির রাজনৈতিক নেতৃত্বের সহযোগিতা দরকার। কাজেই বিশ্বায়ন শুধু অর্থনীতি নয় গরিব দেশগুলির রাজনীতিও নিয়ন্ত্রণ করছে। অর্থ ব্যতীত উন্নয়ন সম্ভব নয়, আর তাই অর্থ যোগান দেবে বিদেশি মূলধন আর তার সাথে সাথে সস্তার শ্রমিক দিয়ে উৎপাদন করিয়ে লাভের অংশ বৃদ্ধি পাবে। এর অন্যতম গালভরা নাম out-sourcing।

ভারতবর্ষে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার সূচনা ১৯৮০ দশকের গোড়ায়। ১৯৯৪-৯৫ সালে মূলধনী যন্ত্রের আমদানি বাণিজ্য ঘাটতি বাড়িয়ে দেয়, বৈদেশিক ঋণের বোঝাও ভারী হয়ে ওঠে। বিশ্বব্যাঙ্ক এর নির্দেশ অনুসারে এ দেশে শুরু হয় ব্যাপক হারে বেসরকারিকরণ। বৃহৎ ভোগ্যপণ্য শিল্পে লাইসেন্স প্রথার বিলোপ ঘটে। উৎপাদন ক্ষেত্রে দেশজ কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বাধ্যবাধকতার বিলুপ্তি ঘটে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার বিদেশী ভোগ্যপণ্যের বাজার সুরক্ষিত রাখতে সরকারি কর্মচারিদের বেতন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করে। এত বৃহৎ আয় বিশিষ্ট যে শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে ওঠে বহুজাতিক সংস্থার বিপুল লাভের জন্য তারাই যথেষ্ঠ। ফলশ্রুতি ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি। যে বিপুল জনসংখ্যা এর বাইরে থেকে গেল তাদের জন্য কী রইল!

ভারতের আদিবাসী সমাজে কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত সংখ্যা গরিষ্ঠ ব্যক্তি, বাকিরা খেতমজুর। পশ্চিমবঙ্গে শুধু সাঁওতাল জনজাতিকে ধরলে ২০০১-এর হিসাব অনুযায়ী তারা সংখ্যায় ২২,৮০,৫৮০— ৫১.৮ শতাংশ। অন্য সমস্ত জনজাতিকে ধরে এখানে কৃষিতে তাদের কর্মনিয়োজনের হার মাত্র ২৩.৭ শতাংশ। বাকিরা কৃষি মজুর বা অন্যান্য অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত। এর মধ্যে কৃষি মজুরের সংখ্যা ৪৫.১ শতাংশ।[২] অপারেশন বর্গায় যে সমস্ত আদিবাসী সামান্য জমি হাতে পেয়েছিল পরিকাঠামোর অভাবে সে জমির উৎপাদনে গ্রাসাচ্ছাদন হয় না। উন্নত বীজ, নিয়মিত সেচ, রাসায়নিক সার এ সবই এদের আয়ত্তের বাইরে। দেশীয় বীজকে হটিয়ে দিয়ে স্বর্ণ, রত্না প্রভৃতির বীজ, সবই বহুজাতিক সংস্থার অবদান। সরকার যথেষ্ট সেচের যোগান দিতে পারে না। এ বছরেও কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে যে বীরভূমে ম্যাসানজোর ও হিংলো থেকে বোরো চাষে কোন সেচ দেওয়া যাবে না। এ বার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কেন এই অবস্থা দাঁড়ালো তার কোন উত্তর নেই। স্বভাবতই সাঁওতালরা জমি টিকিয়ে রাখতে পারছে না। একটি পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৮১ তে ৩,৮৯,১৫৩ ক্ষেতমজুরের এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৭০ লক্ষেরও বেশি।[২] এই বিপুল সংখ্যক আদিবাসী বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর অবস্থান তাহলে কোথায়? বর্তমানে অভাবি বিক্রি ও কৃষকের আত্মহত্যা তো নিয়মিত ঘটনা। সরকার কি ইচ্ছাকৃতভাবে হিমঘর তৈরি করছেন না, যার ফলে বহুজাতিক খুচরো ব্যবসায়ী সংস্থা স্বল্পমূল্যে চাষীদের কাছ থেকে ফসল কিনে নিতে পারে? এই ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির ফলে শুধু আদিবাসী জীবনেই নয়, স্বল্পবিত্ত শ্রেণী খাদ্যের সংস্থানই করে উঠতে পারছেন না, শিক্ষা-স্বাস্থ্য তো দূরস্থান। ভবিষ্যতের জন্য এর ফলে যে অগণিত অপুষ্টিজনিত জনসংখ্যায় সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে একদিকে যেমন দেখা দেবে কায়িক শ্রমিকের অভাব, অন্যদিকে সহজেই বিস্তারলাভ করবে বিভিন্ন মহামারী। নগর কি পারবে এর থেকে আত্মরক্ষা করতে, গ্রাম শেষ হয়ে গেলে বিশ্বায়ন কি শুধু নগর নিয়ে টিকে থাকতে পারবে?

বিশ্বায়নের অন্যতম বিষময় প্রভাব ধীরে ধীরে গ্রাস করছে আবিদাসী সংস্কৃতিকেও। তারা আজ আর শুধু নিজেদের ঐতিহ্যের বাদনা, করম বা টুসুতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারছে না। আনন্দ নয়, উত্তেজনার খোরাক যোগাচ্ছে টিভি আর ভিডিও। অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে তারা কিনছে প্রয়োজন না থাকলেও সেলফোন। পিছু হটছে গ্রামীণ সংস্কৃতির ভাদু, লেটো আর কবিগান। মাঝে মাঝে বিশ্বায়নের সংস্কৃতির ছাঁচে ফেলে বিদেশে রপ্তানির জন্য একে বদলে ফেলা হচ্ছে আমূল। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ফলে মাঠে তিনটে ফসল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খেতমজুরের বাড়তি পাওনা টেনে নিচ্ছে নিত্যনূতন গজিয়ে ওঠা ভাঁটিখানা। যন্ত্রচালিত দ্বিচক্রযানে আদিবাসী চাষীর ছেলে পাল্লা দেয় প্রতিবেশীর সাথে। নগর ছাড়াই নগরায়ণের বিষাক্ত

এর পর ৭৭ পৃষ্ঠায়

বিশ্বায়ন ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিরা

শ্যামল দাস

সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী ভারতবর্ষ নয়া-উদারনীতি বা বিশ্বায়নের অংশীদার হয় ১৯৯০-এর গোড়া থেকেই। সময় যত এগিয়েছে ততোই সরকারি কর্মচারীদের ওপর তার প্রভাব হয়েছে অপরিসীম। এই প্রভাব কর্মচারীদের পক্ষে না বিপক্ষে একথা এক কথায় বলা যাবে না। এভাবে যদি কেউ ভাবেন যে বিশ্বায়নের অংশীদার হওয়ার পর সরকার যেহেতু পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে ক্রমশ হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, সুতরাং কর্ম সঙ্কোচন ঘটাচ্ছে, সুতরাং আপামর সরকারি কর্মচারী বিক্ষুব্ধ— কারণ কর্ম সংকোচনের অপর নাম কর্ম সংকোচন— এ হেন অতিসরলী-করণ যে বাস্তব নয় তা বোঝার জন্য বোধকরি খুব একটা বিশ্লেষণী ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। গত ২০ বছরে রেল/ডাক/প্রতিরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কতগুলি ধর্মঘট হয়েছে বা কর্মচারী আন্দোলনের ফলে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন সরকার কতটা বিপদে পড়েছে। কিন্তু জঙ্গলে ভূমিপুত্ররা পস্কো-নিয়মানির আন্দোলনকারীরা বা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের *সেজ*-বিরোধী আন্দোলনকারীরা সরকারকে বিশ্বায়নের পদক্ষেপগুলি কার্যকর করতে প্রতি পদে বাধার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। উল্টোদিকে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে বিশ্বায়নের নিয়মগুলি লাগু হয়েছে প্রায় বিনা বাধায়।

আসলে খাতার-কলমে বিশ্বায়ন লাগু করার অনেক আগে ১৯৮০-র মাঝামাঝি সময় থেকেই সরকার বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দপ্তরে কর্মী সংকোচনের রাস্তায় হাঁটতে থাকে। যেমন, কেন্দ্রীয় ফর্মস্ স্টোর কার্যত তুলে দেওয়া হয় ১৯৮০-র মাঝামাঝি সময়ে। পূর্ব বঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য তৈরি দণ্ডকারণ্য প্রকল্প তুলে দেওয়া হয় ও সেখানকার সব কর্মচারীকে সারপ্লাস-সেলের মাধ্যমে অন্য দপ্তরে পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮৯ সালে বিভিন্ন দপ্তরে কর্মচারীদের উদ্বৃত্ত ঘোষণা করার নিয়মাবলী সংক্রান্ত একটি অধ্যাদেশ উদ্বৃত্ত জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশটিতে উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগ করার পদ্ধতি ও নির্দিষ্ট করা হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ১৯৮০-র মাঝামাঝি থেকেই বিশ্বায়নের বা সরকারি ক্ষেত্রে কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে নয়া উদারবাদী অর্থনীতিকে লাগু করার জন্য উপযুক্ত করার জন্য উপযুক্ত নীতিমালা/আইনকানুন প্রণয়নে মনোনিবেশ করে। ভারতবর্ষে সরকারি ক্ষেত্রে কর্মচারী আন্দোলনের দীর্ঘ ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও এজাতীয় সরকারি পদক্ষেপগুলির গভীরতা বুঝতে কর্মচারী সংগঠনগুলির নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়। বা বুঝলেও কোন কার্যকরি পদক্ষেপ নেয়নি সংগঠনগুলির নেতৃত্ব। অন্যদিকে সমস্ত স্তরের সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়নি এই সময়পর্বে। অন্যদিকে ১৯৫০, '৬০ ও '৭০-এর দশক জুড়ে কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা— বিশেষত রেল/ডাক ও তার/প্রতিরক্ষা উৎপাদনের কর্মচারীরা একের পর এক ঐতিহাসিক আন্দোলনে সামিল হয়েছেন ও সরকারকে সমস্যায় ফেলেছেন। এই আন্দোলনগুলিতে নেতৃত্ব দিয়েছিল বামপন্থীরা ও সমাজবাদীরা।

১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকেই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের উপর কয়েক দফায় স্থগিতাদেশ কার্যকর (ban on recruitment) করে কেন্দ্রীয় সরকার। এই সমসয় থেকেই বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দপ্তরে পদ সৃষ্টি করার অধিকার কেন্দ্রীভূত করা হয় অর্থমন্ত্রকের হাতে। অর্থাৎ ১৯৯০-এর গোড়া থেকেই দপ্তরের প্রয়োজনে কার্যকরী নিয়মাবলী মেনে একটি চতুর্থ শ্রেণীর পদ সৃষ্টি করার জন্যও অর্থমন্ত্রকের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা বাড়তে থাকে। আর প্রয়োজনের তাগিদে ঠিকা বা ক্যাজুয়াল নিয়োগ যাতে চালু থাকে, বিশেষত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। যদিও পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের ফলে (১৯৯২ সালে) কয়েক হাজার ক্যাজুয়াল কর্মী স্থায়ী কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হন। যদিও পরবর্তীকালে আবার সুপ্রিম কোর্ট অন্য একটি রায়ে ক্যাজুয়াল নিয়োগকে আইনি স্বীকৃতি বাতিল করে দেয়। সম্ভবত বিশ্বায়নের অর্থনীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই পূর্ববর্তী রায়ের সম্পূর্ণ উল্টো এই রায় দেন। অন্যদিকে সরাসরি ঠিকা বা ক্যাজুয়াল কর্মী নিয়োগ না করে কর্মী সরবরাহের প্রতিষ্ঠানের মারফৎ ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ চলতে থাকে দপ্তরগুলিতে। অবসরপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা কর্মীরা সরকারি দপ্তরগুলিতে সিকিউরিটি গার্ড-এর স্থায়ী চাকরি পেতেন। তাঁদের জন্যই এই পদগুলি নির্দিষ্ট ছিল। এখন তার জায়গা নিয়েছে সিকিউরিটি এজেন্সি। আর এই এজেন্সিগুলিতে কাজ করছেন অবসরপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা কর্মীরা বা আধা-সামরিক বাহিনীর কর্মীরা। অধিকাংশ সরকারি দপ্তরে আর ড্রাইভার নিয়োগ হয় না। সরকারি গাড়ির জায়গা নিয়েছে ভাড়ার গাড়ি। আর এর ফলে এ বাবদ সরকারি ব্যয় যে বেড়েছে পরিসংখ্যানের সাহায্যে এটাও প্রমাণ করা যায়। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি।

আগেই বলা হয়েছে বিশ্বায়নের নীতি গ্রহণ করার ফলে সরকার বিভিন্ন পরিসেবা ক্ষেত্র থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। যার

সবচেয়ে কার্যকর উদাহরণ হতে পারে টেলিকম ক্ষেত্র। ১৯৯৭ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত টেলিকম ক্ষেত্রের দ্রুততম বৃদ্ধি হয়। বাড়িতে টেলিফোন কানেকশনের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হয় এই পর্বে। আবেদন করলেই ৭ দিনের মধ্যে বাড়িতে টেলি-সংযোগ দেবার ব্যবস্থা হয়। ১৯৯৯ টেলিকম ক্ষেত্রে বেসরকারি টেলিকম কোম্পানিগুলির প্রবেশ আইনসিদ্ধ হয়। তারপর যত সময় এগিয়েছে এই ক্ষেত্রে বেসরসকারি ক্ষেত্রের সংখ্যা বেড়েছে দ্রুত হারে। গ্রাম-শহরের মানুষের দিনযাপনের সঙ্গী হয়ে গেছে মোবাইল ফোন। ২০০১-এর তৈরি হয় বিএসএনএল। পূর্বতন টেলিকম দপ্তরকে একটি সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় পরিবর্তন করা হয়। এর আগে ১৯৯০-৯১ দিল্লী ও মুম্বাইকে আনা হয় এমটিএনএল-এর আওতায়। এমটিএমএল-এর ৫১ শতাংশ শেয়ার থাকে সরকারের হাতে। বাকিটা বাজারে বিক্রি করা হয়।

নতুন শতাব্দীর নামকরণ করা হয় তথ্য আদানপ্রদানের যুগ বা শতাব্দী। আর এই নামকরণ করে বিশ্বায়নপন্থীরা। নামী-অনামী ব্যক্তি পুঁজি ঝাঁপিয়ে পড়ে এই ক্ষেত্রটিতে। টাটা থেকে আম্বানি— সবাই বিনিয়োগ করে এই ক্ষেত্রটিতে। সরকারি লাভজনক সংস্থা সিএমসি (Computer Maintenance Corporation) কিনে নেয় টাটা গোষ্ঠী। বিএসএনএল (Videsh Sancher Nigam Ltd.) কিনে নেয় টাটা গোষ্ঠী। কিন্তু ব্যয়বহুল ফিক্সড লাইন টেলিফোন (Fixed line telephone) বা broad-band network-এর ব্যবসায় বিএসএনএল ছাড়া কেউ বিনিয়োগ করেনি। বর্তমানে বিচারাধীন বন্দী প্রাক্তন টেলিকম মন্ত্রী এ. রাজা ২০০৭ সালে বিএসএনএল আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ৩০,০০০ কোটি টাকা সরঞ্জাম কেনার অনুমোদন আটকে দেন। ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয় আধুনিকীকরণ। অথচ প্রতিযোগিতায় নামতে হয় আধুনিকতম টেকনোজলি ব্যবহারকারি দেশি-বিদেশি সংস্থাগুলির সাথে। যার ফলে মোবাইল সংযোগের ক্ষেত্রে বিএসএনএল-এর স্থান বর্তমানে পঞ্চম। আগে তার স্থান ছিল তৃতীয়। এখন এয়ারটেল, ভোডাফোন, রিলায়েন্স ও টাটার পরে তার স্থান। মোবাইল, ব্রডব্যান্ড ও টেলিফোন ব্যবসা থেকে বিএসএনএল-এর আয় ক্রমশ কমেছে।

২০০৬-০৭ আর্থিক বছরে আয়	৩৯,৭১৫ কোটি টাকা
২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে আয়	৩৮,০৫৩ কোটি টাকা
২০০৮-০৯ আর্থিক বছরে আয়	৩৫,৮১২ কোটি টাকা
২০০৯-১০ আর্থিক বছরে আয়	৩২,০৪৬ কোটি টাকা
২০১০-১১ আর্থিক বছরে আয়	৩১,৭০৮ কোটি টাকা
২০১২-১৩-তে প্রত্যাশিত ক্ষতি	৬২৩ কোটি টাকা

ফিক্সড লাইনে ২০০৪-০৫ আয় ছিল ২২,৮১৪ কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ তা কমে হয়েছে ১১,৫০৫ কোটি টাকা।

আর এই পরিস্থিতিতে হাতিয়ার করে বিএসএনএল-এ আনা হয়েছে লোভনীয় স্বেচ্ছা-অবসর প্রকল্প। লক্ষ ২ লক্ষ ৮০ হাজার কর্মীর পরিবর্তে প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত মোট কর্মচারীর সংখ্যা ১ লক্ষ নামানো। ৪৫ বছরের বেশি যাদের বয়স তারাই স্বেচ্ছা অবসরের আওতায় আসবেন। বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে ১১,২৭৬ কোটি টাকা চেয়েছে স্বেচ্ছাবসরের জন্য। কর্তৃপক্ষের মতে স্বেচ্ছাবসরের ফলে নাকি বিএসএনএল ৩৩,৬৫০ কোটি টাকা বাঁচাতে পারবে আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত। শোনা যাচ্ছে এমটিএন-ও একই রাস্তায় হাটছে। টেলিকম মন্ত্রকের বা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া বিএসএনএল বা এমটিএনএল এই রাস্তায় হাঁটছে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বহু আকাচিখত 'দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কারের' শুরু হবে হয়ত এই দুটি দপ্তর দিয়েই।

একই অবস্থা আকাশবাণী দূরদর্শনের। ১৯৮০ দশকের মধ্যভাগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আমলে দেশের দূরতম প্রান্তগুলিতে আকাশবাণী-দূরদর্শন কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলা হয়। গড়ে তোলা হয় ছোট এফএম রেডিও স্টেশন। আর দূরদর্শনের ক্ষেত্রে গড়ে তোলা হয় নিম্নক্ষমতা-সম্পন্ন ট্রান্স-মিটার। ভারত সরকার এই দ্রুত বৃদ্ধির নাম দেয় 'ফ্ল্যাশ প্ল্যান'। দূরদর্শনকে সেই সময় ব্যঙ্গ করে বলা হত 'রাজীব দর্শন'। সরকারি বক্তব্যের প্রচার যন্ত্র হিসাবে আকাশবাণী-দূরদর্শনের জনপ্রিয়তা পড়তে শুরু করে ১৯৯০ দশকের গোড়া থেকেই।

শুরু হয় কেবল্ টিভির রমরমা। ১৯৯০-এর গোড়ায় যেখানে এনডিটিডি দূরদর্শনের ৩০ মিনিটের সংবাদ ক্যাপসুল বা চাংক দিত এখন তারাই কমপক্ষে তিনটি চ্যানেলের মালিক। রাজ্য ও জাতীয় স্তরে কেবল্ টিভির চ্যানেলের সংখ্যা অগুনতি। আকাশবাণী-দূরদর্শনের সম্পসারণ-জাল বৃহত্তম হওয়া সত্ত্বেও শহর আধা শহরের মানুষ/শ্রোতা/দর্শক অনেক বেশি নির্ভরশীল (সংবাদ ও বিনোদনের জন্য) কেবল টিভি ও ব্যক্তিমালকানাধীন এফ-এম চ্যানেলগুলির ওপর। মূলকথা হচ্ছে পরিষেবা থেকে কোন সরকারি দপ্তরের একাধিপত্য বা একচেটিয়া প্রভাব চলে গেলে ছাপ পড়তে বাধ্য দপ্তরের কর্মচারীদের ওপর। আজ আকাশবাণী-দূরদর্শন চরম কর্মীসংকটে ভুগছে। শহরের মূল কেন্দ্রগুলি ছাড়া বহু কেন্দ্রই প্রয়োজনীয় কর্মীসংখ্যার অর্ধেকের কম কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন। ক্যামেরাম্যান ছাড়া চলছে দূরদর্শন কেন্দ্র। ফলে জনমানসে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। দপ্তরের গুরুত্ব তলানিতে ঠেকেছে। বিমান পরিবহনে ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থাগুলি আসার পর ট্যারিফ যুদ্ধে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স। সরকারি অনুগ্রহ-অনুদান ছাড়া তার অন্য কোন রাস্তা নেই। উপভোক্তাদের সামনে যদি পছন্দ করার মতো

অনেক সামগ্রী থাকে তবে তারা সবচেয়ে ভালো জিনিসটিই পছন্দ করবেন। আর তা যদি সরকারি পণ্যের থেকে কম দামে হয় তা হলে তো কথাই নেই।

সরকারের পক্ষে সরকারি কোন সরকারি সম্পতি বেচে বা হস্তান্তর সম্ভব নয়। অনেক আইনি বিধিনিষেধ আছে। বিশেষত আছে যে দপ্তরটি হস্তান্তর হবে তার কর্মচারীরা। এই সমস্যাটি মোকাবেলা করার জন্য সরকার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০০-এ একটি অধ্যাদেশ জারি করে। সরকারি কেতাবে তা রুল-৩৭এ নামে পরিচিত। এটি পেনশন আইনের অন্তর্ভুক্ত। এই রুলে ২৬টি ধারা আছে। এতে বলা আছে যে কোন সরকারি দপ্তর যদি সরকারি আইন বলে কেন্দ্রীয় অধিগৃহীত সংস্থা (PSU) বা কেন্দ্রীয় স্বশাসিত সংস্থা পরিবর্তিত হয় তবে সেই দপ্তরের সাধারণ কর্মচারীরা ওই অধিগৃহীত বা স্বশাসিত সংস্থায় যেতে কার্যত বাধ্য। এই পরিবর্তনের পর সেই কর্মচারীর পেনশনের দায়িত্ব আর সরকারের থাকবে না। যতদিন সেই কর্মচারী সরাসরি সরকারি কর্মচারী ছিলেন সেই পর্যন্ত পেনশনের দায়িত্ব বর্তাবে সংস্থাটিতে গঠিত ট্রাস্টের উপর। আর ট্রাস্টের সঙ্গে মিস্ যুক্ত হলেই হয় মিসট্রাস্ট! বর্তমান সময়ে যার প্রমাণ পেতে কোন অসুবিধা নেই। এমনকি এই রুলের ২৫ ধারায় বলা আছে যে এই ধরনের পিএসইউ বা স্বশাসিত সংস্থার ৫১ শতাংশ বিনিবেশ (disinvest) করা যাবে। পেনশন আইন-২০০৪ নিয়ে যত হইচই হয়েছে পেনশন রুল ৩৭এ নিয়ে কোন হেলদোলই ঘটেনি। কর্মচারী আন্দোলনের বিষয় হয়ে ওঠেনি রুল ৩৭এ।

মোদ্দা কথা। সরকার কোন দপ্তর বা পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে হাত গুটিয়ে নিতে চাইলে প্রথমে সেই দপ্তরটিকে পরিবর্তিত করা হবে পিএসইউ বা স্বশাসিত সংস্থায় কর্মচারী-সহ, তারপর তাকে নিলামে তোলা হবে বিক্রির জন্য। সরকারি পরিভাষায় যার নাম বিনিবেশ। এমটিএমএল বা বিএসএনএল-এর ক্ষেত্রে এই রাস্তাই নেওয়া হয়েছে। আকাশবাণী-দূরদর্শনের ভবিষ্যৎ প্রায় একই রকম হতে চলেছে। সামরিক বাহিনী থেকে আধা-সামরিক বাহিনী, রেল, ডাক-সহ অধিকাংশ দপ্তরে স্বীকৃত কর্মীর সংখ্যা (sanctioned strenth) ও কর্মরত কর্মী সংখ্যার (in position) মধ্যে ফারাক চোখে পড়ার মতো। প্রাত্যহিক সংবাদপত্রে এ সংক্রান্ত বহু খবর প্রকাশিত হয়। রেলে চালকদের বা রানিং স্টাফদের একনাগাড়ে কাজ করতে হচ্ছে, প্রয়োজনীয় বিশ্রাম মেলে না। অনেক ক্ষেত্রেই এটা করা হচ্ছে সুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। অনেক চালকই রানিং অ্যালাউন্স / মাইলেজ অ্যালাউন্স পাচ্ছেন কয়েক হাজার টাকা। আর এটা ঘটছে শূন্য পদে লোক না নেওয়ার ফলে। বিশেষত ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকর হওয়ার ফলে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বেড়েছে আগের বেতন কমিশনগুলির তুলনায় অনেক বেশি। চাকরিতে ঢোকার সময় একজন তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর ন্যূনতম বেতন হবে ১৪ হাজার টাকার বেশি। প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন বেড়েছে আরও বেশি। সরকারি দপ্তরে কর্মরত ৫০ হাজার বা তার বেশি বেতনের কর্মচারী আছেন ভালো সংখ্যায়। বেতনের এই বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে ১৯৮০-র দশক থেকে শুরু হওয়া কর্মী সংকোচনের ফলে। অর্থাৎ সোজা কথায় লোক কমিয়ে মাইনে বাড়ানো হয়েছে। চালু করা হয়েছে ঠিকা প্রথা। শুধুমাত্র চতুর্থ শ্রেণীতেই নয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগ ঘটছে বহু ক্ষেত্রেই। আর্থিক দাবির জন্য সরকারি কর্মীদের লড়াই করতে হয় না। বছরে দু বার মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধির নিয়ম চালু হয়েছে গত ২০ বছরের বেশি। সুতরাং ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়লে তাঁদের হেলদোল হয় না। নিয়ম মেনে মহার্ঘ্যভাতা বাড়ে। আপামর শ্রমজীবী জনগণ থেকে তাঁরা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হন। নব্য উদারবাদী নীতির ফলে সৃষ্ট ভারতের ১০-১২ কোটি সুখী মানুষের সারিতে তাঁরাও আজ অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের জায়গা অবশ্য ঐ সারির শেষের দিকে।

কর্মচারী আন্দোলনের বাম-ডান সব নেতৃত্বই সরকারি কাঠামোর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছেন। কর্মচারীরাও জানেন, কালের নিয়মে বছরের দুবার মহার্ঘ্য ভাতা বাড়বে। কাজের পরিবেশকে সুরক্ষিত করা, সরকারকে অন্যতম নিয়োগকারী হিসাবে শূন্য পদে কর্মী নিয়োগ করার জন্য আন্দোলন করা— এসব আজ আর পোস্টারেরও বিষয় নয়। কর্মচারী আন্দোলনের প্রাঙ্গণ থেকে এসব বিষয় বিদায় নিয়েছে। সরকারি কর্মচারীরা আজ নিজেদের ভারতের শ্রমজীবী জনতার অংশ মনে করেন না, শ্রমজীবী জনতাও সরকারি কর্মচারীদের নিজেদের সারির মানুষ মনে করেন না। এই কারণেই পথে-ঘাটে শোনা যায়, 'শালাদের আবার মাইনে বাড়ছে'।

আর এই অবস্থায় দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার দ্বিতীয় প্রজন্মের আর্থিক সংস্কার শুরু করার কথা বার বার ঘোষণা করছেন। দেশীয় একচেটিয়া থেকে শুরু করে বহুজাতিক রাঘব বোয়ালরা ক্রমাগত চাপ বাড়াচ্ছে দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার শুরু করার জন্য। ফলে কর্মচারী আন্দোলনে অনভ্যস্ত, আরামপ্রিয়, নিশ্চিত জীবনযাপনকারী সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে এই আক্রমণ প্রতিহত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাঁদের নিজস্ব সারি অর্থাৎ ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন এই বর্গটি হয়তো দেখবেন তাঁদের পেছনে সত্যিই পতন রোধ করার মতো দেওয়ালও নেই। সার্বিক অর্থনীতিবাদের বোধহয় এটাই পরিণতি।

ভারতে বিশ্বায়নের দুটি দশক

রক্তলাঞ্ছিত সময়ের ক্রমপঞ্জী

সমরেশ মিত্র

১৯৯১-এ ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শ্রী পিভি নরসিমা রাও, ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর সঙ্গে একযোগে ভারতের 'নয়া আর্থিক নীতি' গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। মনমোহন তখন লোকসভায় নির্বাচিত হন নি— তিনি তৎকালীন কংগ্রেস দলের বিশেষ আমন্ত্রণে সরকারি আমলার পদে ইস্তফা দিয়ে ভারতের 'বেহাল অর্থনীতি'-র মোড় ফেরানোর 'গুরু দায়িত্ব' 'কাঁধে তুলে নেওয়ার' প্রতিশ্রুতি দেন। যে 'নয়া আর্থিক নীতি'-র ঘোষণা শোনা গেলো তার মূল কথা ছিলো 'উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ, বিলগ্নিকরণ'। এই তিনটি বিষয় এবং এর সঙ্গে স্থায়ী কর্মী সংকোচন করে 'অস্থায়ীকরণ' করার পদ্ধতিকে আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার বা আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাঙ্ক নাম দেয় 'কাঠামোগত আর্থিক পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া' বা স্ট্রাকচারাল রি-অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম।

যে 'নীতির' কথা বলে এই কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস চালু হলো তার মূল কথা ছিলো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাজারে যোগ্যতর প্রতিযোগীর টিকে থাকা, ভরতুকি দিয়ে অসফল ব্যবসায়িক সংস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার সামাজিক মূল্যের অপচয় রোধ। যে 'উদারীকরণের' কথা বলে এই 'পুনর্বিন্যাস' শুরু হলো তা প্রথম থেকেই পণ্য উৎপাদন, পণ্য বিপণন, শুল্ক-র হার, ব্যবসায়ের শর্তাবলী— অর্থাৎ যে সমস্ত কিছু দিয়ে স্বচ্ছ ও মুক্ত বাণিজ্য নির্ধারিত হওয়ার কথা, তার সমস্ত কিছুই ক্রমে ক্রমে বেসরকারিকরণ ও একচেটিয়াকরণের উদ্যোগই হলো এই 'উদারীকরণ'-এর একমাত্র ঝোঁক। যে প্রাথমিক প্রতারণা থেকে পুরো প্রকল্পটির এক সময় 'শুভ উদ্বাধন' সম্পন্ন হলো, তা শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশে এক রক্ত-লাঞ্ছিত অস্থির সময়ের জন্ম দিলো। হিংসা-মৃত্যু-দাঙ্গা-রিংরসা কণ্টকিত যে 'স্বপ্নের দুনিয়া' পশ্চিমী দেশগুলোর মোহমুগ্ধ অনুকরণকারী দেশি শাসকবৃন্দ (অক্সফোর্ড-শিক্ষিত, এনআরআই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এর মালিক) আমাদের দেশে এই সমস্ত বিষয় আমদানি করলেন, তাঁরা সবাই মেট্রোপলিটন ইন্ডিয়ার বাসিন্দা, গ্রাম-ভারতের নিষ্প্রদীপ, নিষ্প্রভ দিন যাপনের গ্লানি বহন করে ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে থাকা লাখো জনতার জগতের থেকে বহু দূরের মানুষ। 'পুনর্বিন্যাস'-এর যে জগন্নাথের রথ তাঁরা গ্রাম-ভারতের কর্দমাক্ত, ভাঙ্গাচোরা রাস্তায় চালানোর সারথির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, আজ দেখা যাক সেই রথ দু দশক ধরে চলার পর ভারতের আম-জনতার ওপর তা কী প্রভাব রেখে গেলো! তথ্য বলছে যে ভারতের সামাজিক চালচিত্রই আবার সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের তীব্র হিংসা আর লাগামহীন শোষণের যুগে ফিরে গেছে— ইতিহাসের ট্র্যাজেডিরূপে!

গোড়ার কথা

মার্কস এক সময় বলেছিলেন যে শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে শ্রমিকশ্রেণী সেই শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আন্তর্জাতিক হয়ে উঠবে— সমস্ত দেশের শোষিত শ্রমিকরা একজোট হয়ে নিজ নিজ দেশের শোষকদের ক্ষমতাচ্যুত করে আন্তর্জাতিক এক সমাজ নির্মাণ করবে— শোষণহীনতার বিশ্বায়ন ঘটবে।

শ্রমিক শোষণকে ভিত্তি করে সাম্রাজ্যতন্ত্রের যে অর্থব্যবস্থা, সেই অর্থব্যবস্থায় আর্থিক সংকট নিত্যসঙ্গী। প্রতি মুহূর্তে পুঁজির জোগান অব্যাহত না রাখতে পারলে রথের চাকা থমকে যাবে। তাই তাদের প্রয়োজন ক্রমাগত মুনাফার হার বাড়িয়ে বাড়তি পুঁজি সংগ্রহ। কিন্তু মুনাফার হার কমে আসাই এই অর্থব্যবস্থার অন্তর্নিহিত গতি— তাই মুনাফার হার পড়ে যাওয়াকে তাদের ধরে রাখতে হয় বাণিজ্যের নতুন নতুন ক্ষেত্রের সন্ধান করে। চলতি পণ্য বিপণনের বাজারের প্রসারণ চাই, চাই নতুন নতুন পণ্যের জন্য নতুন নতুন বাজার— এক কথায় বাণিজ্যের বিশ্বায়ণ। শ্রমের বিশ্বায়ণকে প্রতিহত করার জন্য পুঁজির বিশ্ব-আগ্রাসন বা বর্তমানের বিশ্বায়ন।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন সাম্রাজতন্ত্রের অবদান— তাই এই পদ্ধতির সামান্য ইতিহাস চর্চা না করলে ভারতে এই বিশ্বায়ণের কু-প্রভাব সম্যকভাবে উপলব্ধি করো যাবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের বনেদি সাম্রাজ্যতন্ত্রের দেশগুলো প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে, তারা তাদের প্রাক্তন উপনিবেশগুলোর ওপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ হারায়। মার্কিন দেশ ঐ যুদ্ধে সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার দেশে পুনর্গঠনের জন্য আর্থিক লগ্নি করতে হয়নি। এই অবস্থায় মার্কিন আর্থিক সহায়তায় ইউরোপের দেশগুলো পুনর্গঠিত হলে তারা আবার তাদের পুরনো উপনিবেশগুলোর সঙ্গে আগের অন্যায্য শর্তে বাণিজ্যের অধিকার এবং নতুন বাজারে ব্যবসার অধিকার ফিরে পেতে বাণিজ্য ও শুল্ক সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সমঝোতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তৈরি হয় শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ সমঝোতা-য় পৌঁছানোর জন্য আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া, যা এই সমঝোতার আদ্যক্ষরগুলো নিয়ে গ্যাট (GATT) নামে এখন ঘরে ঘরে পরিচিতি লাভ করছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ভারত খুবই উৎসাহ ভরে এই গ্যাট -এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম বনে যায়।

ইউরোপ পুনর্গঠনের লগ্নির টাকা দেখা গেলো আশানুরূপ মুনাফায় পর্যবসিত হচ্ছে না। তাই মুনাফার হার বাড়ানোর জন্য শিল্প-পণ্য উৎপাদনের দেশগুলো (ইউরোপের) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের নিজ নিজ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা কমানো এবং অধীনস্থ বাজারে একাধিপত্য বজায় রাখার জন্য, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা আদায়ের জন্য সারা বিশ্বে একই রকমের শুল্ক, বাণিজ্যের নিয়ম চালু করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নিয়মবিধি চালু করতে চায়। মার্কিন দেশ আরও এগিয়ে গিয়ে ভাবে সে তার দেশে তার বেসরকারি বাণিজ্যিক সংস্থার জন্য চালু আইন যেন সারা বিশ্বে, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের বৃহৎ বাজার-সম্পন্ন দেশগুলোতে চালু হয়।

এইসময় ইউরোপের দেশগুলো মুনাফার ক্ষেত্র বাড়ানোর জন্য কৃষিকে বাণিজ্যের আওতায় আনার জন্য প্রস্তাব দেয়। গ্যাট-এর এক দফা বৈঠক বসে ১৯৫৫ সালে সেখানে মার্কিন দেশ কৃষিকে গ্যাট-এর আওতায় আনার বিপক্ষে সওয়াল করে বলে যে এর ফলে মার্কিন দেশের খাদ্য-নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, তাদের খাদ্য-আমদানি-নির্ভরতা বাড়বে। এটা তাদের দেশের অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকারক, সামাজিক দিক থেকে অস্থিরতার সৃষ্টি হবে। ইতিহাসের ট্রাজেডি হলো, এই ঘটনার ঠিক তিনটি দশক পর মার্কিন দেশই গ্যাট-এ কৃষিকে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব আনে এবং ভারত-সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো খাদ্য-নিরাপত্তা এবং আমদানি-নির্ভরতার প্রশ্নটি আলোচনায় উত্থাপন করলে মার্কিন দেশ তখন উল্টো সওয়াল করে বলে যে অন্তত তৃতীয় বিশ্বে এই দুটি বিষয় কোনও সমস্যার সৃষ্টি করবে না। ঘটনা হলো যে গ্যাট চুক্তির পর সারা পৃথিবীর গরীব দেশগুলো নীট খাদ্য আমদানি-কারক দেশে পরিণত হয়েছে, তাদের দেশে খাদ্য-নিরাপত্তা বলে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

গ্যাট-চুক্তি ও বিশ্বায়নের আবাহন

বাণিজ্য ও শুল্ক সংক্রান্ত সাধারণ সমঝোতার জন্য এবং কৃষিকে সেই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ১৯৮৬ সালে উরুগুয়েতে আলোচনা শুরু হয়, যা গ্যাট-চুক্তি সংক্রান্ত অর্থনীতির ইতিহাসে উরুগুয়ে দফা হিসেবে খ্যাত। এই উরুগুয়ে দফা বিধির রূপ পাওয়ার ফলেই 'বিশ্বায়ন' শব্দটি আটপৌরে আলোচনার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এই আলোচনাতে মার্কিন দেশ প্রস্তাব দেয় যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ (অবশ্যই মার্কিন দেশ ছাড়া!) কৃষিতে ভর্তুকি তুলে দিক, কেননা তৃতীয় বিশ্বে নাকি চাষিদের এত বেশি ভর্তুকি দেওয়া হয় যে তার ফলে তৃতীয় বিশ্বের (ভারত-সহ) দেশগুলোর খাদ্য-সহ নানান কৃষিপণ্য পৃথিবীর বাজারে সস্তায় বিক্রি করা সম্ভব হয় এবং এর ফলে মার্কিন দেশও খাদ্য ব্যবসায়ে যুক্ত পৃথিবীর নানান বহুজাতিক বেসরকারি কোম্পানি গুলোর বিপুল ক্ষতি হচ্ছে। অতএব 'প্রতিযোগিতা' এবং 'মুক্ত বাণিজ্য'-র নিয়ম মেনে তৃতীয় বিশ্ব-সহ অন্যান্য দেশ এই 'অর্থনৈতিক অনাচার' অবিলম্বে বন্ধ করুক।

ফ্রান্স এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলো এই মার্কিন সুপারিশ মেনে নেয়নি, ফলে আলোচনায় অচলাবস্থা দেখা দেয়। গ্যাট-এর তৎকালীন ডিরেক্টর আর্থার ডুঙ্কেল শেষ পর্যন্ত দু'পক্ষের কিছু কিছু যুক্তি জড়ো করে একটি প্রস্তাব খাড়া করেন, যা ডুঙ্কেল প্রস্তাব হিসেবে খ্যাত হয়। এই প্রস্তাবের মূল বিষয় ছিল যে, আলোচনারত সমস্ত দেশকে এই প্রস্তাব হয় পুরোপুরি মানতে হবে নয় তা একেবারে বাতিল করতে হবে। আলোচনার সময় কোনো সংশোধনী আনা চলবে না। বলাই বাহুল্য যে ঐ প্রস্তাবের মূল অংশে বলা ছিল যে, যদি এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তবে সেই প্রস্তাবের সুপারিশ অন্য সমস্ত দেশগুলোর জন্য মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও মার্কিন দেশ চাইলে তা মানতেও পারে; নাও মানতে পারে— এই মানা-না-মানার স্বাধীনতা একমাত্র মার্কিন দেশই ভোগ করবে, অন্য কোনও দেশ নয়!

অনেক টালবাহানার পর ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে গ্যাট আলোচনার সদস্যভুক্ত দেশগুলো (ভারত-সহ) এই ডুঙ্কেল প্রস্তাব মেনে নেয়, উরুগুয়ে দফার আলোচনার সমাপ্তি ঘটে। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে মরক্কোর ম্যারাকেশ-এ সরকারিভাবে গ্যাট গুটিয়ে নিয়ে তার পরিবর্তে শুল্ক, বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি এই সংক্রান্ত বিরোধ ও নিষ্পত্তির বিষয়টি দেখভাল করার জন্য বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লুটিও গঠিত হয়, যা ১৯৯৫ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে সারা পৃথিবীর ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে ওঠে— আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বায়নের অভ্যুদয় ঘটে!

বিশ্বায়নের সাধারণ ফল নিয়ে দু'চার কথা বলে আমরা ভারতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া কীভাবে শুরু হলো এবং তার ফল কী দাঁড়ালো সেই আলোচনাতে চলে যাবো।

গ্যাট চুক্তি (বা 'ডুঙ্কেল প্রস্তাব', কেননা যখন এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তখন ডুঙ্কেল সাহেব অবসর গ্রহণ করেছিলেন) আসলে তৃতীয় বিশ্ব থেকে মূলত মার্কিন দেশে পুঁজি চালানের বিষয়টিকে আইনি মান্যতা দেয়। অন্যান্য সম্পদ (যেমন কাঁচামাল, মানবসম্পদ ইত্যাদি) চালানের বিষয়টি আমরা সময়মতো উল্লেখ করবো। উরুগুয়ে দফার যে অংশগুলিতে সহমত ছিল (কৃষিতে ভর্তুকির প্রশ্নটি ছাড়া) সেই অংশগুলি ১৯৯০ সালের গোড়া থেকেই অল্প অল্প করে চালু হতে শুরু করে। ১৯৯১ সালে এসে দেখা যায় যে, প্রথম বিশ্ব, তৃতীয় বিশ্ব থেকে ৫০ হাজার কোটি ডলার স্রেফ ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। এটা সম্ভব হয়েছে গ্যাট চুক্তির বৈষম্যমূলক বাণিজ্য ও শুল্কনীতির কারণে। একটা ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক। মার্কিন বা ইউরোপের বেশ কিছু বহুজাতিক সংস্থা রয়েছে যারা সবাই

মিলে সারা পৃথিবীর চা এবং কফি রপ্তানি ব্যবসার প্রায় ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু এইসব সংস্থার কেউই চা বা কফি নিজেদের দেশে উৎপাদন করে না। উৎপাদনটা করে পৃথিবীর হাতে গোনা তৃতীয় বিশ্বের কয়েকটি দেশ। কিন্তু বাণিজ্যের সিংহভাগ এই অতিকায় কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে চা-কফির ব্যবসায় যত মূল্য সৃষ্টি হয়, তার ৮০ শতাংশ হাতিয়ে নেয় এই কয়েকটি মুষ্টিমেয় রপ্তানিকারক সংস্থা, আর তৃতীয় বিশ্বের উৎপাদনকারী দেশগুলো ২০ শতাংশ মূল্য নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে বাধ্য হয়। মার্কিন দেশ কৃষিকে গ্যাট-এর আওতায় আনতে কেন উৎসাহী হয়ে পড়লো তার একটি সহজ ব্যাখ্যা এখানে হাজির করা যেতে পারে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৮৫— এই তিন দশকে মার্কিন দেশ জৈব-প্রযুক্তিকে ব্যবসার কাজে লাগানোর বিষয়ে অনেক টাকা লগ্নী করে। এর ফলে মার্কিন দেশের অনেক বহুজাতিক বেসরকারি সংস্থার কাছে বিস্তর জৈব-প্রযুক্তিজাত কৃষি পণ্য জমে যায়। তারা চাইছিলো এই উচ্চলগ্নির ব্যবসার পণ্যের জন্য উচ্চহারে দ্রুত মুনাফা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, মার্কিন দেশের বহুজাতিক সংস্থা, ইউনিলিভার আখ থেকে লভ্য স্বাভাবিক চিনির পরিবর্ত হিসেবে জৈব-প্রযুক্তিজাত একটি কৃত্রিম রাসায়নিক তৈরি করে যার স্বাদ চিনির থেকেও মিষ্টি। মার্কিন দেশ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সংস্থাটিকে এই রাসায়নিক দ্রব্যটির একচেটিয়া বিপনন, উৎপাদন ও বাণিজ্যের অধিকার দেয় পেটেন্ট-এর মাধ্যমে। এদিকে আখ-উৎপাদনকারী দেশগুলোর উৎপাদিত চিনির দাম এই রাসায়নিকের চেয়ে সস্তা পড়ে। তাই কৃষিতে ভর্তুকি তুলে দিয়ে এবং নানান শর্ত আরোপ করে তৃতীয় বিশ্বের আখ উৎপাদনকারী দেশগুলোর চিনির দাম বাড়ানো সম্ভব হলে ইউনিলিভারের পণ্যটি হু হু করে বাজারে বিকোনোর পথটি সুগম করা যেতে পারে। এতে তৃতীয় বিশ্বের আখচাষীদের সর্বনাশ হলেও বহুজাতিক সংস্থার মুনাফার হার তো বৃদ্ধি পেলো! এক্ষেত্রে আমাদের সেই ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের ম্যানচেস্টারের রদ্দি বস্ত্র ভারতের বাজারে চালান করার কাহিনী মনে পড়বে। বিলাতি বস্ত্র রপ্তানিকারকরা ভারতে আমদানির জন্য ভর্তুকি পেয়ে তাদের পণ্যের দাম সস্তা রাখতো আর অতি উৎকৃষ্ট ভারতের বস্ত্রের ওপর ৩৫১ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে তা দেশি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে দুর্মূল্য করে তোলা হয়েছিল।

বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া : ভারতে

ইন্দিরা গান্ধী যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী তখন থেকেই ভারতে বিদেশী সংস্থাগুলো বাণিজ্যের বিষয়ে অন্যায্য এবং একচেটিয়া সুবিধা পেয়ে থাকে। ১৯৬৬ সালে প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর ইন্দিরা গান্ধী একবার টাকার অবমূল্যায়ন করেন এবং ঋণ করে ঘি খাওয়ার ন্যক্করজনক প্রবণতার জন্ম দেন। ১৯৭৩ সাল নাগাদ আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের অস্বাভাবিক হারে বেড়ে পূর্ববর্তী মূল্যের দু'গুণ হয়ে যায়— কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি হয়নি বরং খানিকটা উদ্বৃত্ত ছিল। ১৯৭৫-৭৬ এই সময়সীমায় দেখা যায় যে ভারতের আর্থিক ঘাটতি জিডিপি-র শতাংশ হিসেবে প্রায় ৪ শতাংশ ছুঁয়েছে।

অর্থের বড় ধরনের ঘাটতি শুরু হয় যখন ইন্দিরা গান্ধী দ্বিতীয়বার দিল্লির মসনদে আসীন হন। মার্কিন দেশ প্রথমবারের জন্য ইরাক আক্রমণ করলে বিশ্বের বাজারে আবার তেলের দাম বাড়ে, ফলে ভারতকে তেল আমদানির জন্য অনেক বেশি টাকা খরচ করতে হয়। ভারতের সঞ্চিত অর্থের ভাঁড়াড়ে টান পড়াতে, যে সমস্ত দেশ ইন্দিরা সরকারকে দরাজ হাতে নানান শর্তে ঋণ দিত, ভারতের সঞ্চিত অর্থ কমাতে ঋণের টাকা ভারত পরিশোধ করতে পারবে কিনা তা নিয়ে তাদের সন্দেহ উপস্থিত হয়। ভারতের ওপর ঋণদাতাদের ভরসা ও বিশ্বাস কমে আসে। বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থাগুলো ভারত থেকে তাদের বড় বড় লগ্নীগুলো সাময়িকভাবে সরিয়ে ফেলে।

১৯৮০-৮১ সালে এসে দেখা যায় যে, ভারতের কেন্দ্র ও রাজ্যগুলো মিলিয়ে অর্থের বড় ধরনের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে জিডিপি-র ৯ শতাংশ, যেখানে শুধুমাত্র কেন্দ্রেই ঘাটতি ছিল ৬.১ শতাংশ (জিডিপি-র শতাংশ হিসেবে)। এরপর এই ঘাটতি ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ১৯৮৫-৮৬ সালে কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিয়ে ঘাটতির পরিমাণ ১০.৪ শতাংশ এবং ১৯৯০ সালে তা দাঁড়ায় ১২.৭ শতাংশ (দুটি তথ্যই জিডিরি-র শতাংশ হিসেবে)।

এই ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশী ঋণের সুবিধা না থাকায় অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণের পথ নেওয়া হয়। ১৯৮০-৮১ সালে এই অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ছিল জিডিপি-র ৩৫ শতাংশ। বস্তুত, ১৯৮৫ থেকে প্রতি বছর চলতি খাতে ঘাটতির পরিমাণ ২.২ শতাংশ হারে বাড়াতেই থাকে।

ডুঙ্কেল প্রস্তাব নিয়ে সারা দেশ যখন উত্তাল, তখনও ভারতের সংসদে এই বিতর্কের মান ছিল খুবই নিচু। বামপন্থীরা ডুঙ্কেল প্রস্তাবের মেধাসত্ত্ব সংক্রান্ত সুপারিশ নিয়ে সারা দেশে আলোচনাচক্র সংগঠিত করলেও ঠিক যেদিন সংসদে এই বিষয়ে বিতর্কের জন্য নির্দিষ্ট হয়, সেইদিন সংসদে বেশিরভাগ বামপন্থী সাংসদই অনুপস্থিত ছিলেন। বামপন্থী সাংসদদের দলনেতা মিনিট দশেক এবং আর মাত্র একজন বামপন্থী সাংসদ সামান্য কিছু সময় ধরে বক্তব্য রাখেন। যদিও দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলো সংসদে নানান প্রশ্ন তোলে, কিন্তু ম্যারাকাশে-এ ভারত সরকার কী অবস্থান নেবে এ নিয়ে কোনও সহমত সেই আলোচনায় হয়নি। বরং কংগ্রেস ও বিজেপি সাংসদ ছাড়া বাকি সব সাংসদ-এর মত ছিল বর্তমান চেহারায় প্রস্তাবটিতে সায় না দেওয়া।

সাংসদদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে ভারত সরকার ডুঙ্কেল তথা গ্যাট চুক্তি সম্পর্কে তার অবস্থান ঠিক করবে বলে প্রধানমন্ত্রী সংসদে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। এরপর পরই যোজনা পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রণব মুখোপাধ্যায় সংসদকে এড়িয়ে গিয়ে গ্যাট চুক্তিতে ভারতের পক্ষে সই দিয়ে আসেন।

প্রকাশ্যে ডুঙ্কেল প্রস্তাব নিয়ে তাদের অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় রাখলেও রাজীব গান্ধী তলে তলে ডুঙ্কেল প্রস্তাবের মূল সুপারিশগুলো রূপায়নের কাজ শুরু করেছেন সেই ১৯৮৭ সালে। যে সুপারিশগুলো রাজীব সরকার রূপায়ণ করে তার একটি ছিল ভেষজ শিল্পে ভারতের স্বনির্ভরতাকে ধ্বংস করে এই ক্ষেত্রটিতে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর পেছনের দরজা দিয়ে কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধের সঙ্গে অকেজো রদ্দি ওষুধ বেশি দামে এদেশের বাজারে চালান করার ব্যবস্থা পাকা করা। এর জন্য প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের লাভজনক ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলোকে রুগ্ন করে দেওয়া, তাদের উৎপাদন যাতে যথেষ্ট ব্যাহত হয় তার ব্যবস্থা পাকা করা। রাজীব গান্ধীর সেই বিশ্বায়ন-বান্ধব নীতির নিট ফল দাঁড়ায় যে ভারত সরকারের ওষুধ সংস্থা আইডিপিএল— যারা মূল ওষুধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ভেষজগুলো প্রস্তুত করতো, পরিভাষায় যাদের 'বাল্ক ড্রাগ' বলা হয়, সেই প্রস্তুতকারক সংস্থাটিকে নানান অর্থনৈতিক কারসাজি করে রুগ্ন করে দেওয়া হলো। এর ফলে আইডিপিএল থেকে ন্যায্য দামে 'বাল্ক ড্রাগ' খরিদ করে যে সমস্ত দেশীয় ওষুধ সংস্থা ভারতের বাজারে সস্তায় জীবনদায়ী ওষুধ সরবরাহ করতো, সেই সমস্ত সংস্থা (যাদেরকে পরিভাষায় 'ডাউন-স্ট্রিম' সংস্থা বলা হয়) রুগ্ন হয়ে ভারতের ওষুধের বাজার থেকে হটে গেল। গ্যাট চুক্তি মতে ভারতের পেটেন্ট আইন পরিবর্তিত হয়ে মার্কিন দেশের পেটেন্ট আইনের সমতুল্য হয়ে গেল, যা কিনা গ্যাট চুক্তির অন্যতম মূল বিষয় ছিল। মার্কিন ধাঁচের এই পেটেন্ট আইন আসলে মুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবর্তে একচেটিয়া ব্যবসার অপর নাম। এর ফলে ভারতের বাজারে মূল এবং প্রাথমিক ওষুধের দাম বাড়লো, কেননা মার্কিন ওষুধ কোম্পানিগুলো ওষুধের দামের সঙ্গে তাদের পেটেন্ট করার জন্য খরচার একটা অংশ যোগ করে দিতো।

গ্যাট চুক্তি মোতাবেক ভারতের পেটেন্ট আইন সংশোধনের বিষময় ফল সম্পর্কে কোনো আলোচনা করার পরিবর্তে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে এই বিষয়টি আমরা আপাতত এই প্রসঙ্গ শেষ করবো। যখন ভারতের যে নিজস্ব পেটেন্ট আইন ছিল (যে আইনে সামান্য হলেও জাতীয়তাবাদের রেশ বর্তমান ছিল), গ্যাট চুক্তির আগে সেই পেটেন্ট আইনের প্রভাবে ভারতে 'র‍্যানটাক' নামক বহুল প্রচারিত বড়ির দাম পড়তো বড়ি পিছু প্রায় তিন টাকা (১৯৮০-৮১ মূল্যমানে)। ঠিক তখন মার্কিন দেশের পেটেন্টকৃত একই বড়ির প্রতিটির দাম পড়তো ৪০ টাকা। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের ওষুধের সঙ্গে মার্কিন সংস্থাগুলো প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হতো। 'মুক্ত বাজার'-এর নামে যে বিশ্বায়ন এলো, তার ফল হলো বাজার থেকে মুক্ত প্রতিযোগিতার অপসারণ। এখন গ্যাট চুক্তিতে ভারত সই দিয়ে সস্তায় ওষুধ তৈরির পুরো পরিকাঠামোটি ভারত সরকার প্রায় উঠিয়ে দিয়ে মার্কিন দেশ থেকে ওষুধ আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে ১৯৮০-র জুন মাসের (যখন গ্যাট স্বাক্ষরিত হয়নি) তুলনায় ২০১১-র জুন মাসে প্রাথমিক এবং জীবনদায়ী ওষুধের দাম বেড়েছে ১৭ থেকে ৪২ শতাংশ (মুদ্রাস্ফীতির হার ধরে নেওয়া হয়েছে)!

গ্যাট চুক্তি— বিশ্বায়নের পথে হাঁটা শুরু

গ্যাট চুক্তিকে সই দিয়ে আসার পর যোজনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং বর্তমান সরকারের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রকাশেই ঘোষণা করেন যে, গ্যাট চুক্তিতে সই না দিলে ভারতের সমূহ সর্বনাশ ঘটতো। এই সই না দিলে নাকি ভারত অতঃপর তার নড়বড়ে অর্থনীতিকে খাড়া করতে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বা আইএমএফ থেকে কোনো ঋণ পাবে না। গ্যাট চুক্তির আওতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে সহজেই ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে, কিন্তু ভারত যদি গ্যাট চুক্তিভুক্ত দেশ না হয়, তবে ভারতের পণ্য রপ্তানির বা বিদেশি পণ্য আমদানির জন্য ভারতকে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কমপক্ষে ৪৫০০টি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি করতে হবে (যদিও চীন সেই সময়ে এবং আজও গ্যাট বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আগমার্কা সদস্য নয় এবং সেই দেশটিকে বাণিজ্যের জন্য প্রণববাবু বর্ণিত এত হাজার হাজার দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি করতে হয়নি।); ভারতের রপ্তানি কমার জন্য (কেননা গ্যাট চুক্তিভুক্ত দেশগুলো শুল্ক বিষয়ক সুবিধা পাওয়ার জন্য ভারতের সঙ্গে ব্যবসা করতে অনীহা দেখাবে) বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার কমবে এবং চলতি এবং মূলধন খাতে 'ব্যালান্স অফ পেমেন্টস'-এর ঘাটতি হবে। আর গ্যাট-এ সই দেওয়ার ফলে এই বিপদ থেকে আমরা রেহাই পাবো। অবশ্য পরবর্তী ইতিহাস আবির্ভূত হয়েছে সম্পূর্ণ ট্র্যাজেডি রূপেই এবং প্রণববাবুর বর্ণনা করা প্রতিটি সুবিধা স্বপ্নবিলাসে পর্যবসিত হয়েছে।

কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯৭৫-৭৬ সালে যখন ভারতে জরুরি অবস্থা চলছিল তখন আমাদের দেশে অর্থকোষে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ঐ সময়ের ভারতের মোট জিডিপি-র ৪.১ শতাংশের মতো। ১৯৯০-৯১ সালে ভারতে যখন ধীরে ধীরে বিশ্বায়ন রূপায়িত হতে শুরু করেছে, তখন সেই কোষ ঘাটতি বেড়ে হয়ে প্রায় দ্বিগুণ, ঐ বছরের জিডিপি-র মোট ৮.৪ শতাংশ। এমন কি ১৯৭৩ সালে যখন আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলের দাম বেড়ে দু'গুণ হয়ে যায়, সেই বছরেও ভারতে যে

পরিমাণ বাণিজ্য হয় তার ফলে ১৯৭৫-৭৬ সালে এসেও ভারত বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হয়।

ভারত এই সময়ে নানান রাজনৈতিক উথাল-পাথালের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলো। ১৯৮৪-র ডিসেম্বরে ঘটে ভূপাল 'দুর্ঘটনা', বহুজাতিক সংস্থাগুলোর দুর্বৃত্তবৃত্তি সামনে এসে হাজির হয়। পাশাপাশি দেশের মানুষ দেখে রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার কেমন নির্লজ্জভাবে বিদেশি বহুজাতিক বানিয়া সংস্থা, ইউনিয়ন কার্বাইড-কে 'দুর্ঘটনার' (যা আসলে গাফিলতির ফলে স্রেফ গণহত্যার পর্যায়ে পড়ে) হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশের সংসদকে এড়িয়ে (ঠিক গ্যাট চুক্তি সই দেওয়ার মতো) রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ইউনিয়ন কার্বাইডের সঙ্গে আদালত-বহির্ভূত সমঝোতায় আসে। এই সমঝোতার ফলে গ্যাসপীড়িতরা তাঁদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হন (বস্তুত তাঁরা আজও, এই ২০১২ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত, কোনো ক্ষতিপূরণই প্রায় পাননি)। অন্যদিকে ইউনিয়ন কার্বাইড তার সম্পত্তি কয়েক দফায় বেচে দিয়ে তার লগ্নির টাকা উশুল করে চম্পট দেয়। ভারত সরকার নানান কৌশলে কার্বাইডের বিরুদ্ধে খুনের মামলাটি আদালতে চেপে রেখেছে।

বোফর্স ঘুষ ও অন্যান্য আর্থিক কেলেঙ্কারি, শ্রীলঙ্কায় তামিল হত্যায় ভারতীয় সেনা প্রেরণ করে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারকে বিদায় নিতে হয়। ১৯৯০ সালের ম্রিয়মান এক বসন্তে কেন্দ্রের মোর্চা সরকার রামজন্মভূমি-বাবরি-মসজিদ-মণ্ডল-কমিশন সংক্রান্ত বিতর্কে অস্থির হয়ে পড়ে। রামজন্মভূমি প্রশ্নে বিজেপি দল সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করলে মোর্চা সরকারের পতন ঘটে। এক নতুন সংখ্যালঘু সরকার প্রতিষ্ঠা হয় যে সরকারকে কংগ্রেস বাইরে থেকে সমর্থন করে। কিন্তু এই সংখ্যালঘু সরকার কংগ্রেসি সমর্থনপুষ্ট হয়েও বিশ্বায়ন-বান্ধব বাজেটটি সংসদে পাশ করাতে ব্যর্থ হয়। এই সংখ্যালঘু সরকারের ওপর থেকেও কংগ্রেস সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে সেই সরকারেরও পতন ঘটে। নতুন নির্বাচনের জন্য ১৯৯১ সালের মে মাসে দিন স্থির হয়। এই নির্বাচনের প্রচারের সময় রাজীব গান্ধী বিস্ফোরণে নিহত হন।

১৯৯০ সালের ডিসেম্বর থেকে ভারত সরকার দৈনিক ভিত্তিতে ঋণ নিতে থাকে। এর ফলে লগ্নিকারী সংস্থাগুলোর ভারতের অর্থব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমতে থাকে দ্রুত। পাঁচ মাসের মধ্যেই অনাবাসী ভারতীয়রা ভারতের বাজার থেকে তাদের লগ্নি করা ১৩০ কোটি ডলার সরিয়ে নেয়। এই সময় নাগাদ (জুলাই ১৯৯১) পাউন্ড স্টারলিং সাপেক্ষে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটে ১৭.৩৮ শতাংশ। আর্থিক ঘাটতি মেটানোর জন্য এই সময় অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৯০-৯১ সালে আর্থিক বছরের মোট জিডিপি-র ৫৩ শতাংশ। ১৯৯০ সালে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে অষ্টম পাঁচশালা সাময়িকভাবে স্থগিত হলে ঘোষণা করা হয়।

জানুয়ারি ১৯৯১ সালে ভারতের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ১২০ কোটি ডলার। জুন ১৯৯১-এ সেই সময় এক ধাক্কায় তা অর্ধেক হয়ে যায়। এই সময়ে শ্রী চন্দ্রশেখর কেয়ারটেকার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ চালাচ্ছিলেন। তিনি ভারতের সোনার যে ভাণ্ডারটি ছিল, তার পুরোটাই ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ সুইজারল্যান্ড-এর কাছে বন্ধক রেখে দু'দফায় ২২০ কোটি ডলার এবং ৫০ কোটি ডলার ঋণ সংগ্রহ করেন। ইতিমধ্যে জুন ১৯৯১ নতুন নির্বাচনের পর কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে পিভি নরসিমা রাও-এর প্রধানমন্ত্রীত্বে কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করে। প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমা রাও অর্থনীতির পিএইচডি ড. মনমোহন সিংহকে ভারতের অর্থমন্ত্রীত্বের ভার অর্পণ করেন।

মনমোহন কার্যভার গ্রহণ করে সংসদে তাঁর বাজেট বক্তৃতায় স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, ভারতের বর্তমান পরিকল্পনা ব্যবস্থা তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। তাই নতুন আর্থিকনীতি গ্রহণের মাধ্যমে ভারতের অর্থনীতিকে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার পরিবর্তে বাজারমুখী সংস্কার করেই অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রয়াত পিভি নরসিমা রাও আইএমএফ বিশ্বব্যাঙ্ক নির্দেশিত 'কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস' পদ্ধতি গ্রহণ করেন। নরসিমা রাও সংসদে যে বক্তৃতা দেন, সেই বক্তৃতাতে উৎসাহিত হয়ে সেই সময়ের নিউইয়র্ক টাইমস্ লেখে যে, "রাও ইতিমধ্যেই ভারতের শিল্পপতি এবং আইএমএফ-কে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে বর্তমান আর্থিক সংকট মোচনের জন্য ভারতের হাতে সহজ এবং পেলব বিকল্প নেই। বাণিজ্যনীতি, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি যে সমস্ত বিষয় বিদেশি বিনিয়োগের উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করে, সেগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে এবং ভারতের বাজার বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।" মনমোহন এই কাজটি ধাপে ধাপে করা শুরু করেন।

১৯৯১-এর শেষে এসে দেখা যায় যে, ভারতের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ের যা হাল তাতে আর মাত্র তিন সপ্তাহের মতো আমদানির জন্য টাকা রয়েছে। পুরোনো ঋণ শোধবার জন্য যে টাকা প্রতি সপ্তাহে সরিয়ে রাখতে হয় তা আর মাত্র এক সপ্তাহ সরিয়ে রাখা সম্ভব হবে, তারপর ভারতকে আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার নানান দেশের মতো হয় ঋণ খেলাপি অথবা ঋণ শোধের জন্য নতুন ঋণ নিতে হবে!

বিদেশি বিনিয়োগ বা বিদেশি সহায়তার ওপর ভারতের অর্থনীতির 'নির্ভরশীলতা' বিষয়ে দু-একটি তথ্য দেওয়া জরুরি। ১৯৮৫-৯০ সময়সীমায় ভারতে সরাসরি বিনিয়োগের পরিমাণ

ছিল ঐ সময়কার গড় জিডিপি-র মাত্র ০.১ শতাংশ। ১৯৯১-৯২ সময়সীমার বহিঃস্থ ঋণ বেড়ে দাঁড়ায় জিডিপি-র ৩৮ শতাংশ, ঋণ-রপ্তানি অনুপাত দাঁড়ায় ৫৬৩ শতাংশে।

১৯৪৭ সালের পর স্বাধীনতা এবং স্বাদেশিকতার ধারণা ফিকে হয়ে আসার পাশাপাশি বিদেশপ্রীতি বাড়তে থাকে। নেহরু তাঁর জীবদ্দশায় ভারতের অর্থনীতিতে মার্কিন প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানোর যাবতীয় পথ নেন। ভারত-চীন, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এই প্রতিপত্তি নির্ভরতায় পর্যবসিত হয়। ভারত সরকার অবশেষে আইএমএফ নির্দেশিত 'কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস' প্রক্রিয়াতে সম্মত হওয়ায় এখন আইএমএফ-এর বকলমে মার্কিন পুঁজি ভারতকে চেপে ধরে। আইএমএফ-বিশ্বব্যাঙ্ক চাইছিলো ভারতের অর্থনীতির বিষয়টি তাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী সমমনোভাবাপন্ন নীতি-নির্ধারকদের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে। নরসিমা রাও আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের সেই ইচ্ছা পুরোপুরি পূরণ করেন।

অক্সফোর্ড শিক্ষিত যে মনমোহন সিংকে আমলার পদ থেকে নরসিমা রাও সরাসরি ভারতের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করেন তাঁর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই মনমোহন সিং অতীতে ভারতের প্রায় সমস্ত প্রধান আর্থিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি একসময় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরও ছিলেন। বিশ্বব্যাঙ্কের সাউথ কমিশনের সেক্রেটারি জেনারেল হওয়ার সুবাদে তিনি বিশ্বব্যাঙ্কের তৎকালীন ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মাইকেল ক্যামডেসাস্-এর খুবই কাছের মানুষ ছিলেন। এই মাইকেল হলেন বিখ্যাত 'এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট'-এর জন্মদাতা। মনমোহন ভারতের পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীরও আর্থিক পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর তখনই তিনি টাকার বিনিময় মূল্যের পরিবর্তন, আর্থিক সংস্কার ও বেসরকারিকরণের কথা প্রকাশ্যেই বলতেন।

মনমোহন দায়িত্ব নিয়েই অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সংসদের গুরুত্ব কমানোর পদক্ষেপ নেন। বস্তুত 'কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস' প্রক্রিয়ার অন্যতম উপাদানই হলো নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামত দেওয়ার স্থান ক্রমাগত সংকুচিত করে এনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক করে তোলা। মনমোহন এই মর্মে নীতিগত আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সংসদ বা মন্ত্রীপরিষদে আলোচনার পরিবর্তে সরাসরি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলে কাজ করার নোংরা সংস্কৃতি চালু করেন, যা পূর্ববর্তী অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম বা বর্তমান অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় নীতিনিষ্ঠভাবে পালন করে চলেছেন। ১৯৯১-এর টাকার অবমূল্যায়নের বিষয়টিও মনমোহন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর মাধ্যমে একতরফাভাবে রূপায়িত করেন। ভারতের আর্থিক 'উদারীকরণ' সম্পূর্ণ করার জন্য মনমোহন তাঁর একটি নিজস্ব টিম গড়তে থাকেন— এই গড়ার কাজটিতে মনমোহন প্রতি পদক্ষেপে আইএমএফ-বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তা পেতে থাকেন।

অন্যান্য বিভিন্ন দেশে প্রয়োগ করে যে পদ্ধতিটি আইএমএফ-বিশ্বব্যাঙ্ক চূড়ান্ত করেছিল, সেই পথটি হলো তাদের অর্থনৈতিক অ্যাজেন্ডা রূপায়ণের কাজটি ত্বরান্বিত করার জন্য 'আর্থিক উদারিকরণ'-এর সমর্থক একদল আমলার ওপর এই কাজটির সার্বিক ভার অর্পণ করা। মনমোহন সেই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আইএমএফ-বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে জড়িত প্রযুক্তিবিদ্-আমলা, লগ্নিকারী, অনাবাসী ভারতীয়দের নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠন করে তাদের হাতে সমস্ত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেন। এই কাজটি করার প্রাথমিক ধাপ (যা 'কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস'-এর প্রাথমিক ধাপও) হিসেবে মনমোহন আমলাতন্ত্রে পরিবর্তন আনেন।

'উদারীকরণ'-এর গোঁড়া সমর্থক অরভিন্দ ভিরমানি মনমোহনের আর্থিক উপদেষ্টার ভার নেন; বিশ্বব্যাঙ্কে চাকুরিরত মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া অর্থনৈতিক দপ্তরের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। পাশাপাশি পাবলিক ফিনান্স বিশেষজ্ঞ রাজা চেলাইয়া-কে রাষ্ট্রমন্ত্রী করে সংস্কারের পক্ষে সংসদকে নিজের পাশে পাওয়ার কাজটিও মনমোহন সম্পন্ন করেন। বিশ্বব্যাঙ্কে চাকুরিরত শঙ্কর আচারিয়া ভারতের আর্থিক সংস্কারের পক্ষে জোরগলায় অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধ লিখতেন, যেমন লিখতেন সি রঙ্গরাজন। আর্থিক সংস্কার সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করার জন্য মনমোহন শঙ্কর আচারিয়াকে বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ধার করে আনেন আর রঙ্গরাজনকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করেন। এইভাবে আর্থিক সংস্কারের জন্য 'টিম-মনমোহন' (বা বকলমে 'টিম-আইএমএফ') গুছিয়ে নেওয়ার কাজটি সম্পন্ন হলো।

১৯৯১-এর জুন মাসের কোনও এক সময়ে মনমোহন ঘোষণা করেন যে, "(ভারতের আর্থিক নীতি) এখন থেকে পরিমাণগত অবরোধ (আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে) তুলে দিয়ে আমলাতান্ত্রিকতা বিলুপ্ত করবে।" এরপর সংসদে কোনো বড় মাপের আলোচনা ছাড়াই সিদ্ধান্ত হয় যে, শিল্প ও আমদানির ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং প্রথার অবসান (যা ধীরুভাই আম্বানি এবং টাটা গোষ্ঠী দীর্ঘ দিন ধরে সওয়াল করে আসছিলো), বৃহৎ বিদেশি লগ্নিকারী আর্থিক সংস্থার ভারতে আর্থিক লগ্নির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সমস্ত সরকারি ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠার অবসান, বিদেশি প্রযুক্তির ভারতে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং আমদানি শুল্কে লাগামহীন ছাড় দেওয়া শুরু হবে।

১৯৯১-এর অগস্ট মাসে মনমোহন সিং (সম্ভবত ব্যক্তিগত উদ্যোগে, কেননা কী মন্ত্রী পরিষদ, কী সংসদ কোথাও এই বিষয়ে আলোচনার কোনো নথিভুক্ত কার্যবিবরণী নেই!) ভারত সরকারের হয়ে আইএমএফ-এর কাছে একটি 'লেটার অফ

ইনটেন্ট' মারফত ভারত সরকার ঠিক কী কী বিষয়ে কেমনভাবে 'আর্থিক উদারীকরণ' এবং 'কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস' রূপায়ণ করবে, তার একটি ছক পাঠায়। এই ছকটি আদতে ছিলো আইএমএফ-এর নির্দেশিত ছক, মনমোহনের 'লেটার অফ ইনটেন্ট'-এ যে বাড়তি বিষয়টা ছিল তা হলো ঠিক কেমন দ্রুততায় এই ছকটি রূপায়িত হবে তার সময়সীমা নিয়ে। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা বিবেচনা করে মনমোহন একটি 'আপাতত ধীরে চলো' পদ্ধতি সুপারিশ করেন।

শীতের শেষে বসন্তের আগমনের অনিবার্যতার মতো যেখানে আইএমএফ, সেখানেই তার পশ্চাতে বিশ্বব্যাঙ্ক। ভারতের আর্থিক সংস্কারের উৎসাহ দেখে ১৯৯১-এর ডিসেম্বর বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতকে 'কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস' রূপায়ণের জন্য ৫০ কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করে। ভারত সরকার শর্তহীনভাবে এই ঋণ গ্রহণ করলে বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতের সামাজিক সুরক্ষার প্রকল্পগুলি গুটিয়ে নেওয়ার কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য আরও ৯০ কোটি ডলার ঋণ দেয়। জুন ১৯৯৩-এ ভারতের বহির্স্থ ক্ষেত্রে 'উদারীকরণ' রূপায়ণের জন্য আরও ৩০ কোটি ডিলার ঋণ মেলে বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে। এই তৃতীয় ঋণের সঙ্গে বিশ্বব্যাঙ্ক শর্ত জুড়ে দেয় যে এই বিষয়টি রূপায়ণের জন্য ভারতকে বিশ্বব্যাঙ্কের থেকে পাঠানো একজন পরামর্শদাতা নিয়োগ করতে হবে যার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই 'উদারীকরণ' প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

ইতিমধ্যেই মনমোহন সংসদকে এড়িয়ে গিয়ে তাঁর নিজস্ব উপদেষ্টামণ্ডলীর মাধ্যমে আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ শুরু করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও এই সমস্ত সিদ্ধান্তে সরকারি তক্‌মা দিয়ে দিচ্ছেন। ফলে ঋণ গ্রহণের এমন দেশদ্রোহী শর্ত নিয়ে সংসদে তেমন কোনো বড় মাপের বিতর্ক হয়নি। বিশ্বব্যাঙ্কের 'কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস'-এর শর্ত ছিল যে অতঃপর বিশ্বব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারকে এড়িয়ে গিয়ে কেন্দ্রের সম্মতি ছাড়াই সরাসরি বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে ঋণ দিতে পারবে। এছাড়াও লগ্নি, আর্থিক সংস্কারের বিভিন্ন বিষয় রূপায়ণের জন্য আলোচনা সাপেক্ষে পদক্ষেপ নিতে পারবে। অগুনতি টাকার আমদানি দেখে প্রায় সমস্ত সংসদীয় দলই এই 'কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস' প্রকল্পের সমর্থক বনে যায়। বিশ্বব্যাঙ্ক-আইএমএফ-এর ছকে প্রস্তুত ভারতের পর পর তিনটি বাজেট (১৯৯১, ১৯৯২ এবং ১৯৯৩-এর আর্থিক বছরে) সংসদে কংগ্রেস এবং বিজেপি ছাড়া আরও ছোটো ছোটো আঞ্চলিক দলগুলোর (যারা কেউ সরকার পক্ষে, কেউ বা বিরোধী পক্ষে) সহায়তায় পাশ হয়ে যায়। মনে রাখতে হবে বিজেপি তখন বৃহত্তম বিরোধী দল। বামপন্থীদের সংসদ এবং সংসদের বাইরে ভূমিকা ছিল নগণ্য। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারও নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করেন যা 'আর্থিক সংস্কারের' অনুসারী।

ভারতের শেয়ার বাজারে ফাটকাবাজির অবাধ প্রবেশ নিশ্চিত করার জন্য শেয়ার বাজারে 'নিয়ন্ত্রণ' কায়েম করার কথা বলা হয়। শেয়ার বাজার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে নজরদারির জন্য 'সেবি' সংস্থা গঠিত হয় ১৯৯২-তে। ঐ একই বছরে জাতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ নথিভুক্ত হয়। নিয়ন্ত্রণের নামে শেয়ার বাজারে একের পর এক কেলেঙ্কারি ঘটতে থাকে এবং সাধারণ লগ্নিকারীর টাকা মেরে দিয়ে লুঠপাটের রাজত্ব শুরু হয়। সেপ্টেম্বর ১৯৯২-তে ভারত সরকার বিদেশি লগ্নি সংস্থা-গুলোকে প্রথমে গৌণ ক্ষেত্রে এবং অচিরেই প্রাথমিক ক্ষেত্রে লগ্নির ছাড়পত্র দেয়। ঐ সময় যতগুলো দেশে আইএমএফ-বিশ্বব্যাঙ্ক নির্দেশিত পথে 'কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস' প্রক্রিয়া চালু ছিল, তার মধ্যে ভারতই প্রথম দেশ যারা তাদের ইক্যুয়িটির বাজারটি বিদেশি পোর্টফোলিও লগ্নির জন্য খুলে দেয়। এই সমস্ত তথাকথিত সংস্কারের নীট ফল হলো হর্ষদ মেহতার নেতৃত্বে শেয়ার কেলেঙ্কারি, সরকারি বন্ড, 'মাস্টার গেন' বা 'মাস্টার প্ল্যান' থেকে টাকা ছিনতাই এবং নানারকম ভুয়ো সংস্থা খুলে বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করে টাকা মেরে দিয়ে চম্পট দেওয়া। এই প্রসঙ্গ অনেকেরই সরকারি বন্ড ইউটিআই-এর ইউনিট-৬৪ লগ্নি সংক্রান্ত কেলেঙ্কারির কথা মনে পড়বে। আর্থিক অনাচার করে সাধারণ আমানতকারীদের সর্বস্বান্ত করে দুর্বৃত্ত সংস্থাগুলো অদৃশ্য হয়ে গেলে ভারত সরকার বিপুল অর্থব্যয় করে সেই কেলেঙ্কারি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। আরও কয়েকটা পরিচিত জুয়াচুরি হলো সেগুন গাছে অর্থ লগ্নি করার নাম করে 'সেবি' সংস্থার অনুমতি সাপেক্ষে বাজার থেকে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা অর্থ সংগ্রহ করে একটি সংস্থা বেপাত্তা হয়ে যায়। পরে দেখা যায় যে সংস্থাটি ভুয়ো, তার মালিকদের নাম ভাঁড়ানো হয়েছে এবং ভুয়ো সম্পত্তি এবং 'সেবি'-র প্রশংসাপত্র দেখিয়ে 'সংস্থা'টি ব্যাঙ্ক থেকে সুপারিশ জোগাড় করেছে। খনি ব্যবসায় লগ্নি করবে বলে একটি সংস্থা বিজ্ঞাপন দিয়ে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে পালিয়ে যায়। আর সর্বশেষ বৃহৎ কেলেঙ্কারি হলো শেয়ার দালাল কেতন পারেখের। কেতন ব্যাঙ্কের প্রশাসনের সঙ্গে আপোষে প্রচুর টাকা ঋণ নিয়ে শেয়ারে খাটিয়ে শেয়ারের দাম কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে ব্যাঙ্ককে সেই শেয়ার কিনতে প্ররোচিত করে। পরে কেতন তার নিজের সব শেয়ারগুলো ব্যাঙ্ককে বেশি টাকায় বিক্রি করে পালিয়ে যায়। শেয়ারের দাম পড়ে গেলে ব্যাঙ্কটি আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে অসমর্থ হলে সরকার সেই ব্যাঙ্কটিকে সরকারি কোষাগার থেকে টাকা দিয়ে অবস্থার সামাল দেয়।

মনমোহন সিং কোনো বিশেষ বিবেচনা ছাড়াই যে রঙ্গরাজনকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর গভর্নর পদে বসিয়েছিলেন তা ভাবার কোনো কারণ নেই। ১৯৯৩ সালে রঙ্গরাজনের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি তৈরি হয়; কমিটির কাজ ছিল

'ব্যালান্স অব পেমেন্টস্' সংক্রান্ত সুপারিশ কার। এই কমিটি ১৯৯৪-এর অগস্ট মাসে চলতি খাতের ক্ষেত্রে টাকার পূর্ণ-পরিবর্তন যোগ্যতার সুপারিশ হাজির করে। এই সুপারিশের ভিত্তিতে অতঃপর ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে 'সংস্কার' শুরু হয়— আসলে যা শুরু হয় তা হলো 'সংস্কারের নামে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া'। ১৯৯৪ সালে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে এমন কতকগুলো সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত পরপর নেওয়া হয় যে তা ভারতকে দেউলিয়া করার পক্ষে যথেষ্ট। সুদের হার সংক্রান্ত যে সর্বোচ্চ যে সীমা ছিলো প্রথমে তা তুলে নেওয়া হয়, ফলে ব্যাঙ্কের আমানত অলাভজনক হয়ে পড়ে এবং ফাট্‌কাপুঁজির রম্‌রমা শুরু হয়। ব্যাঙ্কে ঋণ দেওয়ার জন্য সেই ঋণ দেওয়ার বিষয়ে দায়বদ্ধতার যে পদ্ধতি চালু ছিল তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় (এই ফাঁক দিয়েই কেতন পারেখ গ্যারান্টি ছাড়াই বিপুল ব্যাঙ্ক ঋণ জোগাড় করে) এবং ব্যাঙ্ক ক্ষেত্রে সরকারের যে ১০০ শতাংশ মালিকানা ছিল তা বেসরকারি পুঁজির কাছে ক্রমে ক্রমে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও যে এশিয়া বা লাতিন আমেরিকার বহু দেশের মতো ভারতের ব্যাঙ্কব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়নি, তার কারণ বিশ্বব্যাঙ্ক অনেক গবেষণা করে শেষ পর্যন্ত ক্ষোভ সহকারে ব্যক্ত করেছে। এখনও ধুঁকতে ধুঁকতে হলেও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা যে আমানতকারীদের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছে তার কারণ (বিশ্বব্যাঙ্কের গবেষণা রিপোর্ট অনুসারে) হলো ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে চাকুরিরত প্রায় ৯ লক্ষ কর্মী লাগাতার আন্দোলনের মাধ্যমে এই বিশ্বায়ন ও সংস্কারের জগন্নাথের রথকে বাধা দান। ব্যাঙ্ক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার পর মনমোহন দেশের সম্পত্তি কম দামে বিক্রি করে দেওয়ার রাস্তা ধরেন। ১৯৯৪ সালে ভারত সরকার তার নিজস্ব সিকিউরিটি বন্ড বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এরপর শুরু হয় বিদেশি ফাট্‌কা পুঁজিদের আবাহন। ১৯৯৭-এ বিদেশি লগ্নিকারী সংস্থাগুলো ভারতর সরকারের সিকিউরিটি বন্ড-এ লগ্নি করার ছাড়পত্র পায়। সেই বছরই 'অধিক আর্থিক সংস্কারের লক্ষ্যে' তারাপুরে কমিটির সুপারিশ আসে যে মূলধনী খাতেও এখন টাকার পূর্ণ পরিবর্তন যোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। সাদা বাংলায় এর মানে হলো আইনসম্মত লুঠ। কোনো দুর্বৃত্ত সংস্থা যদি ভুয়ো কাগজপত্র দেখিয়ে ভারতের ব্যাঙ্ক থেকে টাকায় ঋণ নিয়ে তা ডলার বা ইউরো মুদ্রায় পরিবর্তন করে বিদেশি ব্যাঙ্কে স্রেফ জমা দিয়ে দেয়, তবে সেই সংস্থাকে ভারতীয় ব্যাঙ্ক কোনভাবেই সেই ঋণের টাকা ফেরৎ দেওয়ার বাধ্য করতে পারবে না! থাইল্যান্ড সহ পৃথিবীর কয়েকটি দেশে এমন ঘটনা ঘটেছে। ইরাক বা লিবিয়ার অন্য অনেক বিষয়ের পাশাপাশি এই কাজটি করতে বাধা দেওয়াই মার্কিন কর্তৃক সেই দুটি দেশ দখলের পিছনে কাজ করেছে।

ক্রমাগত ঋণ গ্রহণ এবং লাভজনক সম্পত্তি কম দামে বিক্রি করে দেওয়ার কারণে টাকার বাস্তব মূল্য ক্রমশ কমতে থাকে। সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ থেকে জুন ১৯৯৮-এর সময়সীমার ভারতের টাকার ১৬.৭ শতাংশ অবমূল্যায়ন ঘটে।

সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলি ক্রমশ উন্মুক্ত হওয়ার ফলে ২০০১-২০০২ সালে যেখানে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিলো ৬২০ কোটি ডলার, সেখানে ২০০৬-২০০৭-এ সংখ্যাটি ২৩০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যায়।

এতক্ষণ আমরা গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে বিশ্বায়নের মুখ্য বিষয়গুলি ভারতের ক্ষেত্রে কেমনভাবে রূপায়িত হয়েছে তার একটা মোটা দাগের ক্রমপঞ্জী হাজির করলাম। এই প্রক্রিয়াটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, ১৯৯১-এর পর গত দু'দশক ধরে তা প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত ধরে ধীরে বা দ্রুতহারে নিশ্চিত গতিতে বেসরকারিকরণ, বিলগ্নিকরণ, বেকারিকরণ এবং বেইমানির রাস্তায় হেঁটে চলেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গড়পড়তা ভারতবাসী এই বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় কী তীব্র নিপীড়নের শিকার হয়েছেন তার কিছু মোটাদাগের কাহিনী হাজির করবো।

বিলগ্নিকরণের মডেল : বাইলাভিলা

নরসিমা রাও সরকারের 'নয়া আর্থিক নীতি' ভারতের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে যে নিঃস্ব করে দেওয়ার পথ তা প্রকট হয় এই আর্থিকনীতির একদম শুরুর থেকে। এই বিষয়ে প্রথম যে ঘটনাটি ইঙ্গিতবাহী হিসেবে সামনে আসে তা হলো মধ্যপ্রদেশের লোহার খনি বাইলাডিলা-র কাহিনি। বিলগ্নীকরণের একটি প্রাথমিক পরীক্ষা ক্ষেত্র হিসেবে প্রথমে খনিক্ষেত্রকে বেছে নেওয়া হয়। জাতীয় খনিজ উন্নয়ন নিগম বা এনএমডিসি মধ্যপ্রদেশের বাইলাভিলা লোহা খনির একটি অংশে (যার নাম তারা দিয়েছিলো ১১বি খননযোগ্য অঞ্চল) উচ্চ জাতের লৌহ আকরিকের সন্ধান পায়। ঐ সংস্থার ভূ-বিজ্ঞানীগণ ভারত সরকারের (অর্থাৎ করদাতা জনগণের) টাকায় প্রায় ছ'বছরের গবেষণা এবং সমীক্ষা করে দেখেন যে ঐ অঞ্চলের আকরিকে লোহার পরিমাণ প্রায় ৬৫ শতাংশ, যা আন্তর্জাতিক বাজারে সেই সময়ে দুর্মূল্য বলে বিবেচিত হতো।

এনএমডিসি (ন্যাশানাল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন) ছিল ভারত সরকারের একটি অত্যন্ত লাভজনক সংস্থা। ১৯৮৯-৯০ থেকে সংস্থাটি ক্রমাগত লাভ করে আসছিলো এবং ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত ক্ষেত্রে লৌহ-আকরিক সরবরাহের বিষয়ে এই সংস্থার ভূমিকা ছিল অনন্য সাধারণ। স্বাভাবিকভাবেই ভারত সরকার এই সংস্থাকে বাইলাভিলা খনির ১১-বি অঞ্চলে লৌহ-আকরিক উত্তোলনের কাজটি অর্পণ করে। এই মর্মে সংস্থাটি খরচা চালানোর জন্য পুঁজির একটি অংশ সংগ্রহের লক্ষ্যে তার ইক্যুয়িটির ২ শতাংশ

পাবলিক শেয়ারের বিজ্ঞাপন দেয়। দেখা যায় যে, এই সংস্থার প্রতি ১০ টাকার শেয়ার ৮৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এমনই ছিল সংস্থাটির প্রতি জনগণের আস্থা। মে ২৫, ১৯৯২ ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, বাইলাভিলা-র এই খনিটি সরকারি নিয়ন্ত্রণেই থাকতে হবে, অন্যথায় ভাইজাগ স্টিল সহ অন্যান্য ইস্পাত উৎপাদন সংস্থায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে উৎপাদন বজায় রাখা অসম্ভব। সরকারি বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানানো হয় যে, এমএমডিসি-র হাতে ৪০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ রেখে, বাকি ৬০ শতাংশ বিভিন্ন সরকারি আর্থিক সংস্থার মধ্যে ভাগ করে দিয়ে একটি সংস্থার মাধ্যমে বাইলাভিলা ১১-বি অঞ্চলের আকরিক উত্তোলনের কাজ চালনো হবে।

কিন্তু ইস্পাত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী সন্তোষ মোহন দেব মহাশয় ভারতের যোজনা পর্যদের চেয়ারম্যান শ্রী প্রণব মুখার্জী (যিনি চুপিচুপি গ্যাট চুক্তিতে সই দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন), মন্টেক সিং, মনমোহন সিং এবং প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও চাইছিলেন অন্যভাবে চলতে। সেই অনুসারে, ১৯৯৩-এর অগস্টে মিত্তল গোষ্ঠী এবং নিপ্পন ডেনরো গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান ভারতের ইস্পাত মন্ত্রককে চিঠি দিয়ে প্রস্তাব দেয় যে বাইলাভিলা খনির জন্য এনএনডিসি-র ৪০ শতাংশ ইক্যুয়িটির পরিবর্তে মিত্তল গোষ্ঠীর ৪০ শতাংশ ইক্যুয়িটি থাকবে এবং এনএমডিসি-র ইক্যুয়িটি ১১ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। বাকি ৪৯ শতাংশ পাবলিক ইক্যুয়িটি (অর্থাৎ সিংহভাগ) হলেও ব্যবস্থাপনার পুরো কর্তৃত্ব থাকবে মিত্তল গোষ্ঠীর হাতে। সবচেয়ে মারাত্মক প্রস্তাবটি ছিল এই যে, ভারত সরকার খনি থেকে আকরিক তোলার যে ছাড়পত্র এনএমডিসি-কে দিয়েছিল তা যেন ভারত সরকার এনএমডিসি-র পরিবর্তে মিত্তল গোষ্ঠীকে দিয়ে দেয়। এনএমডিসি এই প্রস্তাবে রাজি না হলেও ভারত সরকার এই প্রস্তাবে সহজেই রাজি হয়ে যায়।

মে ১৯৯৪-এ নরসিমা রাও-এর 'পরামর্শ' চান ইস্পাত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেব। ১৯৯৫-এর মে মাসে বাইলাভিলাকে মিত্তল গোষ্ঠীর কাছে দিয়ে দেওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা করে দেওয়া হয়।

ইস্পাত মন্ত্রক একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি খোলে যেখানে এনএমডিসি-র শেয়ার মাত্র ১১ শতাংশ আর মিত্তল গোষ্ঠীর নিপ্পন ডেনরো-র শেয়ার ৮৯ শতাংশ। সরকার যেহেতু খনির সত্ত্ব নিপ্পন ডেনরোকে দিচ্ছে, তাই ভারত সরকার বলে যে নিপ্পন যেন এনএমডিসি-কে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১৬ কোটি টাকা দেয়। মনে রাখতে হবে এই, পরিমাণটি ছিল এনএমডিসি-র মাত্র ১০ সপ্তাহের মুনাফার সমান! ভারত সরকার এই কাজটি করে পুরো মুনাফার ৮৯ ভাগ মিত্তল গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিল। এই কাজটি করার সময় স্বচ্ছ টেন্ডার পদ্ধতি মানা হয়নি, মন্ত্রীসভায় আলোচনা হয়নি। ১৯৯৫-এর জুন মাসে ক্যাবিনেট সচিব একটি কার্যবিবরণী নথিবদ্ধ করেন, যাতে জানা যায় যে, এনএমডিসি যেন ৩০ দিনের মধ্যে মিত্তল গোষ্ঠীর সঙ্গে একটি 'মৌ-চুক্তি' সই করে ১১ শতাংশ ইক্যুয়িটিতে সম্মতি দেয়! এর আগে অর্থ মন্ত্রক হিসেবে কষে দেখায় যে কুড়ি বছর ধরে বাইলাভিলাতে যে উত্তোলন চলবে তাতে ১৯৯৪-৯৫-এর মূল্যমানে এনএমডিসি-র মুনাফা হবে ১৭০০ কোটি টাকা। অতএব ১৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের বিষয়টি হাস্যকর। শেষপর্যন্ত বাইলাভিলা খনি সরকারি হাত থেকে মিত্তল গোষ্ঠীর হাতে চলে যায়। স্টেটসম্যান পত্রিকা 'আর্থিক সংস্কার'-এর গোঁড়া সমর্থক ছিল। কিন্তু এই ঘটনায় তারাও মন্তব্য করে, ''বাইলাভিলা-তে যা করার চেষ্টা চলছে তা উদারিকরণ বা বেসরকারিকরণ বা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সংস্কার নয়। বাজারের ওপর সব কিছু ছেড়ে দেওয়ার পরীক্ষাও নয়। এটি হলো জুয়াচুরি, প্রতারণা, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার— সাদা বাংলায় জাতীয় সম্পদ ছিনতাই করা।'' (*স্টেটসম্যান* পত্রিকার সম্পাদকীয় : ৪.৭.১৯৯৫)।

বাইলাভিলা নিয়ে এত কথা বলার কারণ হলো যে, বেসরকারিসরণ ও বিলগ্নিকরণ নিয়ে যে পদ্ধতিতে ভারত সরকার 'আর্থিক সংস্কার'-এর পথ গ্রহণ করে, পরবর্তী সময়ে সেই পদ্ধতিই আরও তীব্রভাবে আরও নিখুঁত উপায়ে আরও ব্যাপক পরিসরে রূপায়ণ করে। জমি লুঠ, আদিবাসী উচ্ছেদ, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি যে সমস্ত বিষয় ভবিষ্যতে বিশ্বায়নের সমার্থক হয়ে উঠবে, তার প্রতিটি বিষয়ই বাইলাভিলা বিলগ্নিকরণ প্রক্রিয়ার উপাদান হিসেবে উপস্থিত ছিল। বাইলাভিলা অঞ্চল আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। এই এলাকায় ঐ সময়ে এবং পরবর্তী সময়ে খনির কারণে ব্যাপক হারে আদিবাসী উচ্ছেদ হয়েছে। এই বাইলাভিলা খনি বেসরকারিকরণ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা ইস্পাত দপ্তরের দুর্নীতিগ্রস্থ কোনও একজন মন্ত্রীর খেয়ালখুশির বিষয়ও নয়। এটি হলো নিয়মিত এবং ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বেসরকারি হাতে চালান করার প্রক্রিয়া। ভারত সরকার প্রথমে লৌহ আকরিক বিষয়ে এবং পরে খনি বিষয়ে 'টাস্ক ফোর্স' গঠন করে। দুটি 'টাস্ক ফোর্স'-ই সুপারিশ করে যে বড় বড় বেসরকারি শিল্পগোষ্ঠী যারা বড় মাত্রার ইস্পাত বা লোহার কারখানা গড়বে, অথবা স্পঞ্জ আয়রন ফ্যাক্টরি গড়বে তাদের একান্ত নিজস্ব ব্যবহারের জন্য উৎকৃষ্ট খনিগুলোকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। এই মর্মে সরকার খনি বিষয়ক আইন সংশোধন করে স্থির করেছে যে আদিবাসীর মালিকানায় থাকা জমির নিচে যদি খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে আদিবাসীর আর সেই জমির কোনও অধিকার থাকবে না। ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে এই আইন বলে বড় মাপের আদিবাসী উচ্ছেদ সম্পন্ন হয়েছে।

স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলো অতিরিক্ত দূষণপ্রবণ। এদের জন্য লাগে প্রচুর জল, প্রচুর কয়লা। এদের প্রায় কারুরই জল বা কয়লা ব্যবহারের লাইসেন্স নেই। তারা লুঠপাঠ করে, বেআইনি-ভাবে এইসব বস্তু সংগ্রহ করে। দূষণের ফলে গ্রাম কে গ্রাম ফুসফুসের অসুখের শিকার। এরা আদিবাসীদের বলপূর্বক উচ্ছেদ করে, তাদের পানীয় জল দূষিত করে, তাদের অরণ্য কেড়ে নিয়ে, হত্যা-ধর্ষণ ইত্যাদি নিপীড়নের মাধ্যমে নিজেদের মুনাফা নিশ্চিত করে। পশ্চিমবাংলা, উড়িষ্যা, ছত্তিশগড় সর্বত্র একই চিত্র। অথচ এর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে, সরকারি আধিকারিককে আগে থেকে জানিয়ে সময় চেয়ে স্মারকলিপি দিতে গেলে সরকার বলে রাষ্ট্র বিরোধী চক্রান্ত। এই 'চক্রান্ত' বিষয়ক মামলায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অনেকের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

২০০৩ সালের রিপোর্ট-এ জানা গেছে যে, বাইলাভিলা-র খনির কাজ দূষণ বিধি না মেনে করার ফলে শঙ্খিনী নদী বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ২০০৭-এ জানা গেছে যে, কেন্দ্র বাইলাভিলা-র অন্য কয়েকটি খনি প্রায় বিনা পয়সায় টাটা স্টীল এবং এসার ইস্পাত সংস্থাকে দিয়ে দিয়েছে। এসার এবং টাটা স্টীল নাকি এই লোহা ব্যবহার করে ঝাড়খণ্ড ইস্পাত কারখানা গড়বে। বাইলাভিলাতে খনির কাজ শুরু হওয়ার পর এখন পর্যন্ত ১২ হাজার খনি শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। ১০০০ জন প্রতিবাদী আদিবাসীর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জমি এবং রুজি বাঁচানোর আন্দোলনে সামিল প্রায় ৭০০ রমণী ধর্ষিতা হয়েছেন। বেসরকারি শিল্প মালিকের মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য ভারত সরকারের পুলিশ আটবার গুলি চালিয়েছে। সরকারি মতে ১০ জন নিহত হয়েছেন।

গল্প এখানেই শেষ নয়। উড়িষ্যার গোপালপুর অঞ্চলে টাটা গোষ্ঠী একটি বৃহৎ ইস্পাত কারখানা গড়বে বলে বিপুল পরিমাণ জমি স্রেফ গুন্ডা লাগিয়ে জবরদখল করার পর ঐ জমির পুরোনো মালিকরা যাতে ঐ জমি পুনরায় দখল করতে না পারে সেই জন্য উড়িষ্যা সরকার প্রচুর পুলিশ নিয়োগ করে। পুলিশ প্রহরার এই বাড়তি টাকা উড়িষ্যা তথা সারা ভারতের আম জনতা আজও বহন করে চলেছে। ইস্পাত কারখানার প্রাথমিক কাজকর্ম এখনও শুরু হয়নি। ইতিমধ্যেই টাটা গোষ্ঠী ঐ জমিকে প্রোমোটারির কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছে। অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে টাটা গোষ্ঠী প্রস্তাবিত উড়িষ্যার চিল্কা অঞ্চলে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ এবং সেই চিংড়ি রপ্তানির জন্য টাটার নিজস্ব বন্দর বানানোর ক্ষেত্রে। চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিটি অতিরিক্ত দূষণপ্রবণ, প্রবল বিক্ষোভের জন্য সেই কাজ স্থগিত করা গেলেও জমির দখল এখনও টাটা গোষ্ঠীর। বন্দর নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি, কিন্তু উড়িষ্যা সরকারকে সেস্, ট্যাক্স এবং সর্বোপরি বন্দরের জমির দামের বড় অংশটিই এখনও টাটা দেয়নি কিন্তু তারা নিশ্চিন্তে মালিকানা ভোগ করছে!

ভারতের দ্রব্য সামগ্রী আমদানি-রপ্তানির ব্যবসার ৯৫ শতাংশ সম্পন্ন হয় বন্দরের মারফৎ। জমি-হাঙ্গরদের নজর তাই বন্দরগুলি দখল করা। ভারত সরকার বন্দর সংক্রান্ত একগুচ্ছ আইন পরিবর্তন করে 'গৌণ বন্দর' গড়ার ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাকে ছাড়পত্র দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্র-গুজরাত-পশ্চিমবঙ্গের (অর্থাৎ উপকূলবর্তী রাজ্যগুলোতে) প্রমোটারির ফড়েবৃন্দ অতি মাত্রায় সক্রিয় হয় ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে যে কুলপী বন্দর প্রায় তৈরি হতে চলেছিল, 'পরিবর্তন'-এর জোয়ারে সেই প্রকল্পে আপাতত ভাটার টান। তবে জোয়ার আবার আসন্ন বলে ক্ষমতার অলিন্দে গুঞ্জন উঠেছে। গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রে এই 'গৌণ বন্দর নির্মাণ'-এর জন্য লাইন লেগে যায়। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ বাধে। পুলিশ বেপরোয়া সন্ত্রাস করে কয়েকটি বিক্ষোভকে আয়ত্তে আনতে পারলেও সবগুলিকে আয়ত্তে আনতে পারেনি। এই বিষয়ে সবচেয়ে সাংঘাতিক ঘটনাটি ঘটে গুজরাতের উম্বরগাঁওতে, যেখানে একটি বেসরকারি সংস্থা উপকূলবর্তী মূল্যবান জমি অধিগ্রহণ করতে এলে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বিশেষ সম্মানিত প্রাক্তন সৈনিক কর্ণেল সাভে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

এনরন : নতুন এক বাটপাড়ির করুণ কাহিনী

বেট্চেল-ডিপিসি সংস্থার একটি কনসোর্টিয়াম মহারাষ্ট্রের সমুদ্র উপকূল গুহগড়ে ধাবল পাওয়ার করপোরেশন নামে দু-দফায় দুটি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ার জন্য "ছাড়পত্র" পায়। এই ধাবল কোম্পানির সর্ববৃহৎ শেয়ারের মালিক ছিলো এনরন সংস্থা। মহারাষ্ট্র সরকার এই এনরন সংস্থার সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি (২০ বছরের) চুক্তি করে যে এই সংস্থা যতটা বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে তার পুরোটাই মহারাষ্ট্র রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কিনে নেবে— মূল্য নির্ধারণ করবে এনরন সংস্থা। যদি উৎপাদন মূল্য বাড়ে তবে পর্ষদ সেই বেশি মূল্য দিতে বাধ্য থাকবে। উৎপাদনের জন্য এনরনের যদি ক্ষতি হয় তবে সেই ক্ষতিপূরণের দায় হবে মহারাষ্ট্র বিদ্যুৎ পর্ষদের।

এই ধাবল প্রকল্পের প্রথম দফায় ৭৪০ মেগাওয়াট উৎপাদনের জন্য মহারাষ্ট্র বিদ্যুৎ পর্ষদ এনরনকে বছরে ৪৩ কোটি ডলার দিতে বাধ্য থাকবে। দ্বিতীয় দফার ১৬২৪ মেগাওয়াট উৎপাদনের জন্য মূল্য ভবিষ্যতে এনরন একতরফা-ভাবে নির্ধারণ করবে। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে মহারাষ্ট্র সরকার এবং ধাবল সংস্থার মধ্যে 'পাওয়ার পারচেস এগ্রিমেন্ট' বা পিপিএ সই হয় ১৯৯৩ সালে। এই চুক্তি নিয়ে সারা দেশে হইচই পড়ে যায়। মহারাষ্ট্রের বিরোধী দল বিজেপি-শিবসেনা এই চুক্তিকে 'বিশ্বাসঘাতকতা' বলে বর্ণনা করে।

১৯৯৫ সালে বিজেপি-শিবসেনা জোট মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন করে। সরকার গঠন করেই তারা ঘোষণা করে যে তারা ধাবল চুক্তি বাতিল করবে। লোকসভার বিরোধী বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি কড়া ভাষায় লোকসভায় বলেন যে মহারাষ্ট্রের পূর্বতন কংগ্রেস সরকার এনরনের কাছ থেকে ১.৩ কোটি ডলার ঘুষ নিয়ে এমন চুক্তি করেছিলো। এনরন-ও বিবৃতি দিয়ে বলে যে তারা রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং ভারত সরকারের আমলাদের 'শিক্ষিত করার জন্য' ১.২ কোটি ডলার খরচ করেছে। এই 'শিক্ষিত করার প্রক্রিয়া'ই শেষ পর্যন্ত চুক্তি সই হওয়াকে সহায়তা করেছে বলে এনরনের পক্ষে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।

বিজেপি-শিবসেনা সরকার ধাবল চুক্তি বাতিল করলে, ১৯৯৫ সালের শেষ দিকে মার্কিন সরকার, ভারত সরকারের মাধ্যমে মহারাষ্ট্র সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফ্রাঙ্ক উইসনর কড়া ভাষায় চুক্তি বাতিল করার এই পদক্ষেপের সমালোচনা করেন। ভারত সরকারও বলে এই পদক্ষেপ বিদেশি লগ্নিকারীদের কাছে ভুল সংকেত বহন করবে। এখানে দুটি কথা বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এক, মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফ্রাঙ্ক উইসনর চাকরি থেকে অবসর নিয়ে অন্যতম ডিরেক্টর হিসেবে এনরন কোম্পানিতে যোগদান করেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন মার্কিন দেশের ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জির আরও পাঁচজন অবসর প্রাপ্ত আমলাকে, যাদের মধ্যে তিনজন মহারাষ্ট্র সরকার এবং ধাবলের হয়ে চুক্তি-র সময় মার্কিন দেশের পক্ষ থেকে 'পরিদর্শক' হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো যে এই 'পারচেস পাওয়ার এগ্রিমেন্ট' বা পিপিএ-র মুসাবিদা করেছিলেন এনরনের পক্ষের উকিল হিসেবে শ্রী পি চিদাম্বরম, যিনি ছিলেন একদা ভারতের অর্থমন্ত্রী, অধুনা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি এনরনের উকিল হিসেবে শেষদিন পর্যন্ত ভারত সরকারের বিরুদ্ধে এনরনের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন।

নাটক দ্রুত পঙ্কমাঙ্কের দিকে ধাবমান হয়। ১৯৯৫-এর নভেম্বর মাসে বিজেপি-শিবসেনা জোট সরকার ঘোষণা করে যে তারা মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষে ধাবল বিষয়ে 'পুনর্বিবেচনার জন্য একটি নতুন কমিটি' গঠন করবে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রে সরকার অস্থির হয়ে পড়ে। ১৯৯৬-এর মে মাসে কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বে একটি সংখ্যালঘু সরকার কার্যভার গ্রহণ করে। এই সরকার মাত্র ১৩ দিন স্থায়ী ছিল। যখন ১৩ দিনের মাথায় এই সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ জারির প্রক্রিয়া চালু হয়ে গেছে, তখন সংখ্যালঘু সরকারের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী তাঁর 'মন্ত্রীসভা'-র সদস্যদের একটি বেসরকারি মধ্যাহ্ন-ভোজের সভায় আমন্ত্রণ জানান। এই সরকারের শেষ দিনে শ্রীবাজপেয়ী ২৫টি আর্থিক সংস্কারের প্রস্তাব করেন। পাশাপাশি তিনি পূর্বতন কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব মতো এনরনকে ক্ষতিপূরণ এবং এনরনের সঙ্গে যে চুক্তি বিজেপি-শিবসেনা সরকার বাতিল করেছিলো, এই দুটি বিষয়েই ছাড়পত্র দিয়ে দেন। ১৯৯৬-এর অগস্ট মাসে মহারাষ্ট্র সরকার বাজপেয়ীর ছাড়পত্র দেওয়া নতুন প্রস্তাব মোতাবেক এনরন-এর সঙ্গে ধাবল সংক্রান্ত নতুন চুক্তিতে সই দেয়।

এই নতুন চুক্তিতে বলা হয় যে ধাবল-এর প্রথম দফার জন্য মহারাষ্ট্র বিদ্যুৎ পর্যদ এনরনকে প্রতি বছর ৪৩ কোটি ডলার দেবে। দ্বিতীয় দফার জন্য দিতে হবে ৩ কোটি ডলার। এই নতুন 'পিপিএ'-তে বলা হয় যে এই মূল্য দিতে মহারাষ্ট্র বিদ্যুৎ পর্যদ আইনত বাধ্য থাকবে— কোনোভাবেই এই শর্ত খেলাপ করা চলবে না।

এই অসম চুক্তির ফলে দেখা যায় যে ধাবল প্রকল্প দফায় দফায় ১.২ কোটি ও ১.৪ কোটি ডলার মুনাফা করবে, ইক্যুয়িটির ক্ষেত্রে এই মুনাফার পরিমাণ (লগ্নি থেকে ফেরত আসার শতাংশ) ৩০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই পরিমাণ মুনাফা ভারত সরকারের নিয়ম অনুসারে সর্বোচ্চ যে মুনাফা হতে পারে তা দুগুণ পরিমাণ, কিন্তু ভারত সরকার এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। (বরং পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ৪০টি গৌণ বিলের সঙ্গে একদিন সংসদে ৩৫ মিনিটের মধ্যে মুনাফা শিথিল সংক্রান্ত বিলটি সহ এই ৪১টি বিল পাস হয়ে যায়)।

মহারাষ্ট্র বিদ্যুৎ পর্যদ এই অনাচারের ফলে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ধাবল প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ কিনলে পর্যদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে মাত্র ১৮ শতাংশ, কিন্তু পর্যদের মুনাফার ৭০ শতাংশ চলে যাচ্ছে পিপিএ মোতাবেক এনরনকে টাকা দিয়েই।

এই সময় নাগাদই সুপ্রিম কোর্ট-এর বিচারপতি নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়। প্রাক্তন ন্যায়াধীশ পুঞ্চির নিয়োগ নিয়ে জল ঘোলা হয়। এমন একটি অবস্থায় যখন এনরনের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের আইনভঙ্গ করা সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা হয়, তখন মে ১৯৯৭-এ সুপ্রিম কোর্ট কোনো কারণ না দেখিয়েই সেই মামলা খারিজ করে দেয়।

সুপ্রিম কোর্ট আরও নানাভাবে জনস্বার্থের বিষয়টি উপেক্ষা করেছে। মিথ্যা হলফনামা মেনে নিয়ে নর্মদা বাঁধের উচ্চতা বাড়ানোতে সায় দিয়েছে, অরুন্ধতী রায় বা মেধা পাটকার সুপ্রিম কোর্ট-এর বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে (মনে রাখতে হবে যে একজন বিচারপতি মামলার রায়েই সংখ্যালঘু হিসেবে প্রায় একই রকম প্রশ্ন তুলেছিলেন) তাঁদের 'আদালত অবমাননা'র দায়ে অভিযুক্ত করার হুমকি দেয়।

ভারতের শক্তি বিজ্ঞানীরা বারবার বলে আসছিলেন যে ধাবল প্রকল্প লাভজনক নয়— ভারত সরকারের সম্পদ লুঠের

ওপর প্রকল্পটির স্থায়ীত্ব নির্ভর করছে। মহারাষ্ট্র বিদ্যুৎ পর্ষদ এনরনের উৎপাদিত বিদ্যুৎ কিনতে গিয়ে দেখে যে সেই বিদ্যুতের মূল্য বাজারে লভ্য বিদ্যুৎ-এর চেয়ে বেশ কয়েকগুণ দামি। মে ২০০০-এ মহারাষ্ট্র বিদ্যুৎ রেগুলেটরি কমিটি বলে যে আপৎকালীন প্রয়োজন ছাড়া ধাবল প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ কেনা যাবে না। কমিটি হিসেব করে দেখায় যে চুক্তিমতো এনরনের যে টাকা প্রাপ্য অর্থাৎ বছরে ৪৩ কোটি ডলার, সেই টাকা মিটিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে সস্তা বিদ্যুৎ কিনলেও পর্ষদের ক্ষতি কমবে। চুক্তিমতো এই 'তোলা-র টাকা' মহারাষ্ট্র বিদ্যুৎ পর্ষদকে আগামী কুড়ি বছর ধরে এনরনকে দিয়ে চলতে হবে!

মহারাষ্ট্রের যে সব শিল্প সরাসরি ধাবল প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ কিনতো, তারা দেখে যে এই বেশি দামের বিদ্যুৎ না কিনে তারা যদি নিজস্ব জেনারেটর মারফত বিদ্যুৎ তৈরি করে নেয় তবে তা অনেক সস্তা পড়ে। তিন মাসের মধ্যে ৯৭ শতাংশ শিল্প ধাবল প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ কেনা বন্ধ করে দেয় এবং মহারাষ্ট্রে বিদ্যুতের চাহিদা সাংঘাতিক কমে যায়।

মহারাষ্ট্র সরকার তখন আইন করে নিজস্ব জেনারেটর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে যাতে শিল্প সংস্থাগুলো আবার বেশি দামে এনরনের বিদ্যুৎ কিনতে বাধ্য হয়।

২০০১ সালে জানুয়ারিতে মহারাষ্ট্রে আবার কংগ্রেসি সরকার আসীন থাকার সময় বলে যে মহারাষ্ট্র বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছে এনরনের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার মতো যথেষ্ট অর্থ নেই— এনরনের বোঝা বইতে গিয়ে সংস্থাটি একটি লাভজনক সংস্থা থেকে একটি রুগ্ন সংস্থায় পর্যবসিত হয়েছে। এনরন তখন মহারাষ্ট্র এবং ভারত সরকারের সঙ্গে 'কাউন্টার গ্যারান্টি চুক্তি', অর্থাৎ এনরনের আর্থিক ক্ষতি পূরণের ভার মহারাষ্ট্র এবং ভারত সরকার গ্রহণ করবে, এই মোতাবেক অর্থ দাবি করে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিবৃতি দিয়ে বলেন যে চুক্তির খেলাপ করা বহুজাতিক লগ্নিকারীর কাছে ভুল সংকেত পাঠাবে। শেষ পর্যন্ত ২০০১-এর জুন মাসে মহারাষ্ট্র বিদ্যুৎ পর্ষদ ঘোষণা করে যে তারা ধাবল পাওয়ার করপোরেশনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছেদ করছে। তখন ধাবল করপোরেশনের অন্য অংশীদাররা (যেমন বেট্‌চেল, জেনারেল ইলেকট্রিক, অ্যাংলো-ডাচ পেট্রোলিয়াম, শেল ইত্যাদি) তাদের কাছে এনরন সংস্থার ঋণ মিটিয়ে দেবার জন্য ভারত সরকারের ওপর চাপ দেয় এবং ভারত সরকার সেই দাবি পূরণ করে। এই টাকা দিয়েই আবার এই সংস্থাগুলোই নিলামে ধাবল সংস্থাটির যাবতীয় লাভজনক অংশটি (অর্থাৎ জমি, যন্ত্রপাতি, আমানত ইত্যাদি) কিনে নেয় এবং এনরনকে তার শেয়ারের অংশ দিয়ে দেয়।

এরপরের ঘটনা পরিচিত এবং টাটকা। সারা পৃথিবীতে এনরন-এর জুয়াচুরি ধরা পড়তে থাকে, পাওনাদাররা এনরনকে ঋণ দেওয়া বন্ধ করে। এনরন সম্পত্তি বেচে ঋণের টাকা মেটাতে থাকে। এনরনের ডিরেক্টরবৃন্দ তাদের শেয়ার উচ্চ মূল্যে বেআইনি 'ইনসাইডারস ট্রেডিং'-এর সুযোগ নিয়ে বেঁচে দিয়ে তাদের লগ্নি মুনাফাসহ পুনরুদ্ধার করে নেন। বাজারে এনরনের শেয়ারের দাম তলানিতে গিয়ে ঠেকে।

বিশ্বজুড়ে আর্থিক বুদবুদ বিস্ফোরণের প্রথম তরঙ্গের ধাক্কাতেই এনরন দেউলিয়া হয়ে যায়। ভারতে ধাবল প্রকল্পের জন্য অধিগৃহীত জমির জন্য মালিকরা প্রায় কেউই ক্ষতিপূরণ পাননি, সংস্থা বন্ধ হওয়ার সময় বিদেশি পরামর্শদাতা এবং উচ্চস্তরের অফিসাররা ছাড়া কর্মচারীদের সাড়ে সাত মাসের মাইনে বাকি ছিলো। কনট্রাকটাররা শ্রমিক সরবরাহ করে টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে, দিন-মজুররা পাঁচ মাসের মজুরি পান নি। মহারাষ্ট্র বিদ্যুৎ পর্ষদ আজও রুগ্ন, যেমন রুগ্ন হয়ে পড়েছে চিপলুন-গুহগড় অঞ্চলের পরিবেশ। শেষ কথাটা না বললেই নয়। ধাবল প্রকল্প কখনই ভারতের পরিবেশ দপ্তর থেকে পূর্ণ উৎপাদন শুরু করার ছাড়পত্র পায়নি কেননা তারা দূষণ নিয়ন্ত্রণে কোনও লগ্নি করবে না বলে জানিয়েছিলো। এইটিই হলো বিশ্বায়নের পরিচিত ছক। এনরনের ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। ২০১১ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম (যা আদিবাসী অধ্যুষিত এজেন্সি এলাকা)-এর সোমপেটার ভাবনাপাড়ু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়েও এমন ঘটনা ঘটেছে। জল-জঙ্গল-জমি-পরিবেবা ভিটেমাটি বাঁচানোর আন্দোলনে স্থানীয় অধিবাসীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। গ্রামসভাকে এড়িয়ে গিয়ে, রাজ্য সরকারকে এড়িয়ে কেন্দ্রে অনুমোদন নিয়ে পুলিশের সহায়তায় জমি এবং জলের উৎস দখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে দু-দফা গুলি চালনায় ৫ জন নিহত এবং ২৫ জন থেকে ৫০ জন নিহত হয়েছেন বলে খবর। পুলিশ এক বছর ধরে অঞ্চলটিকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে— এক সময় রাজ্য মানবাধিকার কমিশনকেও ঐ স্থান পরিদর্শনে বাধা দিয়েছে।

এই ছক বেয়ে এসেছে বিএসএনএল বিলগ্নিকরণ। করদাতা জনগণের টাকায় বিএসএনএল সঞ্চার ব্যবস্থা গড়ার পর ভারত সরকার সেই পরিকাঠামো জলের দরে বেসরকারি ব্যক্তি মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে। বিমানবন্দরের ক্ষেত্রেই একই হয়েছে। সরকারি কাজের জন্য নির্দিষ্ট জমি এবং টাকা প্রাইভেট সংস্থার দেওয়া হচ্ছে 'বিমানবন্দর পুনর্গঠন'-এর নামে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলো নানান অজুহাতে জমি দখল করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েই ছিলো। এরপর যখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলো একযোগে উন্নয়নকেই একমাত্র অ্যাজেন্ডা করে তুললো, তখন 'উন্নয়ন'-এর নামে জমি দখলে আর কোনও বাধা রইলো না। উন্নয়নের নানা রূপ— কখনও তা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প (যেমন এনরন), কখনও তা বড় বাঁধ (যেমন নর্মদা বা টিহরি), কখনও কেমিক্যাল হাব (যেমন নন্দীগ্রাম), কখনও বা বড় কারখানা (যেমন আম্বানির মহা-বোম্বাই পরিকল্পনা বা

শালবনিতে জিন্দালদের ইস্পাত কারখানা বা সিঙ্গুরের টাটার মোটরগাড়ির কারখানা)। এই জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিক্ষোভ বিদ্রোহ প্রশমনের জন্য প্রয়োজন ছিলো দেশের আইনের বাইরে কিছু 'বেআইনি-আইন' তৈরি করে জমি অধিগ্রহণ, যার ফলে রায়তরা আর আদালতের সুবিধে পাবে না। এমন এক দেশের মধ্যে বিদেশ হলো বিশেষ অর্থনীতির অঞ্চল বা 'সেজ'। নন্দীগ্রাম-এর আন্দোলনের ফলে এই বস্তুটি কী তা এখন ভারতের জনগণ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন। ঠিক কতগুলি সেজ এখন চালু আছে এবং ঠিক কত লক্ষ হেক্টর জমি এই 'সেজ'-এর মাধ্যমে করপোরেট দুনিয়া গ্রাস করেছে তার সম্প্রতির হিসেব দেওয়া কঠিন। যা জানা যাচ্ছে তা হলো অক্টোবর ২০১১ পর্যন্ত ৫৮৫টি সেজ ছাড়পত্র পেয়েছে। ২০০৬ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৮৪ হাজার হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিলো। ২০১১-র জুন পর্যন্ত তারপর আরও ১ লক্ষ ১৩ হাজার হেক্টর জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৪১০০ কোটি মার্কিন ডলার। চাকরি হয়েছে প্রতি ২.৫ কোটি বিনিময়ে একজন করে মানুষ স্থায়ী চাকরি পেয়েছেন।

বিশ্বায়নের ফল

সামান্য কিছু তথ্য দিয়ে আলোচনা শেষ করবো। ১৯৯০-২০০০, এই এক দশকে (বিশ্বায়ন-এর এক দশক পর) ভারতের কৃষির প্রবৃদ্ধির হার ছিলো ৩.১ শতাংশ, শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার ছিলো ৫.৮ শতাংশ এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ছিলো ৯ শতাংশ।

২০০৩-২০০৭, এই পাঁচ বছরে প্রাথমিক ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার অকিঞ্চিৎকর হলেও পরিষেবা ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৬৮.৮ শতাংশ।

১৯৮০-১৯৯০ এর জিডিপি-র প্রবৃদ্ধির হার ছিলো ৫.৬ শতাংশ; আর ২০০৪-০৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯ শতাংশ। শুনলে মনে হয় সব বেশ ভালোই চলছে। ২০০৭-০৮ এই আর্থিক বছরে ভারতে কোটি কোটিপতির (যাদের ইংরাজিতে মোলায়েম করে বিলিয়নেয়ার বলা হয়) সংখ্যা ৩৬ থেকে বেড়ে হয় ৪০। এদের এই অশালীন সম্পদবৃদ্ধি ডিজিপি-র বর্ধিত হারে যোগ হয়েছে সন্দেহ কি! এই সম্পত্তির মালিকদের সম্পত্তি বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৬০ শতাংশ। এই ৪০ জনের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৭.৫ লক্ষ কোটি টাকা। সংখ্যাটি ঠিক কতটা, তা বোঝার জন্য এই কথাটা জানানোই যথেষ্ট যে এখনও ভারত সরকারের নিজস্ব মালিকানায় যে কটা সংস্থা টিকে আছে তাদের মোট সম্পত্তির মূল্য হলো ৩.৯৩ লক্ষ কোটি টাকা, অর্থাৎ সম্পত্তিবানদের মোট সম্পদের অর্ধেকের মতো!

শক্তিক্ষেত্রে যে 'সংস্কার' চালু হয়েছে তার ফল হলো ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ বিদ্যুৎ শক্তির বণ্টন ব্যবস্থার বাইরে রয়ে গেছে। দফায় দফায় বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি, যে কোনও ছুতোয় 'জ্বালানির জন্য সারচার্জ' বসিয়ে দেওয়া হয়, এর ফলে পরিষেবা যত খারাপ হয়েছে (কেননা কর্মী সংকোচনের ফলে রক্ষণাবেক্ষণ উঠে গেছে), তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মূল্য।

কৃষির হাল শোচনীয়। ডব্লুটিও-র ফতোয়া অনুসারে কৃষিতে ভর্তুকি অদৃশ্যপ্রায়, দেশীয় বীজের বদলে চাষীদের জোর করে বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার বীজ কিনতে হয় চাষ করার জন্য (কেননা ভারত সরকার মার্কিন দেশের সঙ্গে কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগ চুক্তি করে কৃষি বীজ সংক্রান্ত সার্বভৌমত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে বসে আছে)। অন্যদিকে ২০০২-২০০৭, এই সময় সীমায় ভারত সরকার অভ্যন্তরীণ বাজারে কৃষি সম্পর্কিত মূল ২৭টি পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্তত আড়াই লক্ষ কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

গ্যাট চুক্তির সময় এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পক্ষে ওকালতি করার সময় প্রণব মুখোপাধ্যায় খুব জোর গলায় বলেছিলেন যে ভারতের বস্ত্র ব্যবসা আন্তর্জাতিক বাজার পেয়ে চাঙ্গা হবে—প্রবৃদ্ধির হার সমস্ত কল্পনাকে ছাড়িয়ে যাবে। কাল্পনিক সুবিধা আর বাস্তবের সঙ্গে তুলনায় দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯৯-২০০০ সালে ভারত থেকে বিদেশে যে পরিমাণে বস্ত্র রপ্তানি হতো তার চেয়ে ২০০৬-২০০৭ সালে রপ্তানির পরিমাণ কমেছে প্রায় ১৭ শতাংশ। এর কারণ হলো মূলত দুটি। প্রথম কারণ হলো, মার্কিন দেশ তার নিজের দেশে ডব্লুটিও নির্দেশিত পরিমাণগত অবরোধ তুলে নেয়নি, ফলে ভারতে যদিও মার্কিন পণ্য অবাধে এবং যে কোনও পরিমাণে রপ্তানি করা সম্ভব, ভারত কিন্তু মার্কিন বাজারে এবং খানিকটা হলেও ইউরোপের বাজারে অবাধে এবং যেকোনও পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানি করতে পারেনা, যদিও ভারত ডব্লুটিও-র সদস্য। ভারত বাধ্য হয়েছে পরিমাণগত অবরোধ তুলে নিতে, কিন্তু অন্য দেশে পরিমাণগত অবরোধের জন্য ভারত অবাধ রপ্তানিতে বাধা পাচ্ছে। এই হলো বিশ্বায়নের তথাকথিত 'মুক্ত' বাণিজ্যের হাল। দ্বিতীয় কারণটি হলো মার্কিন দেশ অন্যান্য দেশের সরেস পণ্যের জন্য শুল্ক-বহির্ভূত অবরোধ জারি করেছে। তারা বলেছে যে, ভারতের পণ্যকে মার্কিন মান অনুসারে স্বাস্থ্যকর এবং নির্মল হতে হবে। কিন্তু ভারত এই শুল্ক-বহির্ভূত অবরোধ মার্কিন দেশের জিন-প্রযুক্তি-জাত সয়াবিন বা মনসান্টোর বীজের জন্য ব্যবহার করতে পারবে না। এই শুল্ক-বহির্ভূত অবরোধ জারি করে মার্কিন দেশ তার বাজারে বিদেশি পণ্য বিপনণ আটকে দেয়!

ভারতের এনএসএসও সংস্থা ২০০০ সালে এক দফা সমীক্ষা করে বলে বিশ্বায়নের এক দশক পর ভারতের সমস্ত দারিদ্র্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কোনও কর্মসূচির অস্তিত্ব গ্রামাঞ্চলে খুঁজে পাওয়া ভার।

২০০৬ সালে মনমোহন সিং মহারাষ্ট্র চেম্বার অফ কমার্স-এ একটি দীর্ঘ বক্তৃতায় ভারতে বিশ্বায়নের সুফল নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। তিনি যে তথ্য দেন, তা বিনা মন্তব্যে তুলে দিলেই ভারতে বিশ্বায়নের ফল সম্পর্কে ধারণা পরিস্কার হবে। বিশ্বায়ন শুরুর বছরে ভারতে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ছিল ২ কোটি, কর্মহীন মানুষের বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ছিল ৬ শতাংশ। ১৯৯৯-২০ সালে সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ায় ২.৭ কোটি (জনসংখ্যা বৃদ্ধির ৭.৩ শতাংশ)। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, সরকারের অধীনস্থ ১০০টি সংস্থার কর্মচারীদের মাইনে ১৯৯২ সাল থেকে একবারও বাড়েনি। ১৯৯১-২০০০ সালে কারখানার জমি এবং সম্পত্তি রিয়েল এস্টেট-এ বেচে দেওয়া, জমিকে শিল্প উৎপাদন ছাড়া অন্য কাজে লাগানো, শ্রমিকদের মজুরি ছাঁটাই ইত্যাদি করে মালিকরা কারখানা লক-আউট করে পালিয়েছে ব্যাপক হারে। বস্তুত এই সময়সীমায় শ্রমিক বিক্ষোভ বা শ্রমিক হরতালের জন্য যত শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছে তার চেয়ে ৩৫ গুণ বেশি শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছে মালিকদের দ্বারা কারখানা লক-আউট ও অন্যান্য নষ্টামির জন্য।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বিশ্বায়নের এই দু'দশক দেখালো যে, বিশ্বায়ন হলো শ্রমের বিরুদ্ধে পুঁজির নগ্ন আগ্রাসন। মানবজাতির কৃষ্টি, সভ্যতা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মুনাফার বেপরোয়া অভিযান। এই ধরিত্রির পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং তার যা কিছু নান্দনিক তাকে অপরিহারযোগ্যভাবে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া। মুনাফার পাহাড় আর নিঃস্ব মানুষের আর্তনাদ। লোভ আর লালসার বন্যা, যার বিরুদ্ধে একদিন ক্ষোভ, ক্রোধ আর প্রতিরোধের উজানমুখী বন্যা শুরু হবে। সূত্রপাত ঘটবে মানুষের ইতিহাসের, প্রাক্ ইতিহাসের অবসানে। 'এ পথেই আলো জ্বেলে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে... এ বাতাস কী সূর্যকরোজ্জ্বল।'

বিশ্বায়ন ও আদিবাসী : লড়াই-এর মূল

৬০ পৃষ্ঠায় পর

সংস্কৃতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত নবপ্রজন্মের দিক্‌ভ্রান্ত আদিবাসী যুবমানস। আর এ সবের পৃষ্ঠপোষক যেহেতু বিশ্বায়ন পরিচালিত রাষ্ট্র তখন এর থেকে পরিত্রাণ সহজ নয়।

বেদান্ত কোম্পানির বক্সাইট খনি প্রকল্প, জগৎসিংপুরে পস্কোর ইস্পাত কারখানা, কেওনঝড়, সুন্দরগড়ের খনিব্যবস্থা, এলাহাবাদের করছানা ও বারার বিদ্যুৎ প্রকল্পে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীরাই। খনি ও জঙ্গল অঞ্চল আজ সার্বিকভাবে আদিবাসী হস্তচ্যুত হয়ে বহুজাতিকের হাতে। দক্ষ শ্রমিক ব্যতীত এ সব কর্মপ্রকল্প চলে না। কাজেই শ্রমিক হিসেবেও তারা সেখানে অপাংক্তেয়। তারা ভীড় বাড়াচ্ছে ইটভাটায়। শুধু অল্প মজুরি নয়, আদিবাসী নারীদের প্রতি অত্যাচারও সেখানে বাড়ছে। সুযোগ নিচ্ছে মালিকেরা, আর ক্রমশ প্রতিকারহীন অসহায়তার শিকার এই আদিবাসীরা। দাদায়ন সঠিক ভাবেই 'The orbits of Global Economy' তে লিখেছেন : 'The face and heart of the world is marred by the scars and sours of misery and deprivation. It presents a picture of horror and dejection for the majority death."[৩]

কিন্তু এর বিরুদ্ধে লড়াইটা কি জারি আছে? অবশ্যই, কেননা আমরা জানি পস্কো আন্দোলনের কথা, আর এখানেই রাজনীতির একটা বিশেষ প্রসঙ্গ এসে পড়ে। যাঁরা identity crisis বা fragmentation এর কথা বলেন তারা প্রকারান্তরে বিশ্বায়নের মদত যোগান। লড়াই শুধু identity দিয়ে দেখলে বিভিন্ন জনজাতিসত্তার মধ্যে বিভেদ আরও বৃদ্ধি পায়, আর তাতে সুবিধা শাসকশ্রেণীরই। অতীত ঐতিহ্যের পুনরাভিষেকে কোন আদিবাসী আজ আর খুঁজে পাবে না মুক্তি পথ। বিশ্বায়ন শুধু আদিবাসীরই কাছে সংকট বহন করে আনে না। এর শিকার আরও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। চার্লি চ্যাপলিনের 'The Great Director'-এর ভাষায় যদি বলতে হয় : "Let us fight to free this world to do away with greed, with hate and intolerance" তাহলে যুদ্ধটা এককভাবে আর আদিবাসীদের থাকে না। আত্ম-পরিচয়ের সংকট এখন অস্তিত্বের সংকটে রূপায়িত। লড়াইকে তাই যৌথ সংগ্রামের পথ বেয়েই যেতে হবে। বিক্ষোভ ও হতাশা যখন সহজ এবং স্বাভাবিক পথে মুক্তি পথ খুঁজে পায় না, তখন অনেক সময়েই সেটি আত্মঘাতী রূপ নেয়। আত্মঘাতী সংগ্রামকে শত্রুহননকারী সংগ্রামে পরিণত করাই আজকের যুগের দাবি।

১। সন্তোষ রাণা ও কুমার রাণা : পশ্চিমঙ্গে দলিত ও আদিবাসী, কলকাতা ২০০৯, পৃ. ১৭৮-১৮১

২। পূর্ণ দত্ত : বীরভূম জেলা ধান্য ব্যবসায়ী সমিতির রিপোর্ট : আনন্দবাজার ১৪ই আগস্ট, ২০০০

৩। উদ্ধৃত : সমীর দাশগুপ্ত, অথচ পত্রিকা, ২০০৯, সম্পাদনা মামুন হাসান, পৃ. ১২২

গণ-সংগীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস

খালেদ চৌধুরী

সম্প্রতি হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রয়াত হয়েছেন, খবরের কাগজে, টেলিভিশনে তাঁর জীবনী এবং কর্মকাণ্ড নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে, নানা জায়গায় তাঁর স্মৃতিসভা হয়ে গেছে এবং এখনো হচ্ছে। আমার এই লেখা যেমন তাঁর জীবনী নয়, তেমনি সৃষ্টির কোনো মূল্যায়নও নয়। আমার আলোচনার বিষয়বস্তু তাঁর সৃষ্টির এক অনালোচিত দিক নিয়ে। কথাপ্রসঙ্গে তাঁর জীবনের কিছু ঘটনা এসে যেতে পারে, যার একমাত্র অবশিষ্ট সাক্ষী আমি। কাজেই হেমাঙ্গ বিশ্বাস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মাঝে-মধ্যে 'আমি'ও ঢুকে যেতে পারি। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচয় হয় ১৯৪৩ সালে— অনেকটা কাকতালীয়ভাবে। বাংলাদেশে তখন দুর্ভিক্ষ চলছে। তৎকালীন আসামের অন্তর্গত সিলেট থেকে খবরের কাগজে, রেডিওতে বিস্তারিত বিবরণ দেখি ও শুনি। খবরের কাগজে জয়নুল আবেদীন, চিত্তপ্রসাদের স্কেচ, সুনীল জানার ফটোগ্রাফ দেখে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা অনুমান করতে পারি।

৪২-এর আন্দোলনের ঢেউ তখনো মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে আছে। খবর পাচ্ছি, যে কোনো দিন জাপানি আক্রমণ হতে পারে। সীমান্ত যাবার পথে সিলেট শহরের আশেপাশে এমন কি শহরের ভেতরেও সৈন্যরা ছাউনি ফেলেছে। এমনি সময় বিনোদবন্ধু দাস নামে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়, যিনি প্রায়ই আমার ডাক্তার-মামার বাড়ি যেতেন এবং মামার বড় ছেলেকে কী সব কাগজপত্র দিয়ে আসতেন। পরে জানতে পারি তিনি কমিউনিস্ট পার্টি করেন এবং বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য টাকাপয়সা সংগ্রহের সূত্রেই ঐ বাড়ি যেতেন। একদিন তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন একটি বিচিত্রানুষ্ঠানে— যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য টাকা পয়সা সংগ্রহ করা। অনুষ্ঠানে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম তিনটি উদাত্ত ও বলিষ্ঠ কণ্ঠের গান শুনে, তাঁদের একজন ছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, যৌবনে তিনি সত্যিই হেমকান্তি ছিলেন। দ্বিতীয়জন টগবগে স্বাস্থ্যবান নির্মলেন্দু চৌধুরী এবং তৃতীয় জন শ্রীমতী শান্তা সেন।

গানের চর্চা আমারও বাল্যকাল থেকে ছিল। কিছুটা লোকসংগীত, কিছুটা গ্রামোফোন রেকর্ড বা কলের গান শুনে শেখা। কিন্তু এদের গানের বিষয়বস্তু এবং গায়নরীতির স্বতন্ত্রতায় আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। কিছুদিনের মধ্যেই বিনোদবন্ধু দাস আমাকে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে নিয়ে গেলেন এবং অন্যান্য অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিলেন। ক্রমে কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে বসে যখন আমি দুর্ভিক্ষ, মহামারী, স্বাধীনতা আন্দোলন, জাপানি আক্রমণ, মজুতদার, কালোবাজার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পোস্টার আঁকায় ব্যস্ত, পাশের ঘর থেকে শুনতে পেতাম ঐ একই বিষয় নিয়ে গানের মহড়া।

একদিন হেমাঙ্গ বিশ্বাস আবিষ্কার করলেন আমি গাইতে পারি, তাই আমাকেও জুটিয়ে নিলেন তাঁর গানের দলে। গানের বিষয়বস্তু নতুন এবং সমসাময়িক হলেও সুরগুলো আমার ভীষণ পরিচিত লাগল। কারণ যে সব সুরে এই গানগুলো গাওয়া হচ্ছিল তার সবটাই লোকসংগীতের পরিচিত সুর অথবা লোকসংগীত ঘেঁষা। কাজেই জন্মাবধি শুনে আসা পরিচিত সুরে ওঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি।

এখানে একটা কথা আগেই উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিনোদবন্ধু দাস আমাকে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার পরই আড়ালে সাবধান করে দিয়েছিলেন যাতে আমি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের খুব কাছাকাছি না যাই— নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখি, কারণ হেমাঙ্গ বিশ্বাস যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত! তখনকার আমলে যক্ষ্মা রোগ দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল, তাই সবার মনেই এ ব্যাপারে দারুণ ভীতি ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে সম্পূর্ণ আলাদা একখানা ঘরে থাকতে দিয়েছিল, সবরকমের দেখাশোনার ব্যবস্থা করেছিল। সেই আলাদা ঘরে তিনি একা থাকতেন এবং গান রচনা করতেন। আমরা যখন গানের মহড়া দিতাম, তখন ওই ঘরেরই আর এক প্রান্তে বসে যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে মহড়া দিতাম।

এরই মধ্যে যখন তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং ডাক্তার তাঁকে বেরবার ছাড়পত্র দিয়েছেন তখন তিনি ও নির্মল কলকাতা এসেছিলেন— বোধহয় এ্যান্টি ফ্যাসিস্ট রাইটার্স এ্যান্ড আর্টিস্টস কনফারেন্স যোগদান করতে। তাঁদেরই মুখে শোনা, কনফারেন্সের লোকেরা হেমাঙ্গ বিশ্বাসেরই একটি গান নিয়ে রোজ প্রভাতফেরি করতেন। সেই গানটি হল : 'দুঃখের রাতের ঘোর তমসা ভেদি, স্বাধীনতারি দিন এল যে ফিরে' ইত্যাদি। পুরনো দিনের লোক যাঁরা এর সাক্ষী তাদের হয়ত স্মরণে থাকবে। সেই সময় আরো কয়েকটি স্বরচিত গান তিনি ও নির্মল এখানে গেয়ে গিয়েছিলেন, যেমন— 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষাণ ভাইরে' এবং 'শুনছনি শুনছনি সইলো শুনছনি শুনছনি, হরিতে রমণীর মান আইলোরে জাপানি' ইত্যাদি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। শেষোক্ত গান দুটি এবং এই রকম অরো কয়েকটি গানের সুর কিন্তু হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নয়। এইগুলির সুর ছিল নির্মলেন্দু চৌধুরির। এই রকম বেশ কিছু গানের সুর যৌথভাবেও করা ছিল। ৪৩ সালের শেষের দিকে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের এই সমস্ত গানের একটি সংকলন প্রকাশিত হয় সিলেটের মডার্ন বুক ডিপো থেকে। সংকলনটির নাম ছিল 'বিষাণ'। এই বিষাণেই আমার প্রচ্ছদপটের হাতে খড়ি।

দেখতে দেখতে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের শরীর আবার খারাপ হয়ে

পড়ে, ফলে তাঁকে পার্টি পাঠিয়ে দেয় দক্ষিণ ভারতের মদনাপল্লীর একটি স্যানাটোরিয়ামে। এই সময় নির্মল, আমি, গোপাল নন্দী, প্রসূন (বর্তমানে বাংলাদেশের এম-পি এবং বিখ্যাত কৃষক নেতা করুণাসিন্ধু রায়ের পুত্র) ইত্যাদি মিলে ছোট-ছোট শহরে গ্রামেগঞ্জে গান গেয়ে বেড়াচ্ছি। গানগুলির বেশির ভাগ রচনা ছিল হেমাঙ্গ বিশ্বাসের। অন্যান্য অনেকের রচিত ও সুরারোপিত গানও আমাদের অনুষ্ঠানসূচীতে কিছু কিছু ছিল যাঁদের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

কয়েকমাস পর হেমাঙ্গ বিশ্বাস সুন্দর স্বাস্থ্য নিয়ে স্যানাটোরিয়াম থেকে ফিরে এলেন এবং আবার নতুন উদ্যমে গান লিখতে শুরু করলেন। কিন্তু যেহেতু আমাদের গানের দল নিয়ে অহরহ গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়াতে হত, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা হত খুবই কম। এরই মধ্যে যখন কোনো নতুন গান লিখে ফেলেছেন, আমরাও তড়িঘড়ি গানটি শিখে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ছি দল নিয়ে।

১৯৪৪ সালে যখন কলকাতায় মহম্মদ আলি পার্কে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের নামকরণ হয় এবং যে সম্মেলন হয়, ঠিক তার আগে সিলেটের করিমগঞ্জ অঞ্চলের পাথারকান্দি নামক গ্রামে একটি কিষাণ সম্মেলন হয়। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের শরীর আবার খারাপ হয়ে পড়া সত্ত্বেও তাঁকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হল অথবা বলা যেতে পারে তিনি স্বেচ্ছায়ই সেখানে গেলেন। তাঁর থাকার বিশেষ ব্যবস্থা করা হল। সেখানকার সমস্যা নিয়ে, তার সঙ্গে বাংলার দুর্ভিক্ষকে যুক্ত করে সেই অঞ্চলের প্রচলিত জারী গানের সুরে রাতারাতি একটি দীর্ঘ গানও রচনা করলেন। গানের কথা ছিল এই রকম :

ও আরে কৃষক মরিলায়,
ডুবিল ডুবিল তরী অকূল দরিয়ায়।
....
পিতা ছাড়ে পুত্র আর পতি ছাড়ে সতী,
মা বেচে দেয় কোলের ছেলে হায়রে কি দুর্গতি।
মানুষ যত পশুর মত পথে ঘাটে মরে,
দিন দুপুরে টেনে নেয় শিয়াল ও কুকুরে
হায় কৃষক মরিলায়.....

জারী গানের সঙ্গে নাচ প্রচলিত, তাই গ্রামেরই একজন কৃষক এসে নাচটি দেখিয়ে দিলেন। পদক্ষেপ অতি সরল, চতুর্মাত্রিক এবং হাতে রুমাল নিয়ে ঘুরে-ঘুরে নেচে গাইবার নিয়ম। আমি সহজেই নাচটি তুলে পার্টির কিষাণ ফ্রন্টের মণিপুরি এলাকায় গিয়ে সেখানকার যুবকদের জড়ো করে গানের ধুয়া এবং নাচটি শিখিয়ে দিলাম। মণিপুরিদের দিয়ে যাতে তাদের নিজস্ব ভাষায় গাওয়ানো যায় সেইহেতু তৎকালীন মণিপুরি পার্টি নেতা এবং মণিপুরের রাজার জামাতা ইরাবত সিং হেমাঙ্গ বিশ্বাসের দুটো গান 'জাগো, দুখের রাতের ঘোর তমসা ভেদি, স্বাধীনতার দিন এল যে ফিরে' এবং 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষাণ ভাইরে' যথাক্রমে অনুবাদ করে দিলেন :

হৌর, আওবা অহিঙ্গি আমাম্বা কুক্তুনা,
স্বাধীনতা নুমিৎ থৌরকে হন্না!...

আর দ্বিতীয়টি :

থাঙ্গলাদু মাইয়া থাঙ্গু থৌনা হে
লৌবা...

হেমাঙ্গ বিশ্বাস যে জারী গানটি লিখেছিলেন, ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে এই জাতীয় গানকে একঘেয়েমির জন্য লোকে অবজ্ঞার্থে লাচাড়ি বলে থাকে সিলেট অঞ্চলে। অতি দ্রুত গানটি তুলে সুষ্ঠভাবে পরিবেশনার জন্য হেমাঙ্গ বিশ্বাস দারুণভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন এবং পরে শুনেছিলাম তিনি যখন সম্মেলন থেকে ফিরে আসেন তখন প্রায় সুস্থ হয়েই ফিরে আসেন। জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া আমার জানা সম্ভব ছিল না, কারণ গান শেষ করেই সোজা ট্রেনে চেপে আমি কলকাতা চলে আসি প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে যোগ দিতে। ইতিমধ্যে নির্মল অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় বৌবাজারে 'রেড এইড হাসপাতালে' ছিল এবং ঘটনাচক্রে শান্তা সেন তখন কলকাতায় ছিলেন। দু-জনকে জড়ো করে বিনয় ঘোষের শশীভূষণ দে স্ট্রিটের বাড়িতে মহড়া দিয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের দুটো গান গাই ঐ সম্মেলনে। সঙ্গে পেছন থেকে হারমনিয়াম বাজিয়ে ছিলেন হবিগঞ্জের উচ্চাঙ্গ সংগীত গাইয়ে অধীর চক্রবর্তী। দুটি গানেরই বিষয়বস্তু ছিল দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধাবস্থায় মেয়েদের কুল মান হারানো বিষয়ক। একটি হল :

ক্ষুধানলে অঙ্গজ্বলে গো
মা গো পুড়ে পুড়ে হলেম ছাই,
আমি কুল ছাড়িলাম, মান বেঁচিলাম
তবু দুঃখের অন্ত নাই। ...

আর অন্যটি ছিল ধামাইল এর সুরে :

বল সখি বল, বল আমারে
ও কে ঘরের বার কুলের বার করলো নারীরে।...

এছাড়াও আর একটি গান আমাদের অনুষ্ঠান সূচিতে ছিল, যেটি ৪৪ সালে করিমগঞ্জের চাপঘাট অঞ্চলে সুপারির ওপর ট্যাক্স বসানো নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক রচনা :

এ গো সজনি, গুয়াগাছে ট্যাক্সো লাগিল্নি,
বাটার উপর পইলো ঠাটা গালভরি পান
খাইওয়ানি।...

গানটি খাঁটি সিলেটি ভাষায় লেখা। ধামাইল সুরে গাওয়া। গানটির রচয়িতা একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। নাম আব্দুল গফ্ফার দত্ত চৌধুরী। কোনো একটি স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। ইনি গুরুসদয় দত্তদের পূর্বপুরুষ কে একজন বাজি রেখে দাবা খেলতে গিয়ে হেরে ধর্মত্যাগ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরই বংশধর। আমার সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচয় ছিল। আমাদের গণসংগীত শুনে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি এই গানটি রচনা করে আমাকে দিয়েছিলেন, সুরও শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই এবং গানটি শোনাই।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানটি ভাল লেগে যায়। তারপর থেকে আমাদের অনুষ্ঠান সূচিতে নিয়মিত গানটি গাওয়া হত। এর থেকে পরবর্তীকালে অনেকের ধারণা জন্মে যে গানটি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লেখা, কেননা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অনেকগুলো গানে সিলেটি উপভাষা ছড়ানো আছে।

কলকাতা সম্মেলন শেষ করেই আমাদের সোজা চলে যেতে হয়েছিল ময়মনসিংহের নেত্রকোনা কিষাণ কনফারেন্সে। শুধু আমার ও নির্মলেরই যাবার কথা ছিল স্কোয়াড নিয়ে। নেত্রকোনা পৌঁছে দেখি হেমাঙ্গ বিশ্বাসও ইতিমধ্যে অসুস্থ শরীর নিয়ে হাজির। নানা জায়গা থেকে আসা গানের স্কোয়াড বিশেষ করে চট্টগ্রামের কবিয়াল রমেশ শীলের দলসহ আরো অনেকের ঠাঁই হল একই ক্যাম্পে। আমরা সবাই গাইতে গাইতে, আর কবিয়ালের দল ঢোল বাজাতে বাজাতে একসংগে কনফারেন্সের প্যাণ্ডেলে হাজির হতাম এবং কার্যক্রম শেষ হলে পূর্ববৎ ফিরে আসতাম। অন্যদিকে নীরদ মজুমদার, বংশী চন্দ্রগুপ্ত অনবরত স্কেচ করে চলেছেন, সুনীল জানা ক্যামেরার শাটার টিপে চলেছেন। একদিন সুনীল জানা আমাদের ক্যাম্পে এলেন। আমরা হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে মাঝখানে গাওনদার হিসেবে দাঁড় করিয়ে নিজেরা নৌকা বাইচের ট্যাবলো করলাম এবং সুনীল জানা পর পর ছবি তুলে গেলেন। পরদিন প্রকাশ্য অধিবেশনের সময় প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে মুষলধারে বৃষ্টি! প্রায় লাখখানেক লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। প্যাণ্ডেলের উপরের চাল ফুঁড়েও ক্রমাগত ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে শুরু করেছে। আমরা তাড়াতাড়ি হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে দশ-বারো ফুট ডায়াসের নীচে নিয়ে গিয়ে বুকে যাতে ঠান্ডা না লাগে তার জন্য আমাদের ট্যাবলোয় ব্যবহৃত পরচুলাগুলো ওঁর জামার ভেতর বুকের মধ্যে ঠেসে ধরে সেই যাত্রা তাঁকে ঠান্ডা লাগার হাত থেকে কোনো মতে বাঁচাই। এইভাবে সারাজীবনই তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় দেখেছি এবং এই অসুস্থ অবস্থার মধ্যেও তিনি ক্রমাগত গান লিখে গেছেন। ৪৫ সালে আমি পাকাপাকিভাবে কলকাতা চলে আসায় হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছেদ পড়ে গেল। ইতিমধ্যে আরো বছর দুয়েক গড়িয়ে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে — ভাগ হয়েছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তখন আসামের গৌহাটি চলে গিয়েছিলেন আই-পি-টি-এর দায়িত্ব নিয়ে। ৪৭ সাল নাগাদ লিখলেন তাঁর অতি-বিখ্যাত স্যাটায়ার 'মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য'। তারপর বন্দিমুক্তি আন্দোলনের সময় লিখলেন :

জালালাবাদের
জালিনাবাদের
এসেছে আদেশ
চল চল বীর
পর পর বীর
সৈনিকের বেশ।...

যতদূর মনে পড়ে এই গানটির সুর দিয়েছিলেন জর্জদা—দেবব্রত বিশ্বাস। এইভাবে দেশের এবং বিদেশের সমসাময়িক প্রতিটি ঘটনা নিয়ে তিনি গান লিখেছেন সারা জীবন ধরে। যে গানগুলো তিনি রচনা করেছেন, সাধারণ্য সেগুলো গণসংগীত নামে পরিচিত। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বা সলিল চৌধুরি যে সমস্ত গান তৎকালে রচনা করেছিলেন সেগুলোও গণসংগীত তবে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানগুলো রচনাশৈলী ও সুর কাঠামোয় ভিন্ন। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের শৈলী ছিল, দু-চারটে ব্যতিক্রমসহ, সর্বতো-ভাবে লোকসংগীতের ছাঁচে রচিত। তাঁর প্রতিটি গানের সুর লক্ষ করলেই দেখা যাবে কোনো না কোনো লোকসংগীতের পরিচিত সুরে বসানো। নীচে কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। ওঁর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর প্রথম যে সমস্ত গানগুলি শুনি, সবগুলির সুর অতি-পরিচিত। যেমন :

লঙ্গর ছাড়িয়া নাওয়ের দে দুখী নাইয়া,
বাদাম উড়াইয়া নাওয়ের দে।
ঢেউ-এর তালে তালে করতালি দে,
নয়া দিনের বইলোরে বাও উজান গাঙ্গে,
বাদাম উড়াইয়া নাওয়ের দে।...

এই গানটি সিলেট অঞ্চলে বহুল-প্রচলিত নৌকা বাইচের গান:

জাইলায় পাগল কইলো তোরে
বাভনের মাইয়া গো,
জাইলায় পাগল কইলো তোরে।...

বানিয়াচঙে যখন ম্যালেরিয়া মহামারি আকারে দেখা দিল এবং কিছুদিনের মধ্যে দশ হাজার লোক প্রাণ হারাল, তখন তিনি সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত ভাটের গানের সুরে লিখলেন :

বানিয়াচঙের প্রাণবিদারী ম্যালেরিয়া মহামারী
হাজার হাজার নরনারী মরছে অসহায়।
ভারতবর্ষের সেরা গ্রাম চল্লিশ হাজার লোকের ধাম
তাহার আজ কি পরিণাম দুঃখে মরি হায়।...

হবিগঞ্জের গ্রামের 'কুইনা' নামে এক লোকশিল্পী একজন দোতারা বাজিয়েকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীহট্ট প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সভাপতি বিনোদ চক্রবর্তীর বাড়িতে এসে কয়েকটি গান গেয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি গান ছিল বাংলার দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে লেখা :

দুর্গতি নাশিনী মা দুর্গে
দুঃখহরা নাম তোমার,
কি দুর্গতি ঘটালে এবার।...

গানটি মূলত ভাটিয়ালি সুরে হলেও তাতে কবিগানের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল এবং প্রচুর পরিমাণে তানের কাজ ছিল। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ঠিক একই সুরে লিখলেন :

ক্ষুধানলে অঙ্গ জ্বলে গো
মাগো পুড়ে পুড়ে হলেম ছাই,
আমি কুল ছাড়িলাম, মান বেঁচিলাম
তবু দুঃখের অন্ত নাই।...

এই গানটির কথা আগে একবার উল্লেখ করেছি। ৪৪ সালে কলকাতার মহম্মদ আলী পার্কে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে

আমি ও নির্মল গেয়েছিলাম।

নেত্রকোনা কিষাণ কনফারেন্সে যেসব লোকশিল্পীরা এসেছিলেন তাঁদের নাম আজ আর আমার মনে নেই, কারণ ৪৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতায় যে বন্যা হয় তাতে আমার গানের সংগ্রহসহ যাবতীয় জিনিস একমাস জলের তলায় থেকে নষ্ট হয়ে যায়। আমি তখন 'শহীদের ডাক'-এর সঙ্গে আসাম-বাংলা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমার আস্তানা ছিল ক্ষিতিশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পাম প্লেসের বাড়ির একতলায়। যাই হোক নেত্রকোনায় লোকশিল্পীরা যেসব গান গেয়েছিলেন সেই রকম দুটো গানের প্রথম কলি দুটি মনে পড়ছে। একটি হল :

দুঃখের সীমা নাই দুঃখ কার কাছে জানাই,
সুখের স্বপন ভাঙলোরে চোরাই বাজারে।

হেমাঙ্গদা এই সুরে লিখলেন পূর্বপাকিস্তানের তথা বর্তমান বাংলাদেশের ভাষা-আন্দোলনকে বিষয় করে :

শুন দেশের ভাই ভগিনী, শুন আচানক কাহিনী,
কান্দে বাংলা জননী ঢাকার শহরে।

দ্বিতীয় গানটি হল :

দেশের ভাব দেখিয়া মরি দেশের ভাব দেখিয়া মরি,
ভাবের অভাব হইল দেশে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করি
ভাব দেখিয়া মরি...

হেমাঙ্গদা প্রথম কলি হুবহু রেখে পরের অংশে লিখলেন :

দেশের ভাব দেখিয়া মরি, দেশের ভাব দেখিয়া মরি,
ভাবের অভাব হইল দেশে, ভায়ে ভায়ে বিবাদ করি
ভাব দেখিয়া মরি...।
... ...
শুন কংগ্রেস নেতাগণ, মুসলনমানের আত্মশাসন
না মানিলে হয় না মিলন দেখ চিন্তা করি,
ছোটো ভায়ের উচিত দাবি, নয়ত বাড়াবাড়ি
ভাইরে যদি ঝগড়া করি তবেই হবে ছাড়াছাড়ি
ভাব দেখিয়া মরি...

প্রচলিত হোরি গান :

আজ হোরি খেলবরে শ্যাম তোমারি সনে,
একেলা পাইয়াছি দেখা নিধুবনে।

এই সুরে লিখলেন :

বাঁচব বাঁচবরে আমরা বাঁচবরে বাঁচব,
ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়া নয়া বাংলা গড়ব।

অথবা তাঁর অতি বিখ্যাত গান 'মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য' যার অনুষঙ্গ এবং সুর নিয়েছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি অতি প্রচলিত ব্যঙ্গাত্মক গান :

বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায়,
সোনার পুরী আন্ধার কইরা লুকাইলায় কোথায়।
পুয়ায় কান্দে পুয়িয়ে কান্দে, কান্দে বাবুর মায়,
দোতালার উপরে কান্দে রাসমণি বেশ্যায়।...

অর্থাৎ কে যার আর কে কাঁদে। মাউন্টব্যাটেন ভারতের স্বাধীনতা দিয়ে যাবার প্রাক্কালের ভারতীয় নেতা সর্দার, পণ্ডিত, মৌলানা ইত্যাদির আক্ষরিক বিবরণকে ব্যঙ্গ করে ছিল এই রচনা। এই গানটিতে তিনি ভাটিয়ালি, জারি, কবির পাঁচালি, পদকীর্তন ইত্যাদি নানা লোক সংগীতের সুর ব্যবহার করেছেন। ময়মনসিংহের শরৎ দাসের লেখা গান :

ব্রজ হতে লইদেয় এসে লাগল ইস্টিমার
জুটলরে চৈতন্যের হাতে, অসংখ্য পাইকার।

এই গানের সুরে লিখলেন : 'ঘোর কলিকাল আইল আকাল সোনার বাংলায়।' ১৯৪৪ সালের কোনো এক সময়, বোধহয় শেষের দিকে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সিলেটে গিয়েছিলেন প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে। তাঁকে খাঁটি লোকসংগীত শোনাবার জন্য গ্রাম থেকে একজন শিল্পীকে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেই শিল্পী যুদ্ধের সময়ে আকাশে এরোপ্লেনের অহরহ ওড়াউড়িতে আতঙ্কিত হয়ে গান গাইলেন :

একি লীলা আজব খেলা কুনোযুগে শুনছনি সজনি,
জগৎজুড়ি উড়ুরপলইন দেখছনি।

হেমাঙ্গদা ১৯৪৬ সালে যখন সর্ষর তেলের সংকট দেখা দেয় তখন এই সুরে এবং প্রথম লাইনটি অবিকৃত রেখে লিখলেন:

একি লীলা আজবখেলা কোন যুগে শুনছনি সজনি
হইরর তেল কোন দেশে গেল খবর জাননি।

এইভাবে অনেক উদাহরণ দিতে পারতাম যদি আমার সংগ্রহ নষ্ট না হয়ে যেত। আমার এই জাতীয় উদাহরণ দেবার উদ্দেশ্য এই যে, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সংগীত-মনস্কতা অথবা ভিন্ন অর্থে সংগীত শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছিল মীরাশি গ্রামে, যেখানে জন্মেছিলেন এবং লালিত হয়েছিলেন, সেই অঞ্চলটি লোকসংগীতের উন্নততর শৈলী দ্বারা প্রভাবিত। তাই তাঁর গানের ওপর লোকসংগীতের প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই প্রকট। গান রচনা করে সুরারোপ করার সময় স্বাভাবিক ভাবেই লোকসংগীতের সুর এসে যেত। ৬০ সালে চীন থেকে ফিরে আসার পর তাঁর রচনা এবং সুরারোপ ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করে। কারণ ওই সময় তিনি বিবাহ করে চাকরি নিয়ে স্থিত হয়েছেন এবং তারই কাছে শোনা—ওই সময় তিনি বেশ কিছুদিন কোনো এক সংগীতজ্ঞের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নেন। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সীমান্ত প্রহরী' তারই ফসল। তাঁর স্বর্ণযুগের গানের সুরারোপ ছিল ভিন্ন। কিন্তু এটাও ছিল ক্ষণস্থায়ী। পরবর্তী সময় দেখেছি তিনি বিভিন্ন দেশের লোকসংগীত এবং গণসংগীত ভিত্তিক গান রচনা করেছেন অথবা অনুবাদ করেছেন। আমার মনে পড়ে, ৬৫ সালের কোনো এক সময় ইন্দোচীন বিষয়ক একটি নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছিল। তিনি তখন হাসপাতালে। আমি প্রায়ই এস এস কে এম হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যেতাম। হঠাৎ একটি চিঠি পেলাম তাঁর কাছ থেকে। লিখেছেন, আমি যেন অতি অবশ্যই বেহালাটা নিয়ে তাঁর বাসায় যাই। পরদিন তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন। যথারীতি আমি যেতেই তিনি একটি ইন্দোচীনের মুক্তি

এর পর ৯০ পৃষ্ঠায়

অগ্নিখেলার সাথী

অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী

হেমাঙ্গ বিশ্বাস একজন কবিকে এই বলে তাড়া করেছিলেন: ''বড়ো মিষ্টি তোমার হাতটি/পড়তে পড়তে ক্লান্তি আসে না যেন/...নেশা কেটে গেলে পর/তোমার কবিতা বড়ো ফাঁকা ফাঁকা লাগে,/ছেঁড়া কাপড়ের গায়ে যেন/সূক্ষ্ম এম্ব্রয়ডারি।/পারবে কি রাস্তার ধারে/হাঁটু গেড়ে বসা মেয়েটির/লজ্জা ঢেকে দিতে?''[১] প্রকৃত প্রগতি সাহিত্যের এবং প্রকৃত বামপন্থী রাজনৈতিক দলের আদর্শই হচ্ছে নগ্ন ও নিরন্নের জীবনে আমূল পরিবর্তন আনা, সর্বহারার বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে দেওয়া, শোষণের মূল ওপড়ানোর কাজে হাত লাগানো। কোন্ মানদণ্ডে তাঁর সৃষ্টিকে বিচার করতে হবে হেমাঙ্গ বিশ্বাস তা নিজেই স্পষ্ট করে বলে গেছেন। তাঁর প্রথম কবিতা-সংগ্রহ 'সীমান্ত প্রহরীর'-র ভূমিকায় তিনি বলছেন, ''শ্রেণী সচেতন গণজাগরণের পটভূমিকায় ভারতের প্রগতি লেখক ও শিল্পী আন্দোলনই আমার কাব্য প্রেরণার উৎস।'' যে পটভূমির ওপর তাঁর কবিতা ও গানের ফুল ফুটেছিল তার বিশদ বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি ঐ ভূমিকাতেই বলছেন, ''আসামের পার্বত্য ও সমতল এলাকার মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল, দীর্ঘকাল চীনে থেকে সেই মহান দেশের দ্রুত রূপান্তরের নায়ক সাধারণ মানুষের যে অন্তরঙ্গ পরিচিতি লাভ করেছি— অধিকাংশ কবিতাতে তার স্বাক্ষর রয়েছে। ...জীবন সত্যে তা অমোঘ।''

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অসমীয়া কবিতা গ্রন্থের[২] 'আগকথা' বা মুখবন্ধে তিনি বলেছিলেন, ''আমি বিশ্বাস করি কুলখুড়োর চাতালেই বসতে হবে আজকের কবি সাহিত্যিকের বৈঠককে। তাতেই আজকের আত্মকেন্দ্রিক বন্ধ্যা কাব্যের মুক্তি।'' প্রথমে ব্যাখ্যা করা যাক ''কুলখুড়োর চাতালে বসার'' তাৎপর্য কী। যে অসমীয়া কবিতা গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছি তার প্রথম কবিতাটির নাম 'কুলখুরার চোতাল' (অসমীয়া বানানের বাংলা প্রতিরূপ)। অন্ধকার কুঁড়ে ঘরে কেরোসিনের বাতির মিটি মিটি আলোতে কুলখুড়ো বসে আছেন। তাঁর সভাপতিত্বে কৃষি-বিপ্লব সম্বন্ধে মন্ত্রণার সভা হবে। কুলখুড়ো যেন যুগযুগান্তের চিরশাশ্বত কৃষক-বিপ্লবীর প্রতীক, যুগে যুগে শোষিতের ব্যথা-বেদনা পান করে খুড়ো হয়েছেন নীলকণ্ঠ, অর্থাৎ যন্ত্রণায় জীর্ণ ও বিবর্ণ। যুগে যুগে বসুমতীর গর্ভ থেকে তিনিই সম্পদ আহরণ করেন, মহাকবি খুড়োই যুগে যুগে লাঙলের মুখে রচনা করে চলেছেন মাণিক্যমাধুরীময় কাব্য অর্থাৎ সোনার ফসল! বার বার শোষকের পালকে তাড়াতে তাড়াতে আজ বীর কৃষি-বিপ্লবী রণক্লান্ত।

কবিতাটিতে এই হল খুড়োর পরিচয়। এবারে আমরা বুঝতে পারছি কবি তাঁর মুখবন্ধে কেন বলেছেন যে এহেন কুলখুড়োর আসরে আজকের দিনের কবি সাহিত্যিকদের বসতে হবে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস বিন্দুমাত্র রেখে ঢেকে কথা বলেননি, বলতেনও না। তিনি পরিষ্কার ভাষায় সেই সব কবিদের কাব্যকে আত্মকেন্দ্রিক ও বন্ধ্যা বলে গাল দিয়েছেন যাঁরা নিছক শিল্প সৃষ্টির জন্যে কবিতা লেখেন এবং কাব্যসৃষ্টি-প্রয়াসী নতুন কবিদের এই বলে ডাক দিয়েছেন যে আত্মকেন্দ্রিকতা ও বন্ধ্যাত্ব থেকে কবিতাকে মুক্তি দিতে হলে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে হবে। সুতরাং কুলখুড়োর আসরকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। এড়িয়ে গেলে নতুন জীবনের সংগ্রামকে, শ্রেণী সংগ্রামকে, এড়িয়ে যাওয়া হবে।

কবি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে এরপর বোধ হয় আর অস্পষ্টতা থাকে না। তবু তিনি ঐ 'আগ-কথা'-তে বলেছন, ''বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অসমের অগণিত তরুণ-তরুণী যদি আমার কবিতা থেকে একটুও প্রেরণা না পায়— আমার কবিতা অসার্থক। জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন বিদগ্ধ সমালোচকদের ভালো লাগল কি লাগল না, তাঁদের কোনও কাব্য পরিক্রমা বা সংকলনে ঠাঁই পেল কি না পেল তা নিয়ে আমার একটু মাত্র ভাবনা নেই।'' এখানে দেখছি যে তিনি জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন সমালোচকদের বৈদগ্ধ্যকে অশ্রদ্ধা করেন এবং তাঁদের সমালোচনাকে কিছুমাত্র মূল্য দেন না। কারণ তিনি নিজে জনতাময়। জনতার জীবন, জনতার সংগ্রাম, জনতার মুক্তি— এই বিষয়গুলোকে ঘিরেই কবির জীবন ও কর্ম আবর্তিত হত।

'কুলখুরার চোতাল' কবিতাটির রচনাকাল ১৯৬৮। তাই কৃষি বিপ্লবের ঢেউ লেগেছে তাতে। ঐ অসমীয়া কবিতা সংগ্রহেই আরেকটি কবিতায় কবির সাহিত্যাদর্শ পরোক্ষ ভাবে ফুটে উঠেছে। কবিতাটি প্রখ্যাত অসমীয়া সাহিত্যিক জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার প্রশস্তি—'জ্যোতি প্রপাত'। জ্যোতিপ্রসাদ ছিলেন নাটকে, চলচ্চিত্রে, গানে, কবিতায়, গণসঙ্গীতে অসমে নবজাগরণের অন্যতম নায়ক। তাঁর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত কবি তাঁকে সম্বোধন করে বলছেন, ''রূপকে খুঁজতে গিয়ে তুমি/বিরূপকে বারে বারে আঘাত করেছ/...সুরস্রষ্টা তুমি/অসুরের সঙ্গে তাই তো/আজীবন সংগ্রাম তোমার।/স্বদেশকে ভালোবেসে সাহিত্য রচনা করলে/এক করে গেলে তুমি/সাহিত্য-স্বদেশ/শিল্প আর সংগ্রাম/ভারতীর বরপুত্র তাই তো রাজবন্দী।'' জ্যোতিপ্রসাদ ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে এক বছরের ওপর জেল খেটেছিলেন। তাই তাঁকে কবি বলেছেন 'রাজবন্দী'। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন প্রগতিশীল সংগ্রামী

লেখক। কলাকৈবল্যবাদীদের মতো তিনি নিছক শিল্পসৃষ্টির আনন্দে শিল্প সৃষ্টি করেননি, সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে স্বদেশ-সেবা করেছেন, সুরের সাধক হয়ে তিনি সুরলোকে আশ্রয় নেননি, অসুরের সঙ্গে সংগ্রামে সুরকে করেছেন হাতিয়ার। আরেকটু এগোলে দেখি হেমাঙ্গ বিশ্বাস জ্যোতির উদ্দেশে বলছেন, 'শান্তির সেনানী এক হাতে ধরেছ লেখনী/অন্য হাতে নাগার বল্লম।'' তাঁর আদর্শ শিল্পীর হাতে হেমাঙ্গ লেখনী ও বল্লম দুইই দিয়েছেন—সামাজিক দায়িত্বহীন কলা-বাদী সাহিত্যিকদের এ দৃশ্য অসহনীয়। কিন্তু তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রগতিশীল শিল্পী একাধারে শিল্পী ও সমাজ-পরিবর্তনের যুদ্ধে যোদ্ধা। শোকার্ত কবি বলে চলেছেন, ''হে বন্ধু, তোমার স্বদেশ/ আজও ছিন্নবস্ত্রা/দুঃশাসন-ধর্ষিতা।/...আণবিক লালসায়/ সশংকিতা শিল্পীর পৃথিবী।/জ্যোতি কোথা? জ্যোতি আর নেই!'' পরমুহূর্তেই ব্যাকুল কবি বলে উঠছেন যে জ্যোতি নেই একথা মিথ্যে। ''...অন্ধকারে/নগরে/প্রান্তরে/ঘরে ঘরে/স্ফুলিঙ্গ-প্রস্তুতি/সেই তো তুমি।/অন্যায়ের প্রতিরোধে/দাসত্বের প্রতিবাদে/'ন-জোয়ান-ই-হিন্দ'/সেই তো তুমি।'' তারপর হেমাঙ্গ বর্ণনা করছেন অতুলনীয় কাব্যময় ভাষায় কাদের সঙ্গে এবং কিসের সঙ্গে জ্যোতিপ্রসাদের যোগ। ''তুমি আছ/....কৃষকের সবুজ স্বপ্নে/ধান যেথা মাথা তুলে গান হয়ে জাগে।/চা মজুরের ঝুমুরের/মাদলে মাদলে/বাগিচার রক্তমাখা পাতায় পাতায়/ বিদ্রোহের কাঁপন তোলা/রুদ্রসঙ্গীতে।/ধনতন্ত্রী দুষ্কৃতির/ ধ্বংসকামী/তুমি আছ/সাম্যবাদী সংস্কৃতির/রক্তিম দিগন্তে।''

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে তাঁর অসমীয়া কাব্যগ্রন্থ 'কুলখুরার চোতাল''-এর উৎসর্গ পত্রে হেমাঙ্গ লিখেছিলেন : ''আসামের গণ-সংস্কৃতি আন্দোলনে আমার সাথী, অসমীয়া ভাষাসংস্কৃতির সবুজ প্রান্তরে আমার পথ-প্রদর্শক রূপকুমার জ্যোতিপ্রসাদকে''।

এতক্ষণ কথাশিল্পীর কথা হল। এবার দেখা যাক অন্য শিল্পের শিল্পীর কাছ থেকে হেমাঙ্গ কী শিল্পাদর্শ এবং শিল্পকর্ম আশা করতেন। এই বিষয়ে তাঁর 'মঘাই ওজার ঢোল' নামের অসমীয়া কবিতাটির বক্তব্য আমাদের সহায়ক হবে। মঘাই ওজাকে সম্বোধন করে কবি বলছেন ঃ ''দুর্গম পর্বতের চূড়ায়/মানুষের প্রথম ঘোষণা/ঢোলের চাপড়।''কবির ভাবটা বোধ হয় এই যে ঝড়, বজ্র, সমুদ্র ও শ্বাপদের গর্জন শুনে শুনে প্রকৃতির অহমিকায় বিরক্ত হয়ে মানুষের আত্ম-ঘোষণার প্রয়োজনে পর্বতচূড়া থেকে ঢোলের গুরুগম্ভীর ধ্বনি আকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ইতিহাসের আভাস দিয়ে কবি মঘাইকে জানিয়ে দিলেন, ''ওজা ভাই,/আজ আবার দরকার আরণ্যক ঢোলের আওয়াজ''। 'আরণ্যক' শব্দটির মধ্যে দিয়ে কবি যেন এক হিংস্র পরিবেশের বিরুদ্ধে অভিযানের আহ্বান জানাচ্ছেন। 'নিষ্ফলা মাটির কন্যার/গর্ভকোষ উদ্দীপিত ক'রে/বজ্রের গর্জনে আনো ঝটিকার তাল।/ভীষণ মধুর তোমার ঢোলের চাপড় ভীষণ মধুর।'' এ ঢোল শুধু 'মধুর' নয় 'ভীষণ'ও, কারণ এ ঢোল চিত্তবিনোদনের জন্যে নয়, উত্তেজনার জন্যে, এ ঢোল সংগ্রামের একটি হাতিয়ার। কবি ওজাকে বলছেন, ''নিঃসঙ্গতার মরুভূমিতে মুমূর্ষু/সমাজের মরা ঝরা পাতা/স্তূপকৃত আমাদের পথে/চারদিকে দুষ্কৃতির কংকাল সাধনা।'' সুতরাং মৃতের স্তূপ সরাবার জন্যে ''ঝড়ের ঝাঁটা লাগে,/লাগে আজ মাটিহীন চাষীর ঢোলের চাপড়'' অর্থাৎ সংগ্রাম ঘোষণা। ''লাগে লক্ষ জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে/আদিম আরণ্যক বাঘমারা...গীত।/ধিনিকি ধিন ধাও/ধিনিকি ধিন ধাও।''

তাহলে হেমাঙ্গর মতে মঘাই ওজার মতো বাদ্যযন্ত্রীর লক্ষ্য শুধু শৈল্পিক উৎকর্ষ নয় ভূমিহীন চাষীর জীবন-মরণ সংগ্রামে ঢোলকে সহযাত্রী করা— তাকে রণদামামায় পরিণত করা। মঘাই ওজার ঢোলের চাপড়ের মধ্যে দিয়ে চাষীদের সংগ্রামে সামিল হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে যে ''দুষ্কৃতির কংকাল সাধনা'' চলছে তার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সংস্কৃতির পতাকাকে তুলে ধরা। হেমাঙ্গ অন্যত্র বলেছেন, ''গণ-অভ্যুত্থানই গণ-শিল্পের আদি মাতা।'' 'জ্যোতি প্রপাত' কবিতাটিতে হেমাঙ্গ লিখেছিলেন জ্যোতিপ্রসাদ আছেন 'ধনতন্ত্রী দুষ্কৃতির ধ্বংসকামী' এবং তিনি আছেন 'সাম্যবাদী সংস্কৃতির রক্তিম দিগন্তে'। এখন মনে হচ্ছে কবির এই ''দুষ্কৃতি'' শব্দটির প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করিনি, সংস্কৃতি'র পাল্টা হিসেবে 'অপসংস্কৃতির' বদলে 'দুষ্কৃতি' তিনি বেছে নিয়েছেন। মনে হয় সংস্কৃতির শত্রুদের দুষ্কার্যের নিন্দায় 'দুষ্কৃতি' বেশী বেশী ব্যবহার করা উচিত— এতে দুটোর বিরোধ স্পষ্টতর হয়। 'দুষ্কৃতির কংকাল সাধনা'-র বিরুদ্ধে মঘাইকে নামাতে গিয়ে হেমাঙ্গর আন্তরিক ক্ষোভ তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দুষ্কৃতি-আন্দোলনের দুষ্কৃতিকারীরা কংকাল সাধনারই সাধক, জীবন সাধনার বদলে মরণ চর্চা, অধঃপতনের পথচর্চাই তাদের লক্ষ্য। অরেকটা জিনিস লক্ষ না করলেই নয়। মঘাইকে উদ্দেশ্য করে যে সংগ্রামের কথা কবি বলছেন সেখানে নরখাদক বাঘকে 'খাও হে ঘাস' বলে নিরামিষাশী করবার চেষ্টা নেই, আছে মেরে ফেলবার আহ্বান— ''লক্ষ জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে আদিম আরণ্যক বাঘ-মারা...গীত''।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সাহিত্যাদর্শ বোঝবার চেষ্টার পর এবারে তাঁর কবিতা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। রচনার কালানুক্রমিক আলোচনা বা কবি মনের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করার বাধা হচ্ছে এই যে বেশ কিছু কবিতার তারিখ এখনও পাওয়া যায়নি এবং সব কবিতা সংগ্রহ করতে আরও সময় লাগবে। কিছু নির্বাচিত কবিতার আলোচনাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। কাব্যগুণ আছে এমন কিছু গানও আলোচিত হয়েছে— কাব্য হিসাবে। অবশ্য রচনা-কালের পটভূমিতে তাদের স্থাপন করবার যথাসম্ভব চেষ্টা যে হয়েছে তা বলা বাহুল্য। তিনখানা বই

সংগৃহীত হয়েছে—'সীমান্ত প্রহরী' 'কুলখুরার চোতাল' (অসমীয়া কবিতার সংগ্রহ) এবং 'হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান' (নির্বাচিত সংকলন)। ১৯৪২-এর আগের কোনও তারিখ-যুক্ত কবিতা বা গান আমার হাতে এখন পর্যন্ত আসেনি। কাল অনুযায়ী সাজালে প্রথম কবিতা হয় 'ঝড়ের পাখী'। রোম্যান্টিক কবিতা। এক পাহাড়ী বর্ষাদিনের অভিজ্ঞতা। ঝড়ের পাখী এসেছিল আশ্রয় নিতে কবির কুটীরে। নিঃসঙ্গ কবিকে দেখে ভীরু সে অতিথি বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে গেল। কবি তার পেছনে গলার স্বরকে পাঠিয়ে বৃথাই তাকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি প্রেমিক নন, তিনি শুধু এক বংশীবাদক। পরবর্তী কালের কবিতায় যে শব্দচয়ন নৈপুণ্য দেখব এখানে তার আভাস পাই। প্রকৃতি-বর্ণনা অপূর্ব। যেমন ঃ "শিলঙের আকাশ/ভানুমতীর দেশ।/রোদের রূপার ঝারি থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে/ধোঁয়াটে মেঘের ময়দানব।" সরাসরি বর্ণনা না করে আভাসে ইঙ্গিতে এই রূপ সৃষ্টি। পাঠকের কল্পনাকে জাগিয়ে দিয়ে তাকেও বর্ণনার কাজে অংশীদার করে তোলার কৃতিত্ব কবির প্রাপ্য। এই সময়ের কয়েকটি গান কবির মনের আরেকটা দিককে প্রতিফলিত করে এবং সেই 'যুদ্ধং দেহি' দিকটাই পরে প্রধান হয়ে ওঠে এবং তাঁকে বিপ্লবী সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। বছরটা ১৯৪২। সারা দেশ উত্তাল। তারই সঙ্গে তাল রেখে কবি লিখলেন 'মুক্তি শিবিরে হাঁকে বিউগল"। তিনি দেশব্রতী সৈনিককে স্মরণ করিয়ে দেন "শিরে তব গুরু ভার ধরণীর"। বিষয়োপযোগী ভাষা ও ছন্দ আবেগে সঞ্জীবিত। ছন্দ যুদ্ধযাত্রী সৈনিকদের দৃপ্ত পদক্ষেপের অনুকারী। যেমন, "সর্বহারা আজ সেনাদল/শ্রমিকের পাঞ্জায় তলোয়ার/জনগণ নহে আর হীনবল/দুনিয়ার খুনীদল হুঁসিয়ার;/মুক্তির ফৌজ চলে টলমল/ প্রতিশোধ জ্বলে চোখে ঝলমল/শত্রুর সিঞ্চিত শোণিতে/রঞ্জিত কর ধূলি সরণির।..." নজরুলের কথা মনে করিয়ে দেয়। রচনার সাহিত্যিক গুণ লক্ষনীয়। এই সময়ের আরেকটি গানতো জগজ্জয়ী : 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান'। এ গানের আবেদন ভাষার কারুকাজে নয়, সংগ্রামিতায়। একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তাঁর এক ভক্তকে হেমাঙ্গ বলেছিলেন যে আমরা শুধু শহরেই কাস্তেতে শান দিলাম গ্রামে নয়। সংগ্রামী মনের দুঃখ এ কথায় ফুটে উঠেছে।

১৯৪৩-এ লেখা '২৫শে বৈশাখ— ১৩৫০'-র শব্দ প্রয়োগ কুশলতা, চিত্রকল্প ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও কবিতাটি খুব প্রথা-নির্ভর। আবেদন কম। কিন্তু কাছাকাছি সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা 'মা তুমি শীগগির ফিরে এস' বাংলা ও অসমীয়া সাহিত্যের (আসামের 'প্রবাহ' পত্রিকার সম্পাদক কবি কেশব মহন্ত কবিতাটি অসমীয়াতে অনুবাদ করেছিলেন) গর্বের বস্তু এবং যে কোনও সাহিত্যে এর স্থান খুব উঁচুতে। যে কাহিনী নিয়ে এই দীর্ঘ কবিতা তা বড়ো করুণ। পাহাড়ে শীত গিয়ে সবে বসন্ত এসেছে। কচিপাতা এবং ফুলের সমারোহ। কবির পাশের বাড়ির দিন মজুরনী খাসিয়া মেয়েটি কাজে বেরিয়ে গেল তার ছোট্ট শিশুকে চুমু খেয়ে। বাচ্চাটি কিন্তু ঠাকুমার কোল থেকে হাত নেড়ে নেড়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বলতে লাগলো ঃ 'মা তুমি শীগগির ফিরে এসো!" এই দৃশ্য এবং শিশুটির আকুতি কবির অতীত দিনের স্মৃতির দ্বার খুলে দিল। তাঁর মনে পড়ল আরেক বসন্তের কাহিনী। পাহাড়ের গায়ে তাঁর নির্জন কুটীরে তিনি রোগ শয্যায়। একটি মাঝ-বয়সী খাসিয়া মেয়ে কাঠ বিক্রি করতে এল। পরিচারক রণবাহাদুর হেঁকে বলল দরকার নেই। কবি কিন্তু গোটা কাঠের বোঝাটাই রেখে দিলেন। রণবাহাদুর বুঝল এটা বেচাকেনার ব্যাপার নয়। মনের লেনদেন। তার পরে প্রায়ই সে আসত। কবি তাকে ডাকতেন 'ইকং ইবন' অর্থাৎ 'ইবন্‌দি' বলে। ক্লান্ত পসারিনী অনেক গল্প করে, গান শোনায়। 'ভাষার দুর্বোধ্যতা/ভাবে সহজ হয়।" ঘরে তার ছোট্ট মেয়ে, কিছুতে ছাড়তে চায় না/ চোখের জলে বলে "মা তুমি শীগগির ফিরে এসো।" "হঠাৎ একদিন সাইরেন বেজে উঠলো!" বোমা পড়ার সম্ভাবনা। ইয়াঙ্কি গামবুটগুলো হৃৎকম্প সৃষ্টি করে। ইবন্‌দি বহুদিন আসে না। একদিন বলেছিল তাদের বস্তির পাশে মিলিটারি ছাউনি পড়েছে আর জানতে চেয়েছিল যুদ্ধ কী। কবির এক দিন এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরতে দেরী হয়ে গেল। সন্ধ্যা। একটা মাঠ পেরিয়ে একটা গলি ধরে এগুতে গিয়ে কবি হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে টর্চের আলো ফেলতেই দেখেন ইয়াঙ্কি অজগর ইবন্‌দিকে জড়িয়ে আছে। সে রাতে ঘুম হয়নি কবির আর ঘুম হয়নি ইবনের ছোট্ট মেয়েটির। সে থেকে থেকে কেঁদে উঠছিল— 'মা তুমি শীগগির ফিরে এসো।"

মৃত্যুর চেয়েও মর্মান্তিক এই বেদনার গাথাটি রচনা করতে গিয়ে কবি যেন তাঁর সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিয়েছেন। ইংরেজ কবি টমাস গ্রেই যেমন তাঁর একটি কবিতা 'এলিজি' হাতে নিয়ে বিশ্বের সম্মান দাবি করতে পারেন, হেমাঙ্গ বিশ্বাসও তেমনি এই একটি কবিতার জোরে বিশ্ব কবি সভায় সম্মানের আসন পেতে পারেন। এটাও এক ধরনের 'এলিজি' বা 'শোক-গাথা'।

তাঁর কবিকৃতির একটু বিশ্লেষণ করা যাক। কবিতাটির শুরুতে পরিবেশ রচনা করতে গিয়ে তিনি কঠোর বাস্তববাদী শিল্প-রীতির আশ্রয় নেননি, আমাদের কল্পনাকে নাড়া দিতে চেয়েছেন ঃ "পাইন বনে শীত ভালুকের/গা-কাঁপুনি-গোঁ গোঁ থেমে গেছে; চিকন পাতার তারে বেজে উঠেছে স্প্যানিশ গিটার।" এই প্রকৃতি চিত্রণের আবেদন আমাদের একাধিক ইন্দ্রিয়ের কাছে পৌঁছয়। এর পরের বর্ণনার ধারাও একই : "বৈরাগ্যের বরফে ঢাকা/নগরীর কুমারী বুকে/পুষ্পধেনু শর হেনেছে।/...এপ্রিল সকালে সোনালী রোদের ঢল নেমেছে।"

প্রতিবেশী খাসিয়া দিন-মজুরনী মেয়েটি যখন মেয়ের 'মা তুমি শীগগির ফিরে এসো" এই আকুতি বুকে বয়ে কাজে বার হয় তখন কবি আমাদের ডেকে বলেন : "এ আকুতি ছড়িয়ে

আছে/এই পাহাড়ে অনেক ঝরণার বুকে,/নিঃশব্দ পাথরে আর/ফুলঝরা হাইড্রেঞ্জিয়ার ডালে।'' তখন বুঝি যে তিনি ব্যথার এক আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির ভূমিকা করছেন কারণ তা না হলে ব্যথাকে এমন সর্বব্যাপী রূপ দিতেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সীমিত উপস্থিতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তুলির দুয়েকটি সংযত পোঁচে। ''বিধ্বস্ত রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর যায় যায়—সীমান্ত চঞ্চল।''

এখানে ভূমিকা শেষ। এবারে নায়িকার প্রবেশ। রোম্যান্টিকতায় ভরা আশ্চর্য সুন্দর সে চিত্র। ''রোগশয্যায় আমি।/দুপুরের পাতলা ঘুমের পর্দা কাঁপিয়ে/বেজে উঠলো একটি করুণ সুর/এ বাবু কাডিয়েং—/খাসিয়া মেয়ের ডাক।'' সে কাঠ বিক্রি করতে এসেছে কিন্তু তার ডাক এমন মিষ্টি যে 'বিক্রীর বিজ্ঞাপন নয়/যেন বন-ভোমরার গুঞ্জরণ।' প্রথম আবির্ভাবেই নায়িকা আমাদের আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। আমাদের কানে তার 'গুঞ্জরণ' আর চোখে তার 'সৌন্দর্যের সলজ্জ আভা'।

এর পরের ঘটনা— পরিচারক বলল কাঠ দরকার নেই, অনেক আছে। কিন্তু বাবু সব কাঠ রেখে দিলেন। এখানে অল্প একটু হাস্যরসের অবতারণা কবিতাটিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তারই সম্প্রসারণ ঃ ''রণবাহাদুর, মঙ্গোলীয় মিট্‌মিট্‌ চোখে/মুচকিয়ে হাসে—/নীরস জ্বালানী কাঠের গূঢ় সরসতায়।'' শেষ লাইনটির জুড়ি পাওয়া ভার।

দিন চলে। ''এমনি কতো দিন/ নিঝুম তন্দ্রালু দুপুরে/মিহি ঘুমের দেশে/দূর পাহাড়ের একটি বন-ভোমরা/গুনগুনিয়ে আসত।'' অনায়াস অনুপ্রাসে ঘুমের পরিবেশ রচনা করে যেন ঝিমুনি ধরিয়ে দেন কবি। তারপর অপূর্ব প্রযোজনা ঃ প্রয়োজনের বেচা-কেনার হাটে/অপ্রয়োজনের ঘনিষ্ঠতা জমে ওঠে/চড়াই-উৎরাই ভাঙা ক্লান্ত পসারিনীর/ছায়া-বৃক্ষ যেন।'' এই ছায়া-তরু হচ্ছে 'ঘনিষ্ঠতা'। পাহাড়ী কাহিনীতে কবির কথা পাহাড়ী ঝর্ণার মতো নিজের বেগে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে চলেছে : ''ইবন্‌দি হাসে, গল্প করে;/ভাষার দুর্বোধ্যতা/ভাবে সহজ হয়।'' রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কবি এখানে যেন রবীন্দ্রনাথের বাগৈশ্বর্যের উত্তরাধিকারী! কাব্য মিতবাক্‌ অথচ ব্যঞ্জনাময়।

অনেক অনুরোধে ইবন্‌ একদিন গান গায়। গানের বিষয় হচ্ছে শিকারীর তীরে মরে যাওয়া এক শিশু হরিণের জন্যে মা হরিণের বিলাপ। ইবনের এই গান দিয়ে কবি এক সুরলোক তৈরী করছেন যা নখদংষ্ট্রাকরাল নরপশুর তাণ্ডবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। তিনি সৃষ্টি করছেন এক সুরসঙ্গম। এক দিকে ইবনের গান, আরেক দিকে নুড়ির তালে তাল রেখে উমখ্রা নদীর ঝিরি ঝিরি, দূরে একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক।

এই সুরের জগতের ওপর অসুরের প্রথম আঘাত— আকস্মিক সাইরেন। সঙ্গে সঙ্গে বোমার আতঙ্ক। বর্ণনায় করুণ ও হাস্যরসের সহাবস্থান : ''পালাবার পথ রুদ্ধ পলাতকের ভিড়ে।'' এরপর কাব্যের প্রয়োজনে করুণ রস ক্রমবর্দ্ধমান। ''অবরুদ্ধ নগরী/রুদ্ধশ্বাস প্রহর গোনে।'' রুদ্ধ নগরীর নৈঃশব্দ ভেদ করে 'উদ্ধত ইয়াঙ্কি বুটগুলি'', তারা ''পাহাড়পুরীর হৃৎপিণ্ড দুমড়িয়ে যায়।'' মানববিদ্বেষী দৈত্যদানবের উপযুক্ত বর্ণনা। আরেক দিকে দুপুরের নিভৃত আলাপের সুরের ধারায় ছেদ পড়েছে। ''বহুদিন ইবন্‌দি আসে না।'' একদিন এসে বলে গিয়েছিল যে তাদের বস্তির পাশে মিলিটারির ছাউনি পড়েছে। চোখে তার ভয়। জানতে চেয়েছিল যুদ্ধ কী।

এবারে কবিতাটি তার চরম পরিণতির প্রান্তে পৌঁছেছে। কবির চোখ মিলিটারির ওপর। আমাদের চোখও তিনি সেই দিকে ফেরাতে বলছেন। 'পানাসক্ত 'কারফিউ'র শিলং।/'আউট অব বাউন্ডস'-এর/সীমানা ডিঙিয়ে/হায়েনাদের সন্ধানী চোখ/আঁধারে ঝলসে ওঠে, ঝোপে ঝাড়ে।'' সুন্দর বর্ণনা। কিন্তু সুন্দরতর বর্ণনা হচ্ছে ঃ ''নাথুমাই এর মাঠে/লজ্জায় জোনাকিও আসে না।/শুধু কামাতুর সিগারেটগুলি/জোনাকির মত জ্বলে আর নিভে।'' বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এই লাইনগুলোর শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবিতার সম্মান প্রাপ্য। নাথুমাই-এর মাঠে সন্ধ্যার অন্ধকারে নিপীড়িতাদের চরম অসম্মানের দৃশ্যের ওপর আলো ফেলতে জোনাকীরাও লজ্জা বোধ করে। সেখানে তাদের স্থান নিয়েছে কামাতুর ইয়াঙ্কিদের সিগারেটগুলো। অর্থাৎ এবারে আমরা এক নারকীয় পরিবেশে এসে পড়েছি। থমথমে আবহাওয়ায় অপেক্ষা করছি ভয়ংকরের আবির্ভাবের জন্য।

অন্ধকার পথের যাত্রী কবি হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে টর্চের আলো ফেললেন। বীভৎস দৃশ্য! ''একটা প্রকাণ্ড অজগর/কুণ্ডলী পাকিয়ে জড়িয়ে ধরেছে/কোন হরিণ-মাতাকে?'' এখানেও সত্যের আভাসিত রূপ। তার পরেই প্রত্যক্ষ বাস্তব : ''খোলাবুক জার্কিনপরা/লোমশ মার্কিনীর/বাহুবেষ্টনীতে পিষ্ট কে সে?/ইবন্‌দি না?''

সে রাত্রে ''ভয়ে ভয়ে চাঁদ উঠেছিল''। কী দৃশ্য দেখবে— এই ভয়ে। ''সারারাত জেগেছিলাম আমি।'' আর জেগেছিল খাসিয়া বস্তিতে ইবন্‌দির ছোট্ট মেয়েটি—''থেকে থেকে কেঁদে উঠেছিল—/....মা, তুমি শীগগির ফিরে এসো।'' এটা শুধু বিষাদের কবিতা নয়, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানবদরদী কবির বলিষ্ঠ প্রতিবাদ অথচ একই সঙ্গে অনবদ্য কাব্য। তবু বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে এর প্রচার সীমিত, আবৃত্তির আসরে এ কবিতা প্রায় অনুপস্থিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় এর স্থান নেই।

এই প্রসঙ্গে যুদ্ধের সময়ে, ১৯৪৪ এ, লেখা 'তোরা বল সখী বল' গানটির উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। কারণ যুদ্ধের বাজারে পণ্য-নারীর বেদনায় গানটি মুখর। ভাষা সুললিত ও সাবলীল। কল্পনার পটে অনেক সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তোলে। গানটির একটা দুর্বলতা হচ্ছে পেছনে ফেলে আসা পল্লীজীবনের অবাস্তব অতিরঞ্জিত সুখের চিত্র রচনা। রবীন্দ্রনাথের 'বুক ভরা মধু বঙ্গের বধূ'কেও কবি এখানে উপস্থিত করেছেন অগ্রজ কবির

অতিরঞ্জনের পথ অনুসরণ করে। ''ছিল ছায়ায় ঢাকা, পাখি ডাকা মায়ায় ঘেরা ঘর/...ছিল বাংলাবধূ বুকে মধু, অমৃতের খনি/আঁধার ঘর উজল করা নীলকান্ত মণি/...''। ১৯৪৪ এ লেখা 'ঘোর তমসা ভেদি' গানটিতে কাব্যগুণ কম।

এরপর উল্লেখযোগ্য হল ছেচল্লিশের 'ভূস্বর্গ চঞ্চল' ও 'সগরল' কবিতা দুটি। এরা 'সীমান্ত প্রহরী' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। 'ভুস্বর্গ চঞ্চল' উচ্চাঙ্গের কবিতা হিসেবে প্রচারযোগ্য। একটি প্রেমের কবিতার দুটি স্তবকে দুই কাশ্মীরের কাব্যময় রূপ আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম অংশে বিলাসীর লীলাক্ষেত্র কাশ্মীরের সাবেকী রূপ। ফুলে ভরা হ্রদের জলে নৌকাবিলাস। পাশে প্রণয়িনী। দূরে পর্বতশ্রেণী। দ্বিতীয় অংশ বিদ্রোহে ফেটে পড়া কাশ্মীর। কাশ্মীরের রূপ বর্ণনার সঙ্গে প্রেমের কাহিনী সূক্ষ্ম সূতোয় বোনা— সবটা মিলে অসাধারণ এক কার্পেটের কাজ। পাকা হাতে আঁকা ছবির মেলা : ''লক্ষ তারার চুমকি বসানো সন্ধ্যাবধূর নীলাম্বরী/সহসা কাঁপিয়ে এক ঝাঁক হাঁস বনান্তে হল দেশান্তরী।'' এর চেয়ে বেশী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চমকপ্রদ রূপ-কল্পনা হচ্ছে : 'দাঁড় টানি আমি ঢেউ ভেঙ্গে যায়/ঢেউ তোলা ঐ দেহ-সীমানায়/...নিবিড় চোখের নীহারিকা টলমল/কতবার দুটি কৃষ্ণ বেণীতে কুন্তল চঞ্চল/শত চাঁদ ভাঙা কাজল হ্রদের বাঁকা ঢেউ গেল চুমি'/ পদ্ম বনের হংস মিথুন আমি ও তুমি।'' লক্ষ করতে হবে যে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কবিতা আধুনিক কবিতার সগোত্র হয়েও রুচির শৈথিল্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রকৃত প্রগতির কবির এটা একটা বড়ো লক্ষণ।

বিদ্রোহে কাশ্মীরে যে পরিবর্তন এলো তা নিয়ে কবি শব্দের ভিড় ও কোলাহল সৃষ্টি করেন নি মোটেই। এরকম সংযম বিরল। কিন্তু শান্ত ভাবে এবং সংক্ষেপের সব কথাই প্রায় বলা হয়েছে। ''ডোগরার ঐ স্বর্গের ভিত ছিল কি মেয়ে/ক্ষুধিত পাষাণে গাঁথা?'' ক্ষুধিত জনতার কংকালের স্তূপই তো ছিল ডোগরা রাজের সুখস্বর্গের ভিত। আলোড়নের অপূর্ব কাব্যময় ছবি এঁকেছেন এখানে : ''পাথর-গলানো আগ্নেয়গিরি চিরতুষারের বক্ষে ধরালো চিড়/দেবদারুবন বুক দুরু দুরু শালবন অস্থির/ঘুর্নিঝড়ের বেগে।'' প্রেমিক বিদ্রোহ দেখে পলাতক হচ্ছে না। ''স্বর্ণগোধুলি নেমে এল বুঝি মেয়ে?/...আমাকে ভুলো না আমি আজ হব অগ্নিখেলার সাথী।/...নীলকমলের লীলা নয় আর নব অনুরাগে মোড়া/আমারে পাঠিও রক্তে রঙীন লাল পদ্মের তোড়া।''

'সগরল' কবিতাটিতে আদিম মানুষের প্রাথমিক অসহায়তার পর বিঘ্নজয়ের কথা আছে। সেই সঙ্গে আছে এই আশার কথা যে সর্বহারাকে সর্বস্বহারা অকিঞ্চন মনে করা ভুল হবে কারণ সেই হবে ভবিষ্যতের মানুষ— সর্ববিঘ্নজয়ী। স্বভাবতই আগ্রহ নিয়ে ঐ একই কাব্যগ্রন্থে 'সুকান্ত স্মরণে' পড়তে গেলাম। স্মারক কবিতা হবে উদ্দীপক, আবেগ-জাগানো। কিন্তু প্রথাবদ্ধ হয়ে আবেগ হয়েছে ক্ষীণ।

ওঁর গানের সংকলন থেকে মনে হয় ছেচল্লিশে গানের জোয়ার এসেছিল। খাঁটি আবেগের প্রাবল্যে ও শিল্পীর কথা সাজানোর দক্ষতায় এ গান গুলোতে বেশ কিছু ঝলমলে লাইন মনকে টানে। তাদের কাব্যগুণ অবিসংবাদিত। ''খুন দরিয়ায় আইলরে ঢল, জীবন জোয়ারে/ তোর মরণ কিসের, আজ বাঁচনের বিরাট খেলা/সবহারাদের ঘাটে ঘাটে সব পেয়েছির মেলারে— /আজ বাঁচনের বিরাট খেলা/ তোর ধলা পালে মনপায়রার পাখনা মেলে দে....'' ('লঙ্গর ছাড়িয়া নাও এর দে')। ''মহানগরীর রাজপথে যত রক্তের স্বাক্ষর,/অগ্নিশিখায় অঙ্কিত হল লক্ষ বুকের পর/''...('ভুলবো না, ভুলবো না, ভুলবো না')। ''মাটির ছেলে হবে খাঁটি মাটির মালিকানরে/...তারা নিজে মরে মরার দেশে আনলো প্রাণের বান/...'' ('তোর মরা গাঙে আইল এবার বান')। ''রক্ত-সায়রে ফোটে জীবন কমল/ঘাতকের হল পরাজয়।'' ('তব মৃত্যু এনেছে বরাভয়')

১৯৪৯-এ লেখা স্তালিন প্রশস্তি এখানে উল্লেখযোগ্য। সুকান্তর লেনিন প্রশস্তি তার প্রাপ্য পেয়েছে কিন্তু হেমাঙ্গর 'অগ্নি-ঈগল' উপেক্ষিত। ভাষা একটু ধ্রুপদী কিন্তু যথোপযুক্ত প্রয়োগে ভাস্বর। ''উরাল চুড়ায় বসে আছে এক অগ্নি-ঈগল অচঞ্চল/বিশ্বপ্রহরী চির অতন্দ্র শুকতারা চোখ কী উজ্জ্বল!/...ইস্পাতে গাঁথা পালকে পালকে ইতিহাস করে গুঞ্জরণ/মাটির পৃথিবী বাঁধে তার নীড় দেশে দেশে তার আমন্ত্রণ। ...এ পাখার দোলা প্রাণের শাখায় চিরবসন্তে ফুল ফোটায়।' কবির সমাসগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেমন, 'রণজীবী', 'সাগর-প্রবাহী', 'অগ্নি-অঙ্গ'। অন্যত্র আছে : 'অগ্নিখেলার সাথী' 'স্ফুলিঙ্গ প্রস্তুতি', 'নাপাম-হিংস্রতা' ইত্যাদি। এই কবিতাটিতে সাম্রাজ্যবাদীদের মৃগয়াক্ষেত্রকে কবি চমৎকার নাম দিয়েছেন— 'হত্যার উপনিবেশ'। ইতিহাসের কাব্যিক পরিক্রমায়, ছন্দবিন্যাসে, শ্লোক-রচনায় ও চিত্রকল্পে কবিতাটি চিত্তাকর্ষক। স্তালিনের সৃজনশীল ও ফ্যাসি-বিরোধী দুটি রূপই এখানে উজ্জ্বল রঙে আঁকা হয়েছে।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ব্যঙ্গাত্মক লেখার স্বল্পতা আমাদের ব্যথিত করে। ব্যঙ্গ রচনায় যে তাঁর আশ্চর্য হাত ছিল তার প্রমাণ দুটি গান : 'আজব দেশের আজব লীলা' এবং 'মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য'। প্রথমটি যেন দ্বিতীয়টির প্রস্তুতি। সরষের তেলের সমস্যা নতুন নয়, ১৯৪৭-এ কবি প্রথম গানটিতে লিখেছিলেন ''হৈরর তেল কোন দেশে গেল খবর জাননি?'' দিল্লীতে বাদশাহী নাচ। অনেক তেল দরকার। রাজাকে খুশী করতে নেতারা ছুটছেন। নতুন এই রাধার ''এক হাতেতে বাঁশী আর আর হাতেতে অসি/বাঁশীর টানে নেতাগণে লাগায় প্রেমের ফাঁসি/মুখে কিবা মধুর হাসি/মরি হায় হায়/হায় হায় রে/আর হাতেতে অসির টানে গরীব দুঃখীর কোরবানী। ফেরেঙ্গীর খেল শেষ হইল না আরেক

নতুন ঢং/বিলাত থনে আইলা উড়ি তিন বিলাতী সঙ/.. . নয়াদিল্লীর বৃন্দাবনে যত কলির গোপিনী/ কদমতলায় নতুন খেলায় জুটিলা তখনি/...নয়া পীরিতে মন ভাঙ্গাইতে তেলের হইল টানাটানি।'' অনেক চেষ্টায় স্বরাজের গাড়ী তৈরী হল: ''স্বরাজের গাড়ি তৈয়ার হৈল জুড়িল বলদ/চাককাতো চলে না চাচা বিসমিল্লায় গলদ/আরে হায় কি আপদ/মরি হায় হায় হায় হায় রে/গাড়োয়ান যত তেল ঢালে ততই চাকার কেচকেচানি।'' শেষটা আরও সুন্দর : ''তেলের কিচ্ছা হুনলায় এখন নাকো তেলদি ঘুমাও/হৈরর তেলের লাগি কেনে কেচমেচি লাগাও/মিছা সরকাররে দগ্‌ধাও/মরি হায় হায় হায় হায় রে/তোমরা হইলায় স্বরাজের বলদ চোখ বুজিয়া টান ঘানি।''

''কাস্তেটারে দিয়ো জোরে শান'' বলতেই যেমন হেমাঙ্গ বিশ্বাস তেমনি 'মাউন্টব্যাটনে মঙ্গলকাব্য' বলতেও হেমাঙ্গ বিশ্বাস। সফল ব্যঙ্গ-কাব্য কী তা বুঝেছিলাম গানটা যে সময়ের লেখা তখনকার এক জনসভায়। রাত্রি শুরু হয়েছে। গড়ের মাঠে লাখ দুয়েক লোক। মঙ্গলকাব্য গাইছেন সাধন গুপ্ত। সে অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয়। এ ধরনের ব্যঙ্গ-কাব্যের সফলতার প্রমাণ তার সহজবোধ্যতা এবং অট্টহাস্যে তার সম্বর্দ্ধনায়। গান শুরু হল। মাউন্টব্যাটেন তাঁর সাধের ব্যাটন কার হাতে দিয়ে গেলেন— এ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল উঠল। যখন গায়ক গাইলেন, ''সর্দার কান্দে, পণ্ডিত কান্দে, কান্দে মৌলানায়'' তখন হাসির জোয়ার প্রবল থেকে প্রবলতর হল আর 'বলদায় বুক থাপড়ায়' শুনে জনতার হাসি তো মাঠের অন্ধকার আকাশে জোয়ার বওয়ালই, হাততালির যেন ঊর্ধ্বাকাশকেও চমকে দিল। বলদেও সিং-এর দুর্গতিতে সবার মহা উল্লাস। এর পর এল রাজাগোপালাচারির পালা— ''আইলা গান্ধীভস্ম তিলক মাথায়/ধুতি চাদর গায়।'' আবার আকাশ কাঁপানো হাসি। যখন গায়ক গাইলেন : ''ক্লাইভ কার্জনের বংশে বাতি বামুনে জ্বালায়/মরি হায় হায় রে/বামুনের খুশী মন, হাপুস নয়ন/তোমার লেডির গাউন কান্দিয়া ভাসায়।'' আনন্দাশ্রু। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! কবি বৈচিত্র্যের জন্যে কীর্তনের সুর ছেড়ে পাঁচালী ছন্দে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। শ্রোতাদের আনন্দ তাতে নিবিড়তর। তারপর হঠাৎ রামধুনের ব্যঙ্গরূপ : ''রঘুপতি রাঘব মাউন্টব্যাটন।/জয় জয় রঘুপতি রাঘব মাউন্টব্যাটন।/টাটা বিড়লা তেরে নাম/...মজুর কিষাণ হ্যায় নিমক হারাম/মুঝকো মুনাফা দে ভগবান।'' এতক্ষণ জনতা হাসতে হাসতে চীৎকৃত প্রশংসায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবু পার্টিশনের কেচ্ছা শুনে আনন্দে বিষাদে মেশা হাসিতে ফেটে পড়ল : ''হিন্দুস্তানে শ্বশুরবাড়ি পাকিস্তানে ঘর/মধ্যিখানে ভূতের ময়দান বউ যে হইল পর।'' সভা শেষ হল রামধুন দিয়ে : ''এবার দেশবাসীগণ গাও স্বরাজ ভজন/রঘুপতি রাঘব মাউন্টব্যাটন।'' উচ্ছ্বসিত হাসিতে অভিনন্দিত হলেন রচয়িতা। বছরটা ১৯৪৮। এ বছরের 'বাঁচবোরে বাঁচবো' গানটিতে সুভাষিত কুড়োতে যেতে পারি, যেমন, ''ভাঙাবুকের পাঁজর দিয়া/নয়া বাংলা গড়বো।'' ভাষা-শহীদের শ্রদ্ধার্ঘ হিসেবে লেখা 'ঢাকার ডাক' (১৯৫২) গানটিতে দুটি আশ্চর্য কাব্যময় লাইন আছে ঃ ''শহীদ স্তম্ভ ভাঙে কারা সাধ্য আছে কার/মোদের সিনায় সিনায় ওঠে শহীদের মিনার।''

তিপ্পান্নর ফসলের মধ্যে 'সীমান্ত প্রহরী' সংকলনটিতে তিনটি ছোটো কবিতা আছে— ভারি সুন্দর : 'কোরিয়া', 'চিঠির জবাব', 'খোয়াই'।

কোরীয় যুদ্ধবন্দীদের গান গাওয়া বন্ধ করবার জন্যে মার্কিন সৈন্যরা গুলি চালিয়েছিল। তাই কবির প্রতিবাদ : ''সঙ্গীতকে ওরা সঙ্গীনে বিঁধবে?/ গোলাপকে গুলিতে ঝরাবে?/ হাসিকে ঝোলাবে ফাঁসির রশিতে?/কাঁটাতার দিয়ে বাঁধবে গিটারকে?'' অনুপ্রাসের সহজ সুন্দর মিছিল অথচ করুণ কথাগুলো করুণতর হচ্ছে। সর্বাঙ্গসুন্দর কবিতাটি যেন এক টুকরো হীরে। অমনি আরেকটি টুকরো হচ্ছে 'চিঠির জবাব'। কবির বক্তব্য হল তিনি ছিলেন রোমান্টিক— ''লাল চেলী নয়/নীলাম্বরীর সাথেই ছিল/মনটার গাঁটছড়া বাঁধা।'' কিন্তু আজ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তিনি 'লাল মাতাল'। নিদারুণ দুঃখের অভিঘাতেই তিনি লালকে তাঁর বাঞ্ছিত রঙ বলে গ্রহণ করেছেন। তৃতীয় হীরের টুকরো হচ্ছে 'খোয়াই'। মনে ঝিলিক জাগে যখন পড়ি ''তোমার কূলকে ভালোবেসেই তো/কূলছাড়া আমি/যদি শোন কোনোদিন 'কলঙে'র পারে/বিহুতলীর নাচে আমি আনন্দ উদ্দাম/ আমাকে ভুল বুঝোনা, সখি/কণ্ঠে আমার বসন্ত-বিহু/বুকে মূর্চ্ছিতা বিরহিনী ভাটিয়ালী/ব্রহ্মপুত্র আমার বিস্ময়/পদ্মা আমার শ্রদ্ধা,/গঙ্গা আমার স্মৃতি[১]/তুমি আমার ভালোবাসা—/খোয়াই''।

লম্বা পাড়ি দিয়ে ''সুদূর সমুদ্দুর প্রশান্তের বুকে'' পৌঁছে গেলাম সংক্ষেপ করার তাগিদ পেয়ে। উদ্ধৃত কথাগুলো হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বিখ্যাত গান 'শঙ্খচিল' থেকে। কাব্যগুণে সমৃদ্ধ গানটির শুরু অপূর্ব রোমান্টিকতায়। কল্পনা-জাগানো ছবির পর ছবি সাজানো। রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' মনে পড়ে। ছন্দের ঝংকারে মন আনন্দে মূর্চ্ছা যায়। জেগে ওঠে অ্যাটম বোমার দানবীয় হুংকার, ধ্বংসের বিভীষিকার মধ্যে। কিন্তু প্রগতির নিরিখে ধ্বংসই শেষ নয়, শুধু বেদনাই সত্য নয়, তাই কবি-কণ্ঠে ধ্বনিত হয় প্রতিশোধের অঙ্গীকার : 'রক্তে আদায় করি রক্তের ঋণ'। এ হীরের টুকরো নয়, সাত রাজার ধন এক মাণিক!

১ 'সীমান্ত প্রহরী'-র প্রথম সংস্করণে 'স্মৃতি'-র বদলে 'ভক্তি' কথাটা রয়েছে। হেমাঙ্গবাবু পরবর্তী সংস্করণের জন্য নিজের হাতে 'ভক্তি'-র বদলে 'স্মৃতি' লিখে রেখেছেন। সম্ভবত 'গঙ্গা'-র পাশে 'ভক্তি' কথাটা একটা ধর্মীয় অনুষঙ্গ সৃষ্টি করে। তাই এই পরিবর্তন। —লেখক

গোড়ার দিকে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অসমীয়া কবিতা কিছুটা আলোচিত হয়েছে। যে কবিতাগুলোতে তাঁর সাহিত্যাদর্শ ফুটে উঠেছে সেগুলো নিয়েই কিছুটা লিখেছি। সেই রকমের আরেকটি কবিতা হচ্ছে 'এটি ন-রোম্যান্টিক কবিতা'' (একটি নয়া-রোম্যান্টিক কবিতা)। কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রেম। এক মহিলা কবিকে প্রশ্ন করলেন : ''আপনার কাব্যমন্দিরে প্রেম কি হরিজন?'' অর্থাৎ গোঁড়া হিন্দু মন্দিরে যেমন হরিজনদের প্রবেশ নিষিদ্ধ তেমনি তাঁর প্রোলিটারিয় কাব্যে প্রেমের অবতারণা কি নিষিদ্ধ? মহিলা প্রশ্নটি করেছিলেন তাঁর লাল ঠোঁটের হাসি মাখিয়ে— পুরোনো দিনের উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীর তীরে নয়, আজকের শিলঙের ওয়ার্ড লেকে সন্ধ্যার ম্লান আলোয়। এই মহিলা, এই নায়িকা, রোম্যান্টিক। তাঁর 'বার্ডনেস্ট' খোঁপায় প্লাস্টিকের পায়রা। তিনি অজন্তা ইলোরার নন, যেন বেরিয়ে এসেছেন কোনও আধুনিক কাব্যগ্রন্থের এক রোম্যান্টিক কবিতা থেকে। কবির চোখে তিনি 'নাইলন উর্বশী'। হঠাৎ জীবনের ছন্দ গেল কেটে। নাইলন সুন্দরীর নতুন পরিচয় ফুটে উঠল। কবি লিখছেন : ''সেদিন তোমার দেখা পেলাম/ক্ষুধিত জনতার সারিতে/রাজধানীর ধুলি-ঝড়ে/বিক্ষুব্ধ শোভাযাত্রার বলিষ্ঠ নায়িকা/তেজোদ্দীপ্ত মুখ নাগাদের বল্লমের মতো/মুক্ত খোঁপার চুল এলোমেলো/কপালে আগুনের ফোঁটা।/কে বলে/এ নিজেকে ডুবিয়ে দেয় সন্ধ্যার শিলঙে?/চেয়ে দেখ, উইলো চোখের জল ফেলছে/শহীদের রক্তে মেশা লেকের জলে''। কবির শেষ কথা হচ্ছে : আমার কাব্যে কোন্ প্রেম স্থান পাবে, সন্ধ্যাবিলাসিনীর প্রেম না বিপ্লবী নায়িকার প্রতি প্রেম যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ক্ষুধিত জনতার প্রতি প্রেম। ন্যাকামির ন্যক্কারমুক্ত প্রেমের কবিতা লিখেছেন বলেই হেমাঙ্গ এখানে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী কবি। নাটকীয় আরম্ভ, রোম্যান্টিক আবেষ্টন রচনা, অতীত স্মৃতির রোমন্থনে মুহূর্তের কল্পনা-বিহার, নায়িকার নাটকীয় রূপান্তর, মিছিলের সংক্ষিপ্ত অথচ বাস্তবোজ্জ্বল রূপ, বিশেষ করে নায়িকার যোদ্ধ-বেশ কবিতাটিকে সুন্দর করেছে। পরিসর অল্প কিন্তু ঐশ্বর্য অল্প নয়।

এমনি সমাজ-সচেতন আরেকটি কবিতা 'ওভতনি' (অর্থাৎ 'ফিরে আসা')। আসলে 'মা তুমি শীগগির ফিরে এস' কবিতাটির মতো এই কবিতার মূল বিষয় 'ফিরে না-আসা'। গরীব ঘরের দুঃখিনী মায়ের মনের ভাষার মতোই এই কবিতার ভাষা সহজ সরল। আরম্ভ এই রকম : ''ছেলেটা ফিরে এল না।/মাত্র দু'কেজির পিপাসা নিয়ে/গুলি খেয়ে শূন্য থলে হাতে/কাদা মেখে পড়ে আছে নর্দমার ধারে।'' এদিকে বাড়িতে উপবাসী মা উদাস দৃষ্টিতে পথ চেয়ে বসে আছেন। সে ফিরবে। সেদিন খানিকটা বৃষ্টি হওয়ায় রাজপথের রক্তের দাগ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে। ''গোবরা গোরস্থানে/বিমর্ষ মাদারের কাঁটায় কাঁটায়/ থোকা থোকা রক্ত/ফুল হয়ে ফুটল/ঐ যে বসন্ত এল।/রাঙা নিশানের দোল/দূরে মিছিলের আওয়াজ।'' শুনে মা বেরিয়ে এলেন, বললেন, ''সে আসছে।'' কথাগুলো করুণ শোনালেও বলিষ্ঠ আশাবাদের দ্যোতক। পুলিশের গুলিতে মরা ছেলের মা-বাবার সান্ত্বনা কী? জনতার প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ। এই দৃষ্টিভঙ্গীই কবিতাটিকে প্রগতির আসরে নিশ্চিত আসন দেবে। আরেকটা কথা। জনগণের জন্যে কবিতা এরকম সহজ ভাষাতেই লেখা উচিত। কি ভাষা! —''কেবল দু'কেজির পিপাসা নিয়ে''— 'পিপাসা'-র কি চমৎকার প্রয়োগ। ''কাদা মেখে পড়ে আছে নর্দমার ধারে—'' এই আটপৌরে ভাষায় করুণ রসের সৃষ্টি হল না কি? এ সহজের সাধনায় প্রগতির সব কবিই এখনও অনেক পিছিয়ে।

'নাম তার রত্নেশ্বর রাভা' অন্য স্তরের ভাষার কবিতা— বিদগ্ধদের পক্ষে এর রসগ্রহণ সহজ। তবে বক্তব্য অত্যাচার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের পক্ষে।

আসামের যিনি শুধু বামপন্থী নেতাই নন, যাঁর বহুমুখী প্রতিভার সহস্র অবদানে আসামের জনজীবন নবজাগরণের স্বাদ পেয়েছিল সেই রত্নেশ্বর রাভার নামাঙ্কিত কবিতাটি অবশ্যপাঠ্য এবং প্রশংসনীয়। এই সংগ্রামী মনীষীকে তুলনা করা হয়েছে এক বিরাট শাল গাছের সঙ্গে। অনেক ঝড়, কালবৈশাখী, অজস্র বজ্রপাত ও ভূমিকম্প এই বনস্পতিকে ঝাঁকানি দিয়ে বিরক্ত করে চলে গেছে। তথাপি নড়ল না দৃপ্ত শান্ত দিগন্তপ্রসারী সেই শালগাছটি। ''যুগের বিস্ময়/এক কাঠা আদিম মাটি/পৈতৃক সম্পত্তি/অন্ধকারে জোনাকীর আলোতে উজ্জ্বল পাথরের কুটীর।/প্রাগৈতিহাসিক কোনো অরণ্যের জন্ম নিয়ে কুড়ি শতকের এই নীল আকাশের দিকে প্রসারিত করে আছে অগণন পাতার আমন্ত্রণপত্র।'' দুচার কথায় আমাদের হঠাৎ সুদূর অতীতের বনভূমিতে নিয়ে যাওয়া আর সেখান থেকে আজকের দিনের নীলাকাশের তলায় আমন্ত্রণ-ব্যাকুল মহীরুহের সামনে উপস্থিত করা বর্ণনাকুশলতার পরিচায়ক। বনস্পতিটির শক্তির চিত্রের পাশাপাশি এবার সৌন্দর্যের চিত্র। ''ডালে ডালে বনের পাখীর ভোরের কাকলিতে মুখর যে বিশাল বনস্পতি তাকে সহ্য করতে পারে না লোভী শোষকের দল।'' পাগলা হাতীর দলকে পাঠায় তাদের শুঁড়ে উচ্ছেদের নোটিশ জড়িয়ে দিয়ে। তারা অতি কোমল কচি কুঁড়ি টেনে ছিঁড়ে, পায়ে দলে, মুচড়ে দিয়ে বলে যায়, ''এই মাটিতে তোর আর অধিকার নেই।'' শাণিত বিদ্রুপের পাশে বিষাদ-কোমল বর্ণনা; 'শুঁড়ে উচ্ছেদের নোটিশ', —এর পাশে পদদলিত কুসুমকোরক।

তবু এই 'শালপ্রাংশু মহাভুজ' জনগণাধিনায়ক অপরাজিত। এই বনস্পতির ডালে ডালে আবার নতুন প্রাণের উন্মেষ, নতুন পাতার উৎসব। সেখানে আবার শুনি পাখীর কাকলি। নবজীবনের উল্লাস।

নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর জোর দিয়ে কবি বলছেন :

''আমার দেখে-আসা এক যুগের বিস্ময়/গ্রেনাইট পাথরের বুক ফেড়ে/সীমান্ত প্রহরী সেই/শাল গাছটি।/মুখেতে দেখেছি তার দারিদ্র্যের কালিমা/চোখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ভবিষ্যের আশা।'' এই পর্যন্ত এসে অসর্তক পাঠককে কবি একটা চমক লাগান। যারা এই বনসৃজনের যুগে কবিতাটিকে ভাবছিলেন বৃক্ষবন্দনা তাঁরা হঠাৎ জানতে পারেন যে শাল গাছটির একটা নাম আছে এবং সে নাম কোনও গাছের নয়— একজন মানুষের— রত্নেশ্বর রাভা। এই নাটকীয়তা একটি কাব্যকলাসম্মত কৌশল।

কবিতাটি কিন্তু এক জায়গায় দুর্বল। কোনও নেতার 'একক মহিমা'র কথা বলা অনৈতিহাসিক এবং অবৈজ্ঞানিক। জনগণকে সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েই নেতার কীর্তির প্রতিষ্ঠা। নির্জনতার শিখর চূড়ায় তাঁকে স্থাপন করব কী করে? 'অগ্নি-ঈগল' কবিতাটিকে অনুরূপ দুর্বলতা আছে। সুকান্ত কিন্তু 'লেনিন' কবিতাটিতে সাবধান ছিলেন। লিখেছেন : ''লেনিন ভেঙ্গেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ'', ''আজকেও অযুত লেনিন/ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে বিশ্বব্যাপী প্রতীক্ষিত দিন।'' ''জনস্রোতে'', ''অযুত লেনিন''— এই সব কথাগুলোর ওপর জোর দিতে হবে।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বাংলা ব্যঙ্গ-কাব্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছি। 'কুলখুরার চোতাল'-এ একটি বিদ্রুপাত্মক কবিতা আছে — 'উট যোয়ান-বেউলা' অর্থাৎ 'ভেসে যাওয়া নতুন বেহুলা'। স্বামীর শব নিয়ে সদ্যবিধবা বেহুলার ভেলা ভেসে চলেছে অকূলে— বাংলা সাহিত্যে এটি একটি করুণতম দৃশ্য। তারই একটি আধুনিক সংস্করণ আলোচ্য কবিতাটিতে পরিবেশিত হয়েছে। তাই এই নতুন বিধবার কোলে স্বামী নয়, মৃত শিশু সন্তান। কবি আভাসে-ইঙ্গিতে বলতে চান যে আসামের কোনও বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে পিএম বা প্রাইম মিনিস্টার আকাশ পথে পর্যবেক্ষণরত। দুর্গতদের দুর্গতি দেখবার জন্যে। উড়ন্ত ঘোষক ভেলায়-ভাসা নতুন বেহুলাকে সম্বোধন করে বলছেন দেখ, শোনো, পিএম আসছেন, শিশুকে কোলে-নিয়ে আর অল্প সময় ভেসে যাও আর আকাশের দিকে তাকাও। বায়ুমণ্ডলের গর্জন নয়, এ পিএম-এর বিমান... মহাকাশ বাণী : নিয়ন্ত্রণ হবে, ব্রহ্মপুত্র বাঁধা পড়বে। জল ঘরে ঘরে বয়ে নিয়ে যাবে বিজলী বাতি। আর কিছু সময়ের জন্য ভেসে যাও বিষকাঁটার গাছের ভেলাতে, বসে যাও, ভেসে যাও, শরৎ আসবে— শিউলি ঝরবে! মৃত শিশুকে বুকে সাপটে নিয়ে কিছু সময়ের জন্য ভেসে যাও নতুন বেহুলা!

এর সারমর্ম সরকারী আশ্বাসকে অট্টহাস্যে পরিহাস। সে আশ্বাস পূরণ হয় না বলেই চিরন্তন। যেমন, বন্যানিয়ন্ত্রণ, ব্রহ্মপুত্রের ওপর বাঁধ নির্মাণ, তার সাহায্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, ঘরে ঘরে বিজলী বাতি। এই হল 'মহাকাশবাণী' 'মহাকাশ'। কথাটা চাটুকার ঘোষকের অতিরঞ্জন। অতি উৎসাহে সে লক্ষ্য করেনি যে আকাশ আর মহাকাশ এক নয়।

'ডিব্রুগড়লৈ' (অর্থাৎ 'ডিব্রুগড়কে') কবিতাটিকে 'কুলখুরার চোতাল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে হেমাঙ্গ বিশ্বাস কেন বাদ দিয়েছেন জানি না। কবিতাটির শিরোধৃত উদ্ধৃতিটি কবিতাটির মতোই বিপ্লবের পক্ষে। রম্যাঁ রলাঁ থেকে উদ্ধৃতিটি এই : ''যেখানে নিয়মশৃঙ্খলা মানে অবিচার সেখানে বিশৃঙ্খলা হচ্ছে সুবিচারের সূচনা।'' কবিতাটির শুরুতে ডিব্রুগড়কে অভিনন্দন জানিয়ে কবি বলছেন : বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে খবর দেয় যে অগ্নিকোণে প্রবল ঝড়। বিদ্রোহের প্রান্তদুর্গ ডিব্রুগড় বেঁচে থাকুক। কবিতাটিতে খুব জোরালো ভাবে প্রকাশ পেয়েছে কবির রাজনৈতিক বক্তব্য। দেশ সম্বন্ধে কবি বলছেন : 'ক্ষুধা যেখানে বেআইনী, বন্ধু,/ক্ষুধা যেখানে প্রপীড়িত/ক্ষুধা যেখানে পুথিপত্রে ও বিদ্যালয়ে/নিষিদ্ধ, লাঞ্ছিত—'' এহেন দেশ তাঁদের। কবি বিদ্যালয়ের ওপর খাপ্পা, কারণ বিদ্যাদাতা গুরুরা সেখানে তাঁদের বই-পত্রের মধ্যে দিয়ে কেবলি বলেন : ছাত্রানাম্ অধ্যয়নং তপঃ, ভিন্ন পন্থা হয় না। বিদ্যার্থীকে সম্বোধন করে কবি বলছেন যে তার সামনে অনেক প্রশ্ন, বহু সমস্যা। এই তরল সোনা বা পেট্রলের দেশে ঘরে বাতি জ্বলে না। তোমার কমানো সলতে আরো কমিয়ে নিভিয়ে দাও, ল্যাম্প পোস্টের তলায় গিয়ে পড়াশোনা করবে। স্নেহময়ী মা'র চোখের জল র‍্যাশনের থলের মধ্যে গোপনে বয়ে যায়। ছোটো ভাইটির রাত্রের ঘুম কেড়ে নেয় ভূতে (আসলে খিদেয়)। শিশু সন্তানকে বেচে দেয় কোনও নারী, উন্মাদ, বিবস্ত্র— গলায় ফাঁসি দেবার দড়ি বেছে নেয়। সমাজের এই সব প্রশ্ন বা সমস্যা সম্বন্ধে তোমার এগজামিনের বই-পত্রে কিছু বলে না। তোমাকে হতে হবে কংসরাজের (অত্যাচারী সরকারের) নিয়মনিষ্ঠ 'গুড বয়'; সব ভুলে গিয়ে তুমি চোখের সমানে খুলে ধরবে এগজামিনের খাতা। এটা হল কবির ব্যঙ্গাত্মক উপদেশ বা প্রতিক্রিয়াশীল গুরুর সুবিধাবাদী নির্দেশ। মোট কথা দাঁড়াল এই— ছাত্রদের অধ্যয়ন হচ্ছে তপস্যা, এগজামিনে যা আসবে না তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কণামাত্র প্রয়োজন নেই। এই উপদেশের ধারা ধরেই প্রতিক্রিয়াশীল গুরু ও গুরুজনরা বলেন : ''বিটনিক হও, ড্রেন পাইপ পরো/গাও বিটলদের গান/কেবল উপবাসী থাকলে দেবে না/অশ্লীল স্লোগান''—অর্থাৎ শোষকদের কাছে শোষিতের ''খাদ্য চাই'' স্লোগানটি 'অশ্লীল'! যদি ছাত্ররা এই আওয়াজ তোলে তবে কী হবে? ''তাহলে খালি পেটে খাবে/গরম সীসার গুলি/অহিংস রাজের সিংহবিক্রম/রক্তে রাঙাবে ধূলি।''

এর পর কবিতাটির মোড় ঘুরছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের বাঁধা পথ ছেড়ে কবি সোজাসুজি ছাত্রসমাজকে বিপ্লবের পথে ডাকছেন। বলছেন : ''নতুন খাতায় নতুন আদর্শে/নতুন পাঠ্য ভাই;/আমি যদি হই জনতার কবি/চীৎকার করে বলে যাই—/রাজ পথে পথে বিদ্যার্থীর/পদরেণু কুড়িয়ে বলে যাই—/কেরাণীগঞ্জ শিলং পাহাড়/শহীদের রক্ত চায়/ভূমিকম্প আর প্লাবনের

দেশে/অগ্নিগিরিও আছে।'' শেষ দু'লাইন যেন শোষকদের প্রতি উদ্যত বজ্র। আমরা ভূমিকম্প ও বন্যায় কাতারে কাতারে মরি, তা বলে মনে করো না আমরা শুধু মরতেই জানি। আমরা মারতেও জানি। বিদ্রোহে বহ্নিমান হতেও জানি। মনে রেখো। তারপর সাবধানবাণী উচ্চারণ করছেন। ডলারের অট্টালিকা তৈরী করছ করো কিন্তু যমের শমনজারী কি লক্ষ্য করছ? দেয়ালের লিখন পড়েছ? দুঃস্বপ্নের ঘুমে এখনও অচেতন? শুনছ না কি দূরে ঐ ক্ষুধাতুর উত্তাল? সংগে বাজছে তাল। এ কোনও বাজনার তাল নয়—হরতাল! হরতাল! শ্রমিকের বুকে ক্ষুধার বয়লার। চাষী লাঙলের ফালটা উল্টো করে ধরেছে। অর্থাৎ তার লক্ষ্য মাটি নয় জমিদার মহাজন! আমি ঐ চাষীরই কবি। তারই হাতে হাত দিয়ে আমার ছন্দ সৃষ্টি হবে। ''সময়ের ঘড়ি প্রহর গণিছে/ভূগর্ভে বিস্ফোরণ।'' কবিও অপেক্ষমান।

'কুলখুরার চোতাল' দিয়ে শুরু করেছিলাম। তাই দিয়ে শেষ করি। আমরা কবিতাটিকে কবির সাহিত্যাদর্শের ইস্তাহার হিসেবে ব্যবহার করেছিলাম, কাব্য-বিচার হয়নি।

কৃষি বিপ্লবের মন্ত্রণা সভা তো প্রকাশ্য দিবালোকে জনবহুল স্থানে হতে পারে না। তাই কুয়াসা ম্লান জোছনা রাতের ছবি দিয়ে কবিতাটি শুরু। সভা বসেছে খুড়োর ভালো করে নিকোনো পরিষ্কার উঠোনে। অন্ধকার কুঁড়ে ঘরে বসে আছেন অসুস্থ সভাপতি সবার অপেক্ষায়। (অসমীয়া কবিতার অনুবাদে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ গণনাট্য সংঘের কর্মী শ্রীমনোহর কুণ্ডু আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।) সেখানে কেরোসিনের বাতির আলো আঁধারি। রুগ্ন নেতার কথা অস্পষ্ট। কঠিন অসুখ তবু তিনি কর্তব্যে অবিচল। সেই রণক্লান্ত বৃদ্ধ সেনাপতির মৃত্যু ঘোষণাই এই কবিতার প্রধান বিষয়। এই ঘোষণাই কবির কৃতিত্বের পরিচায়ক। কয়েকটি অতি সরল সঙ্গে এই ঘোষণা। ''খুলখুরা নাই।/খবরের কাগজে খবর বার হল না। আজকের খবরে শিরোনামা পায়না খুড়া।'' কেন পায়না খবরের কাগজের পাতায় সম্মানের স্থান? এই প্রশ্নের উত্তরে কবির জবাব চরম জবাব। ''কুলখুরা শতশতিকার।'' অর্থাৎ কুলখুরার মতো মানুষের পরিমাপ দিন সপ্তাহ বা বছর দিয়ে করা যায় না। শত শতাব্দীর বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে তার বিরাট ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্তি। শেষ কথা, কথার চূড়ান্ত, হচ্ছে—'বসু মাতারী/খবর নয়,/ ইতিহাস।'' কৃষক সংগ্রামের ঐতিহাসিক পুরুষ, সে ক্ষণিকের শোক সংবাদে স্থান পাবে কেন? তার স্থান ইতিহাসে।

তথ্যসূচী

১। ''কুলখুরার চোতাল'' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'কবি হরেন ভট্টটল' কবিতাটি থেকে।

২। ''কুলখুরার চোতাল,'' দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৫, জার্নাল এম্পরিয়াম, নলবাড়ী, অসম।

▫ 'অনীক' : হেমাঙ্গ বিশ্বাস সংখ্যা (ফেব্রু-মার্চ ১৯৮৮) থেকে পুনর্মুদ্রিত

গণ-সংগীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস

৮১ পৃষ্ঠায় পর

আন্দোলনের গানের পাশ্চাত্য স্বরলিপি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, গানের সুরটা আমাকে তুলে দাও। স্বরলিপির নীচে গানের ভাষা দুর্বোধ্য। বোধহয় পাশে ফরাসি ভাষায় গানের সারমর্ম লেখা ছিল, তার থেকে কিছুটা আন্দাজ করতে পারছিলাম। যাই হোক আমি কথা বাদ দিয়ে সুর বাজাতে শুরু করলাম এবং তিনি ওই সুরে সঙ্গে সঙ্গে কথা বসিয়ে দিতে লাগলেন। এটা আমার মনে আছে সুরটি ছিল অদ্ভুত! আমাদের দেশীয় সংগীতে যাকে স্থায়ী বা অস্থায়ী বলে, পুরো গানটি একটি স্থায়ীতে ছিল—কোনো অন্তরা ছিল না। গানটির শেষে স্বরলিপির মাথায় একটিই সাংকেতিক চিহ্ন ছিল Da Capo অর্থাৎ From the beginning, আমরা যাকে বলি 'ফের রামসে'। আমার যতদূর মনে পড়ে, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে এটিই ছিল শেষ সংগীত বিষয়ক সহযোগিতা। ৬৫ সালেই হেমাঙ্গ বিশ্বাসের উদ্যোগে এবং শ্রীমতী নীহার বড়ুয়ার সহযোগিতায় আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে গঠিত হল *Folk Music and Folklore Research Institute*। *Institute*-এর নামকরণ তাঁরই। উদ্দেশ্য ঃ লোকসংগীতের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। ৬৭ সালে Institute-একটি সংকলন প্রকাশ করে *Folk Music & Folklore : An Anthology* নামে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস সেই সংকলনের প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

কিছু মানুষের কাছে হেমাঙ্গ বিশ্বাস লোকশিল্পী বলে পরিচিত। তাঁরা হয়ত তলিয়ে না ভেবেই তাঁর সম্বন্ধে এই আখ্যাটি প্রয়োগ করে থাকেন। তাঁরা লোকসংগীত এবং গণসংগীতকে এক করে ফেলেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস নিশ্চিতভাবেই গণসংগীত-শিল্পী, কিন্তু কখনোই লোকসংগীত শিল্পী ছিলেন না। তিনি কখনও লোকসংগীত গাইতেন না। লোকসংগীত থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নিজস্ব সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শৈল্পিক চেতনায় তিনি তাঁর সংগীত রচনা করতেন। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু ছিল সমসাময়িক ঘটনা। কিছু সমসাময়িক সৃষ্টি চিরকালীনত্বের কোঠায় উন্নীত হতে পারে কিন্তু সব সমসাময়িক সৃষ্টিই যে চিরকালীনত্বে পৌঁছাবে এমন কথা শুধু কালই বলতে পারে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কাব্যের গুণাগুণ বিচারের অধিকারী আমি নই।

আমি দেখেছি তাঁর জীবনসঙ্গী অসুস্থতা আর তারই পাশাপাশি অনবরত সৃষ্টির প্রয়াসকে। হাসপাতালে যাওয়াটা তাঁর প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। তাই আগেরদিন যখন শুনলাম তিনি হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন, ধরেই নিয়েছিলাম দিনকয়েক ভোগান্তির পর আবার ফিরে আসবেন, যেমন অতীতে বারবার ফিরে এসেছেন। কিন্তু পরদিন আর সত্যিই ফিরলেন না।

▫ *ঢাকা (বাংলাদেশ) থেকে প্রকাশিত 'উন্মেষ' (১৯৮৮) পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত*

প্রসঙ্গ : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

দীপংকর চক্রবর্তী

এক

আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে হেমাঙ্গ বিশ্বাস যখন মারা যান, তখন তাঁর ওপর লিখতে গিয়ে তাঁকে তুলে ধরেছিলাম এভাবে : ''বাংলার প্রগতি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব প্রগতি আন্দোলনে তাঁদের অতীত ভূমিকাকে পুঁজি করে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বাণিজ্যিক লক্ষ্মীর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন নি, এমন কি শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সহাবস্থানে ক্রমঅভ্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক বামপন্থার রঙীন হাতছানির যূপকাষ্ঠেও নিজেদের বামপন্থী ধ্যানধারণা ও নীতিবোধকে বিসর্জন দেননি'' তিনি তাঁদের অন্যতম। আজ তাঁর জন্মশতবর্ষে লিখতে বসে মনে হচ্ছে তার সঙ্গে আর একটা কথাও বলা দরকার ছিল।

কথাটা হচ্ছে এই যে, ১৯২০'র দশকে ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা হলেও জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলনের প্রকৃত স্ফুরণ ঘটেছিল ১৯৪০-এর দশকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সে সময়েই অনুসৃত লাইনের ক্ষেত্রে চরম ক্ষতিকর বিচ্যুতির পরিচয় মিলেছিল (যেমন ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার যৌথ দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি, 'পাকিস্তান' প্রশ্নে বিচ্যুতি প্রভৃতি)। তবু আত্মোৎসর্গকারী কমিউনিস্ট কর্মী ও সমর্থকদের আন্তরিকতা ও সক্রিয়তার ফলে এক দশকের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন, সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতির পটভূমিকায় সারা দেশের, বিশেষত বাংলা, আসাম, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, মননের চর্চা, এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রে যেন এক নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল, কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্নরাই সামনের সারিতে চলে এসেছিলেন। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত এই প্রবণতা বজায় ছিল। পরবর্তীকালে, বিশেষত পার্টি-বিভাজনের সময় পর্যন্ত, এই প্রবাহ প্রায় স্তিমিত হয়ে এসেছিল। এই ধারার যাঁরা কম-বেশি সক্রিয় ছিলেন, তাঁরাও অধিকাংশই সিপিআই-এ থেকে থেকে গেছিলেন, সিপিআই(এম) শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য কোনো জোয়ার আনতে পারে নি। কিন্তু আবার সত্তরের দশকে, নকশালবাড়ি আন্দোলনে, বিশেষত সিপিআই (এম-এল)-র গুরুত্বপূর্ণ সব বিচ্যুতি সত্ত্বেও একটি নতুন জোয়ারের, কার্যত নবজাগরণের, সূচনা হয়েছিল গণসঙ্গীত, নাটক, চলচ্চিত্র, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়, চরম রণনীতি ও রণকৌশলগত বিচ্যুতি সত্ত্বেও হাজার হাজার বিপ্লবীর আত্মদানের মহাকাব্য মানুষকে আপ্লুত করে তুলেছিল, এবং আন্দোলনের বহু কর্মী ও সমর্থক নিজেদের ভ্রান্তি উপলব্ধি করে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে গেলেও, বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে— যেমন, বিজ্ঞান ও পরিবেশ আন্দোলন, নারী আন্দোলন, মানবাধিকার আন্দোলন প্রভৃতি, এবং সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৪০-এর দশকের এবং ১৯৭০-এর দশকের এই দুই সাংস্কৃতিক নবজাগরণের মধ্যে প্রকৃত অর্থে কোনো যোগসূত্রের কথা যদি বলতে হয়, তবে তাঁর নামও কিন্তু হেমাঙ্গ বিশ্বাস। এটা ভুলে গেলে হেমাঙ্গ বিশ্বাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা আদৌ মিলবে না।

হেমাঙ্গদার শুরুর কথা দিয়েই শুরু করা যাক। ১৯৪২-এ অবিভক্ত আসামের সুরমা উপত্যকার উত্তাল কৃষক আন্দোলনের স্পন্দনে এই অঞ্চলের অতিপরিচিত সারি গানের সুরে অনুরণিত এক অসাধারণ গণসঙ্গীত 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান' হাজার হাজার সংগ্রামী কৃষকের বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে আসাম ও বাংলার গ্রাম-গঞ্জের পরিধি ছাড়িয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিলো নগর-জীবনেও, এবং সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়েছিলো নতুন দিনের সংগ্রামী গণসঙ্গীতকার হিসেবে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নাম। মাটির গন্ধমাখা লোকসঙ্গীতের প্রগতিশীল ধারাকে বাস্তব গণসংগ্রামের আগুনে সঞ্জীবিত করে, স্বাদেশিকতার ধারাকে আন্তর্জাতিকতার মহাসাগরে মিশিয়ে দিয়ে, অসংখ্য যে গণসঙ্গীত হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর পরবর্তী পাঁচ দশক ধরে রচনা করে গেছেন, সমাজ-পরিবর্তনের বিপ্লবী গণসংগ্রামে সেই সব গান দিকে দিকে প্রেরণার ঝংকার তুলেছে, মেহনতি মানুষের হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করেছে। যৌবনেই যক্ষারোগের আক্রমণ, ধনী জমিদার পিতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, সারা জীবন ধরে রোগ ও দারিদ্র্যের আক্রমণ, বার্ধক্য, এমনকি ডান-বাম সমস্ত রকম প্রাতিষ্ঠানিক মাতব্বরদের ভ্রূকুটি— কোনো কিছুই তাঁর কণ্ঠ বা কলমকে স্তব্ধ করতে পারে নি, তিনি বয়ে চলেছেন সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতির অন্তরঙ্গময়তা, আধুনিকতা ও প্রতিবাদী সংগ্রামী চেতনার দীপ্তি। সচেতন ও সংঘবদ্ধ প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সংগঠক হিসেবে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সেই সংগ্রামী চেতনাতেই সঞ্চারিত করেছিলো গভীরতা ও আত্মানুসন্ধানের আকুলতা, নির্মম আত্মসমালোচনার ও সত্যে উপনীত হবার সাহসিকতা। তাই শেষ জীবনে দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যক্ষ রাজনীতি ও গণআন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্নতাও তাঁর চেতনা থেকে কেড়ে নিতে পারেনি সামাজিক দায়বদ্ধতা ও বিপ্লবমনস্কতার বলিষ্ঠতা।

চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকে যে গণনাট্য সংঘ সারা দেশে প্রগতি সংস্কৃতির বিকাশের পটভূমিকায় উত্তাল জোয়ার তুলেছিলো, হেমাঙ্গ বিশ্বাস সাংগঠনিকভাবে প্রথম থেকে তার সাথে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু গণনাট্য আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে

তোলার ব্যাপারে শুরু থেকেই তিনি সক্রিয় ছিলেন। সর্বভারতীয় স্তরে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৩-এ, বাংলায় ১৯৪৩-এ। সংঘের এই সাংগঠনিক জন্মের পেছনে ছিলেন প্রধানত শহরের কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন বা সমর্থকরা। কিন্তু এটাকেই গণনাট্য আন্দোলনের প্রকৃত শুরু বললে সত্যকে অস্বীকার করা হবে। কারণ, সংঘের সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত গণআন্দোলনগুলির, বিশেষত কৃষক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গণ-সংস্কৃতি ও গণশিল্পের বিকাশ ঘটাতে শুরু করেছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নিবারণ পণ্ডিত, রমেশ শীল প্রভৃতিরা। হেমাঙ্গ বিশ্বাস পরে এ প্রসঙ্গে বলেছেন : ''অ্যাজ ইফ গণনাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছিলো কোলকাতা থেকে! এটা সত্যি কথা নয়। (এই আন্দোলনের ছিলো) দুইটি ধারা— একটা গণআন্দোলনের ধারা— যেটা বিলেত থেকে শুরু হয় নি।''এগুলির সঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সাংগঠনিক কোনো সম্পর্ক তখনও ছিলো না। সেই সম্পর্ক শুরু হয় আসামে সংঘের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে।

এ প্রসঙ্গে বিশেষত বলা দরকার যে, গণসঙ্গীতকার হিসেবে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের যাত্রা শুরু হয় গণনাট্য সংঘের জন্মের অনেক আগে থেকে। অনুশীলন পার্টি, গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শ, কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে তিনি গণসঙ্গীত রচনার প্রেরণা পান। তিনি গান লিখেছেন সরাসরি কৃষক আন্দোলনের প্রেরণা থেকে, আবার কৃষক আন্দোলনকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে। এই কৃষক আন্দোলনের প্রেরণা ও পটভূমিকায় যে সাংস্কৃতিক চেতনা সে সময় সিলেটে তথা সুরমা উপত্যকায় জন্ম নেয়, তারই পরিণতিতে গড়ে ওঠে সুরমা ভ্যালি কালচারাল স্কোয়াড, এবং এর নেতৃত্ব দেন প্রধানত হেমাঙ্গ বিশ্বাস। কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে সর্বভারতীয় স্তরে গণনাট্য সংঘ গড়ে উঠলে তাতে বিভিন্ন রাজ্যের মাটি থেকে উঠে আসা এই সব সাংস্কৃতিক উদ্যোগগুলি সমন্বিত হয়।

এই সমন্বয় প্রক্রিয়ার মধ্যে দু'ধরনের দ্বন্দ্ব, যদিও বৈরিতামূলক নয়, বর্তমান ছিলো। প্রথমটির কথা আগেই বলেছি— সাংগঠনিকভাবে সংঘের নেতৃত্ব প্রধানত গড়ে উঠেছিলো শহরভিত্তিক মধ্যবিত্ত কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে— যাঁদের অধিকাংশেরই নীচুতলার ব্যাপক মানুষের গণআন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিলো না। আর সংগঠনের নীচুতলায়, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, সংঘের সাফল্য ও বিস্তৃতির ভিত্তি গড়ে উঠেছিলো হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতো গণ-আন্দোলন থেকে উঠে আসা সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়েই। বিগত শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে সংঘের কর্মসূচি ও লাইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই মূল ভূমিকা নিয়েছিলেন প্রথম ধারার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা, পার্টি-নেতৃত্বের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ফলত সেসময় জনযুদ্ধের তত্ত্বের একপেশে রূপায়ণ (প্রধানত ফ্যাসিস্ট জাপানের বিরোধিতা— ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্মসূচিকে অবহেলা করে), 'মুসলিম জাতিসত্তার' আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির প্রতি সমর্থন, কংগ্রেস-মুসলিম লীগ যৌথ নেতৃত্বের ওপর অযৌক্তিক আস্থা স্থাপন, পার্টি-শ্লোগানকে অনেকাংশে যান্ত্রিকভাবে রূপায়ণের জন্য গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বের ওপর চাপ, আবার পরবর্তীকালে ''যা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল নয়, তা-ই প্রগতিশীল''-জাতীয় আত্মসমর্পণবাদী সাংস্কৃতিক আইন, শহরে কিছু 'মডেল' সাংস্কৃতিক কর্মসূচি তৈরি করার ওপর অতিরিক্ত জোর দিতে গিয়ে গণ-আন্দোলন ভিত্তিক নীচুতলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি অবহেলা প্রভৃতি যে সব ভ্রান্ত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লাইন পার্টি-নেতৃত্ব অনুসরণ করেছেন, দ্বিতীয় ধারার গণ-আন্দোলন ভিত্তিক সাংস্কৃতিক কর্মীরা বহু সময়েই সচেতন বা অচেতনভাবে তার শিকার হয়েছেন। সুধী প্রধানের মতো গণনাট্য সংঘের অন্যতম নেতৃস্থানীয় সংগঠককেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শহর-কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক মানুষকে সক্রিয় করতে পারে নি, এবং একই সঙ্গে শহুরে সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির মধ্যেকার ব্যবধান ঘোচাতে পারে নি— উপরন্তু সংঘের শহর-কেন্দ্রিক প্রবণতা গণনাট্য আন্দোলনের পটভূমিকায় লোকসংস্কৃতির বিকশিত জোয়ারকে সীমিত করে দিয়েছে, এবং লোকশিল্পীদের ও সংঘের কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানোর ব্যাপারে মারাত্মক অবহেলা সংঘের সাংগঠনিক বিকাশের পথকেও রুদ্ধ করে দিয়েছে। এ সবেরই পরিণতিতে ১৯৫৭-র দিল্লী সম্মেলনের পর সর্বভারতীয় স্তরে গণনাট্য সংঘ ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে চলে গেছে। পরিণত বয়সে হেমাঙ্গ বিশ্বাস এ সম্পর্ক সঠিক উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন এবং সত্তরের বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিকায় নতুন করে ঐক্যবদ্ধ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এভাবেই তিনি প্রচেষ্টা চালিয়েছেন ১৯৪০-এর দশকের গণসংস্কৃতির সাথে ১৯৭০-এর দশকের গণসংস্কৃতির যোগসূত্র স্থাপনের, যদিও বাস্তব পরিস্থিতি তার অনুকূল না থাকায় সে প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি।

দুই

গণনাট্য সংঘ সম্পর্কে পরিণত বয়সে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সুস্পষ্ট উপলব্ধি ছিলো এই যে, সেটা প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিলো না, ছিলো গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন, একে মার্কসবাদী আন্দোলন হিসেবে দেখাটাই ভুল ছিল। এবং তার ফলে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক যুক্তমোর্চা গড়ে এই আন্দোলনকে এগিয়ে তো নেওয়া যায়নি, উপরন্তু পার্টি-সমর্থক ও পার্টি-বহির্ভূত শিল্পী সাহিত্যিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বের সঠিক সমাধান নেতৃত্ব কখনোই করে উঠতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে হেমাঙ্গদা মনে করতেন: উদারতার মনোভাব নিয়ে

সমাজের গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষকে কাছে টেনে নিতে হবে, কিন্তু তাই বলে কখনোই শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করা চলবে না। পার্টি-বহির্ভূত গণতান্ত্রিক শিল্পী-সাহিত্যিকদেরকে সঠিক শ্রেণীভিত্তিক গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে সামিল করার ব্যাপারে সংঘ-নেতৃত্বের এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও নীচুতলায় গণআন্দোলন-ভিত্তিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে কিন্তু বহু গণতান্ত্রিক শিল্পী-সাহিত্যিককে বিভিন্ন রাজ্যে অনেক পরিমাণে কাছে টেনে আনা সম্ভব হয়েছিল। এ ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল সংঘের আসাম রাজ্য কমিটি। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নেতৃত্বে সংঘ আসামে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, বিষ্ণু প্রসাদ রাভা, মঘাই ওঝা, ভূপেন হাজারিকা, নির্মল চৌধুরী প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছিল। একদিকে গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সংগ্রামী সাংস্কৃতির বিকাশ, অন্যদিকে বিপুলসংখ্যক গণতান্ত্রিক কৃতী শিল্পীর সঙ্গে ঐক্য— এই দুইয়ের মোটামুটি সঠিক সমন্বয়ের কারণেই অন্ধ্র ও কেরালার মতো আসামেও গণনাট্য আন্দোলনের শিকড় শহরের সীমিত গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক কৃষক জনতার মধ্যে প্রসারিত হয়েছিল। ফলে গণনাট্য আন্দোলনের সংগঠক ও গণসঙ্গীতকার হিসেবে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা সমগ্র আসামে গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। সে কারণেই, ১৯৬০-এ আসামে বাঙালী-বিরোধী দাঙ্গার সময় হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও ভূপেন হাজারিকা যৌথভাবে দাঙ্গাবিরোধী গীতিআলেখ্য 'হারামন-রঙমন কথা' গেয়ে সারা আসামে ঘুরে বেরিয়ে দাঙ্গাবিরোধী সুস্থ মানসিকতার প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং একই কারণে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মৃত্যুর পর সমগ্র আসামে শোকের যে আবহ তৈরি হয়েছিলো, তা এক কথায় ছিলো অভূতপূর্ব।

গণসঙ্গীতের ক্ষেত্রে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের প্রধান অবদান নিঃসন্দেহে লোকসঙ্গীতভিত্তিক গণসঙ্গীতের চর্চা। ভারতের ব্যাপক মেহনতি মানুষের মধ্যে গানের মাধ্যমে সংগ্রামী চেতনা বিকাশের তাগিদেই হেমাঙ্গ বিশ্বাস লোকসঙ্গীতের পরিচিত সুরকে কাজে লাগিয়ে গণসঙ্গীত রচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর এই উপলব্ধি প্রথমে এসেছিলো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, এবং পরে মাওসেতুঙের 'ইয়েনান ফোরামে সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে আলোচনা' তাঁর এই উপলব্ধিকে পরিণতি দিয়েছিল। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নিজের ভাষায়: "ওই যে মাওসেতুঙের একটা কথা আছে না—'ফর হুম?'— এটা কিন্তু আমাদের ভীষণ নাড়া দিয়েছিলো। এতোদিন আমরা কী দেখেছি? কী লিখবো? কী ভাবে? এ তো হলো আমাদের মূল কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে। কী লিখবো— এটা হলো থিম বা কনটেন্ট। আর কী ভাবে লিখবো— এটা হলো তার টেকনিক। এ নিয়েই আলোচনা চলছিলো। তার মধ্যে হঠাৎ মাও বললেন— 'ফর হুম?' কার জন্য? এটা হলো ডিটারমাইনিং ব্যাপার। কার জন্য ব্যাপারটা এখন অনেকটা উপলব্ধিতে আসে, কিন্তু তখন অতোটা বুঝে লিখিনি। কার জন্য— এটা আমার কাছে প্রত্যক্ষ। কৃষকদের আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি— আর আমি তো গ্রামের ছেলে। তারা বোঝে তেমন তো লিখতে হবে। আবার ওরা যা গাইতে পারে— তা বুঝে গান লিখতে হবে। কৃষক আন্দোলনের জন্য যদি এমন গান লিখি যা তারা দল বেঁধে গাইতে পারে না, তাহলে তা কিন্তু ব্যর্থ।"

যদিও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মুখের কথায় বা লেখায় কখনও এর স্বীকৃতি মেলে নি, তবু মনে হয়, এ প্রসঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাস সম্ভবত অসচেতনভাবেই, নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, মাওসেতুঙেরই 'মাস লাইন' বা গণলাইন সম্পর্কিত ধারণার অনুসরণ করেছেন। গণলাইন প্রসঙ্গে মাও-এর ব্যাখ্যা এরকম ঃ কোনো বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে জনগণের বক্তব্য ও মতামত জেনে নিন, তারপর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে তার মধ্যেকার ভুলভ্রান্তি শুধরে নিয়ে সঠিক বক্তব্যকে পরিণত রূপ দিন, এবং তারপর আবার জনগণের কাছেই সেই পরিণত সচেতন বক্তব্যকে নিয়ে যান। লোকসঙ্গীতভিত্তিক গণসঙ্গীতের লাইনকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাসও বস্তুত সেটাই করেছেন— ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত অতি পরিচিত সুরকে তিনি সংগ্রহ করেছেন, তারপর সংগ্রামী বক্তব্যের ভিত্তিতে সেই লৌকিক সুরের পরিমার্জনা করে তিনি গান রচনা করেছেন, এবং শেষে জনসাধারণের কাছে তিনি সেই গান গেয়েছেন। এর ফলে সেই অতিপরিচিত লৌকিক সুর জনগণ অতি সহজেই গ্রহণ করেছে, এবং তার সঙ্গে সেই গানের সংগ্রামী বক্তব্যও তাদের মনে গভীর দাগ কেটেছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের যে সব গান গত পাঁচ দশক ধরে সবচেয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তার অধিকাংশই এভাবে রচিত হয়েছে।

লোকসঙ্গীতভিত্তিক গণসঙ্গীতকে প্রাধান্য দিলেও, হেমাঙ্গ বিশ্বাসই কিন্তু বার বার লোকসঙ্গীতের সঙ্গে গণসঙ্গীতের পার্থক্য সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন লেখা ও আলোচনায় আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন, সংগ্রামী সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে গণসঙ্গীতের তুলনায় লোকসঙ্গীতের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এবং বাণিজ্যিক লক্ষ্মীর প্রসাদ পাবার তাড়নায় লোকসঙ্গীতের সাম্প্রতিক বিকৃতি সম্পর্কে বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আবার লোকসঙ্গীত ছাড়াও গণসঙ্গীতের যে অন্যান্য মাধ্যম আছে ও থাকতে পারে, যথোপযুক্ত হারমোনাইজেশনের সাহায্যে বিপ্লবী চেতনায় উদ্দীপিত চলমান মানসিকতার একটা বহুমুখী মাত্রাও যে গণসঙ্গীতে ধরা পড়তে পারে, সে সম্পর্কেও তিনি সচেতন থেকেছেন।

শেষ জীবনে, গণসঙ্গীত প্রসঙ্গে আরো দু'টি কথাও তিনি উপলব্ধি করেছেন। প্রথমত, "আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিতে কেবল লোকসঙ্গীত নয়, রাগসঙ্গীতেরও যে বিশিষ্ট স্থান আছে, আমাদের স্বদেশী গানের মধ্যে রাগসঙ্গীতের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে, এমনকি লোকসঙ্গীতের সুরের মধ্যেও ও রাগসঙ্গীতের

উপাদান মিশে আছে,'' সে সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়েছেন এবং গণসঙ্গীতে প্রয়োজন ও সম্ভবমতো রাগসঙ্গীতেরও প্রয়োগের পক্ষে মত দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, গণসঙ্গীতের আকর্ষণ বাড়াবার জন্য (সংগ্রামী সত্তা বিসর্জন না দিয়ে) প্রয়োজনবোধে আধুনিক ও পাশ্চাত্য যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষঙ্গ ব্যবহারকে তিনি সমর্থন করেছেন। এসব কিছুই গণসঙ্গীতের বিকাশে তাঁর মুক্তমন অবস্থানের প্রমাণ বহন করেছে। গণসঙ্গীতকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস সম্পর্কে আর একটা কথা না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। গণসঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর সংজ্ঞা ছিলো এই যে, ''প্রকৃতপক্ষে স্বাদেশিকতার ধারা যেখানে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে মিশেছে সেই মোহনায় গণসঙ্গীতের জন্ম।'' সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার প্রতি তাঁর এই সুদৃঢ় দায়বদ্ধতার প্রমাণ মিলবে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের কিছু অসাধারণ গণসঙ্গীতের বাংলায় রূপান্তরীকরণের মধ্যে। গণসঙ্গীতকার হিসেবে তাঁর প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় গণনাট্য আন্দোলনে তাঁর সমকালীন অন্যান্য গণসঙ্গীতকারের বিভিন্ন সার্থক গানকে বারবার পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসার, এবং একই সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের তরুণ গণসঙ্গীতকারদের আন্তরিক মূল্যায়ন ও তাদেরকে বিশেষ উৎসাহ প্রদানের মধ্যে দুই প্রজন্মের যোগসূত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন।

দুঃখের কথা, গণসঙ্গীতের বিকাশের ব্যাপারে এতো সক্রিয় ও ইতিবাচক ভূমিকা সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থে সেরকম স্বীকৃতি তিনি পান নি। মানুষের ভালোবাসা তিনি অজস্র হাতে কুড়িয়েছেন, কিন্তু বাংলায় তাঁর গণসঙ্গীতের কোনো রেকর্ড পর্যন্ত হয়নি। তাঁর জীবদ্দশায় অসমীয়া ভাষায় শুধু একটি রেকর্ড (চারটি গানের) এবং বাংলায় দু'টি ক্যাসেট তাঁর বের হয়েছে। বাণিজ্যিক জগৎ যখন গণসঙ্গীতের মধ্যেও মুনাফার গন্ধ পেয়ে রাম-শ্যাম-যদুর রেকর্ড বা ক্যাসেট বের করতে তৎপর, তখন হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে তারা অচ্ছুৎই করে রেখেছে। তার একটি কারণ নিঃসন্দেহে এই যে, সলিল চৌধুরী-নির্মল চৌধুরী-ভূপেন হাজারিকা প্রভৃতির মতো তিনি বাণিজ্যিক প্রাতিষ্ঠানিকতার সঙ্গে কখনও হাত মেলান নি, তাদের সঙ্গে আপস করেন নি। ভূপেন হাজারিকা যেমন পঞ্চাশের দশকে চীন বিপ্লবের বিজয়ের পটভূমিকায় রচিত সেই অবিস্মরণীয় গণসঙ্গীত 'প্রতিধ্বনি শুনি'-কে আশির দশকে কথা পাল্টে চীনের সঙ্গে সম্পর্কহীন নির্দোষ আধুনিক গানে রূপান্তরিত করে, কিংবা সলিল চৌধুরী গণনাট্যের যুগের গান 'মানবো না'-কে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা আছে এমন একটি স্তবক বাদ দিয়ে অহিংস গানে পরিণত করে, বাজারে রেকর্ড ছেড়ে দু'হাতে পয়সা লুটতে দ্বিধা করেন নি— হেমাঙ্গ বিশ্বাস কোনো দিন সে পথে পা বাড়ান নি। কেননা, গণসঙ্গীতকারের সংগ্রামী বিবেককে তিনি বিক্রয়যোগ্য পণ্য বলে মনে করেননি।

তিন

অতীতের সংগ্রামী ভূমিকাকে পুঁজি করে আত্মপ্রতিষ্ঠার মসৃণ পথ অনুসরণ করাটা যখন আমাদের দেশে এতো সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, তখন হেমাঙ্গ বিশ্বাস কেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই পথে পা বাড়ালেন না? ১৯৭৩ থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত দেড় দশক ধরে অত্যন্ত কাছে থেকে অসংখ্য ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে অভিজ্ঞতা অর্জন ও বিনিময়, আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যে দিয়ে যে হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে দেখেছি, তাতে মনে হয় জীবনের প্রথম পর্যায়ে প্রায় তিন দশক ধরে সক্রিয় গণ আন্দোলন ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার পর শেষ দু-তিন দশক রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও এ সময়টাতেই তিনি অতীতের পর্যালোচনা তথা আত্মানুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে এমন এক রাজনৈতিক উপলব্ধিতে এসে পৌঁছেছিলেন, যখন নিজের রাজনৈতিক সততা তাঁর কাছে ব্যক্তিগত আত্মপ্রতিষ্ঠার তুলনায় অনেক বেশি বরণীয় বলে প্রতিভাত হয়েছিলো। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ রাজনীতি ছাড়লেও শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন। অবশ্য এই অবস্থান তাঁকে অর্জন করতে হয়েছিলো অনেক মূল্য দিয়েই। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অনেক সময়েই তিনি পরস্পর-বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছেন, এবং তিনি নিজেই বহু লেখায় তা স্বীকারও করেছেন। কিন্তু ক্রমশ তিনি তাঁর নিজস্ব অবস্থান বিন্দুটিকে ঠিক করে নিতে পেরেছিলেন।

সম্ভবত এ ব্যাপারে মাও-নেতৃত্বাধীন চীন তাঁর ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিলো। তিনি প্রথম চীনে যান ১৯৫৭-এ, তাঁর যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার জন্য। চীন বিপ্লবের মাত্র আট বছর পরে সমাজতান্ত্রিক চীনে বছর দু'য়েক অবস্থানের মধ্যে দিয়ে সে দেশের অসাধারণ অগ্রগতি তাঁর চোখে ধরা পড়ে। এবং তাঁর রাজনৈতিক ধ্যানধারণাতেও তা প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। কথাপ্রসঙ্গে তিনি পরে এসময়কার দু'টি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। চীনে তখন প্রায় একই সময়ে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' এবং বিমল রায়ের 'দো বিঘা জমিন' ছবি দু'টি দেখানো হচ্ছিল। হেমাঙ্গদা প্রথম ছবিটির প্রচণ্ড ভক্ত হলেও সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন, তাঁর চীনা বন্ধুরা দ্বিতীয়টিকেই বেশি পছন্দ করছেন। এনিয়ে বিতর্ক তুললে একজন নার্স তাঁকে জানান: 'পথের পাঁচালী' ভালো, তবে দারিদ্র্যের যে চেহারা তাতে তুলে ধরা হয়েছে, তা অসম্পূর্ণ— কারণ সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সামান্যতম পরিচয়ও তাতে তুলে ধরা হয়নি। ছবি হিসেবে 'দো বিঘা জমিন' কম ভালো হলেও সেখানে শোষণ দেখানো হয়েছে। এই রাজনৈতিক সমালোচনা হেমাঙ্গদাকে গভীরভাবে নাড়া দেয় এবং শিল্পী-সাহিত্যের শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন করে তোলে। আরেকবার, ১৯৫৭-এ কেরালায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করার সংবাদ চীনে পৌঁছোলো, চীনা বন্ধুরা তাঁকে

অভিনন্দন জানিয়ে জানতে চান: কেরালায় কমিউনিস্টদের গণফৌজের সৈন্যসংখ্যা কতো? হেমাঙ্গদা ভারতীয় সংবিধান অনুসারে গণফৌজ ছাড়াও যে ভারতে শাসনক্ষমতায় আসা যায়, তা ব্যাখ্যা করে বোঝালে চীনা বন্ধুরা স্তম্ভিত হয়ে প্রশ্ন তোলেন— গণফৌজ ছাড়া কীভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব? এ ঘটনাটিও হেমাঙ্গদার রাজনৈতিক চেতনাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়।

নিজের তথা ভারতের কমিউনিস্ট ও গণনাট্য আন্দোলনের অতীত অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা, নতুন করে কিছু পড়াশোনা, এবং এই সব নাড়া দেওয়া অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে সম্ভবত নতুন এক রাজনৈতিক উপলব্ধিতে উপনীত হতে সাহায্য করে। এসময়েই ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে এবং ১৯৬২-র ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পার্টি দু'ভাগ হয়ে যায়। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তখন সোভিয়েত দূতাবাসের বার্তা বিভাগে চাকরি করছেন। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে আর যুক্ত না থাকলেও স্পষ্টতই তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের এবং ভারতে সিপিআইএম-এর পক্ষ সমর্থন করতেন। এ নিয়ে চাকুরি ক্ষেত্রে বেশ অসুবিধেতেই তিনি পড়েন। এসময়ই ১৯৬৬-তে খাদ্য আন্দোলন তাঁকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। এদিকে মিনার্ভা থিয়েটারে 'কল্লোল'-এর সঙ্গীত রচনা করেন। '৬৭-তে নকশালবাড়ীর বজ্র নির্ঘোষ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে 'তীর' নাটকে তাঁর সঙ্গীত পরিচালনা এবং এ নিয়ে সিপিএম-এ ন্যক্কারজনক অবস্থান তাঁকে এদের সম্পর্কে মোহমুক্ত ক'রে তোলে। এর পরেই '৬৮-তে চেকোশ্লোভাকিয়ার রুশ আক্রমণে সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠেন। এই সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ার ছদ্মনামে তিনি 'অনীক'-সহ প্রভৃতি তৃতীয় ধারার পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। এবং এগুলির মধ্যে দিয়ে তাঁর যে নতুন রাজনৈতিক অবস্থান গড়ে ওঠে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মূলত সেই অবস্থানেই তিনি অবিচল ছিলেন।

নকশালবাড়ী আন্দোলনকে তিনি তেলেঙ্গানার পর প্রকৃত অর্থে প্রথম কৃষক সংগ্রাম ব'লে মনে করতেন, কিন্তু এর মধ্যেকার 'বামপন্থী' সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি এবং বাস্তববোধহীন রোমান্টিকতার তিনি নির্মম সমালোচক ছিলেন। আবার, এই আন্দোলন ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও, এর ধাক্কায় উপরিকাঠামোয় যে প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছিল এবং নতুন প্রজন্মের সংগ্রামী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা উঠে এসেছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন, এবং তা তাঁর মধ্যে নতুন প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিলো। অন্যদিকে সংসদীয় কমিউনিস্টদের সংসদ-সর্বস্বতা ও বিপ্লবী-আন্দোলন-বিমুখতার তিনি মূলগতভাবে বিরোধী ছিলেন। ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিলো ঃ "তাঁরা ইতিহাস কর্তৃক তাঁদের ওপর অর্পিত ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।" তাই সামগ্রিকভাবে ভারতের তৎকালীন পরিস্থিতিতে প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের ব্যাপকতা দেখে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন: "আমি চিন্তিত, আমি গর্বিত। কিন্তু কে শুনবে আমার কথা, বা আমার মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের কথা। আজকাল আমার মাঝেমাঝেই মাও-এর একটা কথা মনে আসে ঃ Truth is sometimes alone। আমার জীবন ও উপলব্ধির সঙ্গে কথাটা বড়ো সুন্দরভাবে মিলে যায়।" কিন্তু তাঁর এই একাকীত্বের অনুভূতি সত্ত্বেও তিনি কিন্তু শুধু ঘরে বসে সঙ্গীতচর্চা করে দিন কাটাননি, বরং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অজস্র ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সাধ্য ও সম্ভবমতো সাড়া দিতে এগিয়ে গেছেন। যখনই যাকে সমর্থনযোগ্য মনে করেছেন, নির্দ্বিধায় তাকে সমর্থন করেছেন, আবার সমালোচনাযোগ্য হলে সমালোচনা করতেও পিছ-পা হন নি।

বেশ মনে পড়ছে, ১৯৬২-তে ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে উগ্র জাতীয়তাবাদের কুৎসিত আক্রমণের মুখে বামপন্থী মানসিকতা প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হয়েছিল, এবং তার তিন বছর পরে ১৯৬৫-তে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সেই আক্রমণে আবার নতুন করে তীব্রতা এনে দিয়েছিল। সেই পটভূমিকায় আমরা মফঃস্বল বাংলার পশ্চাৎপদ জেলা মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে যুব আন্দোলনের মঞ্চকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার উদ্দেশ্যে এক উৎসবের আয়োজন করি। এবং স্বভাবতই ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরোধিতা থেকে শুরু করে গণতান্ত্রিক অধিকার, রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি বলিষ্ঠভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরি। সিপিএম পার্টি নেতৃত্ব একে তেমন উৎসাহ না দেখালেও উৎসবের বিরাট সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাতে দ্বিধা করেন নি। কোনো সূত্রে আমাদের সেই সাফল্যের কথা কেমনভাবে যেন হেমাঙ্গদা জানতে পারেন, এবং কয়েকমাস পরে কলকাতায় প্রথম আলাপেই সেজন্য অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানান। পরবর্তীকালে ১৯৭৪-এর প্রথমে আমরা যখন '৬২-র পর প্রথম প্রকাশ্যে মুর্শিদাবাদ জেলা স্তরে ভারত-চীন মৈত্রী সম্মেলনের আয়োজন করি, তখন তার অন্যতম উৎসাহদাতা ছিলেন তিনি। সে বছরের মাঝামাঝি 'অনীক'-এর দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বহরমপুরে এসে ভারত-চীন মৈত্রী সমিতির ডাকা অন্য একটি সভায় প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে খোলা মাঠে একটি স্কুলের বারান্দায় প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে তাঁর সাম্প্রতিক চীন ভ্রমণের কাহিনী তুলে ধরে ভারত-চীন মৈত্রী আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার আহ্বান জানান। আবার ১৯৮১-তে বহরমপুরে প্রথম জেলা স্তরে বইমেলার অনুষ্ঠানে ১৯৭৪-এর সারা ভারত রেল-ধর্মঘট প্রসঙ্গে অজিত পাণ্ডে গণসঙ্গীত গাইতে শুরু করলে কংগ্রেস(ই)-র কিছু যুবক (সদ্য-পদত্যাগকারী রাজ্য-মন্ত্রী মনোজ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে) তাতে বাধা

দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু আমাদের সমবেত প্রতিরোধের সামনে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তার মাসখানেক পরে কলকাতা যেতেই তিনি এজন্য আমাদের প্রচণ্ড অভিনন্দন জানিয়ে খবর দেন, সম্প্রতি হাওড়ার কাছে সিটুর উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গান গাইতে গিয়ে প্রায় একইভাবে তিনি কংগ্রেসি মাস্তানদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন, কিন্তু উদ্যোক্তাদের প্রতিরোধের সাহস না থাকায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে গান না গেয়েই চলে আসতে হয়। প্রায় দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে এই সব টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্যে দিয়ে এভাবে যে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের পরিচয় পেয়েছি, সেটা দৃঢ় সামাজিক দায়বদ্ধতার এবং সচেতন বিপ্লবমনস্কতার। সেকারণেই ১৯৭৪-এ দ্বিতীয়বার চীন যাবার আগে তাঁকে সোভিয়েত দূতাবাসের চাকরি ছাড়তে হলেও, তিনি মুষড়ে পরেন নি, বরং ফিরে এসে বিপুল উদ্যমে ডাঃ কোটনিস স্মৃতি কমিটি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, এবং ১৯৭৭-এ রাজ্যস্তরে ভারত-চীন মৈত্রী সমিতি গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ দেখান। আবার মাও-উত্তর চীনের নেতৃত্ব যখন ধীরে ধীরে মাও সেতুঙের সমস্ত শিক্ষাকে বরবাদ করে দিয়ে সংশোধনবাদী পথে যাত্রা শুরু করলেন, তখন হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রকাশ্যেই তার সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। মাও-উত্তর চীনের সমাজতান্ত্রিক পথ থেকে বিচ্যুতির ধারাবাহিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর এই বিরোধিতার অবস্থান শেষ পর্যন্ত তিনি বজায় রেখেছিলেন।

১৯৭৫-৭৭-এর এমার্জেন্সি আমলে ভারতে গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর চরম আক্রমণের তিনি বিরোধী ছিলেন, এবং সেকারণেই ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটানোর দায়িত্বকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তিনি '৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট জনতা মোর্চাকে এবং বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টকে নেতিবাচক সমর্থন জানাতে এগিয়ে এসেছিলেন। আবার পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট শাসনে যখন গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর ধারাবাহিক আক্রমণ নেমে আসতে শুরু করলো, তখন এই শাসনের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। শোষণভিত্তিক সমাজের স্থিতাবস্থাকে মূলত অটুট রাখার উদ্দেশ্যে বামফ্রন্টের গণআন্দোলন বিমুখতার সমাজ-গণতন্ত্রী লাইনের তিনি প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন, এবং এজন্য বামফ্রন্ট জমানায় তাঁকে বহুবিধ অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে সব সময়েই তিনি সোচ্চার ছিলেন। ১৯৭২-এ পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাকালে তিনি এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি আন্দোলনে সব সময়েই তিনি সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। এমনকি বামফ্রন্ট জমানায় আজিজুল হকের মুক্তির দাবিতেও তাঁকে সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তিনি সবসময়েই প্রগতি সংস্কৃতির পক্ষে এবং অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে দক্ষিণপন্থী বা অতি বামপন্থী দু'ধরনের একপেশে বিশ্লেষণ সম্পর্কেই তিনি বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন। ১৯৮৫-৮৬-তে 'তরঙ্গপ্রবাহ' পত্রিকায় এ সম্পর্কে আমার একটি ছোটো লেখাকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক চলেছিলো, তাতে এককথায় রবীন্দ্রনাথকে নস্যাৎ করার প্রবণতাকে তিনি সমালোচনা করেছিলেন এবং সমালোচনামূলকভাবে রবীন্দ্রনাথের ইতিবাচক দিকগুলিকে গ্রহণ করা সম্পর্কে আমার অবস্থানকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। ১৯৮৭-তে '*অনীক*'-এর রবীন্দ্র-মূল্যায়ন সংখ্যায় প্রধানত প্রতিফলিত এই অবস্থানকে তাই তিনি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে নিজে এই সংখ্যায় লিখতে না পারার জন্য বারবার দুঃখপ্রকাশ ক'রে চিঠি দিয়েছেন। 'হোপ-৮৬'-র মাধ্যমে বামফ্রন্টের সাংস্কৃতিক দেউলিয়াপনার যে অভিব্যক্তি ঘটেছিলো, তার বিরুদ্ধেও তাঁর সমালোচনা অনেককে নাড়া দিয়েছিল।

এসব কিছু থেকেই ধরা পড়ে যে, জীবনের শেষ দু'-তিন দশক প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যোগ না থাকলেও তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সক্রিয়ই ছিলো, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও বিপ্লবমনস্কতার অবস্থানকে কখনোই তিনি বর্জন করেন নি।

চার

সবশেষে, তাঁর চরিত্রের আরেকটি দিকের কথা না বললে এই প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমাদের প্রগতি সাংস্কৃতিক জগতে প্রায়শই আমরা দেখে থাকি যে, অতীতের বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে অনেক সময়ে সঠিক বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করলেও, সেই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময়েই নিজেদের ভ্রান্ত অবস্থানকে আমরা সযত্নে চেপে রাখি— যেন অন্যেরা ভুল করলেও আমরা সেই ভুলের উর্ধ্বে ছিলাম। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ছিলেন এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, আত্মসমালোচনার দুর্লভ গুণ তাঁর মধ্যে বারবার ধরা পড়েছে।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ও গণনাট্য আন্দোলনে কীভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভ্রান্ত লাইনের শিকার হয়ে তিনি ভুল করেছিলেন— কাজের ক্ষেত্রে, সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে— বারংবার লেখায় ও বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেই তা তুলে ধরেছেন, এবং যেসব প্রসঙ্গে নিজের অতীতকেও সমালোচনা করতে তিনি কখনও পিছু পা হননি। ১৯৭৩-এ 'মোহন মুর্মু' ছদ্মনামে '*অনীক*'-এ প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলিতে, বা '*গণনাট্য আন্দোলনে আমার গান*'-শীর্ষক সাক্ষাৎকারে (বর্তমান সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত) তার অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যাবে। ১৯৫৭-র সর্বভারতীয় গণনাট্য সম্মেলনে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের প্রেরিত ম্যানিফেস্টোর খসড়ার অন্তর্নিহিত ভ্রান্ত বক্তব্যের জন্য সুধী প্রধান হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'রাজনৈতিক ধ্যানধারণার ধারাবাহিকতার অভাবের কারণে সমালোচনা করেছেন', কিন্তু হেমাঙ্গ বিশ্বাস নিজে আগেই সেজন্য আত্মসমালোচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, সুধী প্রধানের সম্পাদিত 'Marxist Cultural

Movement in India'-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর এর ভূমিকায় সুধী প্রধানের বক্তব্য নিয়ে 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকায় তাঁর সঙ্গে হেমাঙ্গদার প্রচণ্ড বিতর্ক হয়, কিন্তু সেই হেমাঙ্গদাই আবার পরে বিভিন্ন প্রশ্নে বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও এই দলিল-সংকলনের কাজের 'যথার্থ মূল্যায়ন' করে পরবর্তী খণ্ডগুলি প্রকাশে সুধী প্রদানকে সহযোগিতা করেন। সুধী প্রধান নিজেই সেকথা স্বীকার করেছেন।

শুধু আত্মসমালোচনার ক্ষেত্রেই নয়, অন্যের কাছে ঋণ স্বীকার করার ব্যাপারেও তিনি মুক্তমনের পরিচয় দিয়েছেন বারবার। তাঁর রচিত অনেক গানেরই সুর যে নেওয়া হয়েছিলো প্রচলিত বিভিন্ন লোকসঙ্গীত থেকে, এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন সাথীরা যে বিভিন্ন ভাবে তাঁকে পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন, তা স্বীকার করতে তাঁর বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিলো না। তাঁর কোন্ গানের সুরের কাছে তিনি কতোটা ঋণী, তাঁর লেখাতেই তার বিস্তৃত বিবরণ মিলবে। গণনাট্য আন্দোলনের অগ্রণী ব্যক্তিরা কীভাবে অন্যের জিনিষ আত্মসাৎ ক'রে নিজের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বাড়িয়েছেন, তার অজস্র তথ্য একটু খোঁজ করলেই মিলবে (একটি উদাহরণ: 'দো বিঘা জমিন' ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও বক্তব্যে বাংলা ছবি 'রিক্সাওয়ালা'র ভূমিকা— এবং এ প্রসঙ্গে সলিল চৌধুরীর কদর্য কুম্ভীলকবৃত্তি)। তাই এর বিপরীতে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ভূমিকা বিশেষ উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে।

তবুও কিন্তু ঠিক এই বিষয়েই তাঁর প্রতি কুৎসা করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন সিপিএম নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমবঙ্গ গণনাট্য সংঘের এক কর্ণধার। তাঁর এক কালের 'কমরেড'আশু সেন অভিযোগ তুলেছিলেন: যে 'কাস্তেটারে দিও জোরে 'শান' গানটি হেমাঙ্গদাকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছিলো, সেই গানটি সুরথ পালের রচনা, সুর দেওয়া হয়েছিলো শচীন দেববর্মণের একটি গানের সুরে, শুধুমাত্র পরিমার্জনা করেছিলেন হেমাঙ্গদা। অর্থাৎ অন্যের কৃতিত্ব হেমাঙ্গদা আত্মসাৎ করেছিলেন! এ প্রসঙ্গে হেমাঙ্গদা জানাচ্ছেন, বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে পঞ্চখণ্ডে মাসির বাড়িতে আশ্রয় নেবার সময় লুলা নদীতে মাঝির মুখে শোনা সারিগান "সাবধানে গুরুজীর নাম লইওরে সাধু-ভাই" গানের সুরে তিনি গানটি লিখেছিলেন, এবং বোহলি কৃষক সম্মেলনে গানটি নিয়ে গিয়েছিলেন সুরথ পালচৌধুরী, গেয়েছিলেন নির্মলেন্দু চৌধুরী। কার কথা বিশ্বাস করবো? হেমাঙ্গদাদের সুরমা ভ্যালি কালচারাল স্কোয়াডের অন্যতম সঙ্গীতশিল্পী (বর্তমান সংখ্যাতেও যাঁর লেখা আছে সেই বিখ্যাত শিল্পী) খালেদ চৌধুরী কিন্তু বলছেন, ওই গানটি ছিলো হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'স্বরচিত'। সবচেয়ে বড়ো কথা, ১৯৪৩-এ সিলেট থেকে 'বিষাণ' নামে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের যে গানের সংকলন বেরিয়েছিলো, তাতেও কিন্তু এই গানটি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের রচিত বলে বলা হয়েছিল।

হেমাঙ্গদা যতোদিন সিপিআইএম-এর সমর্থক ছিলেন, ততোদিন তিনি সিপিএম তথা পশ্চিমবঙ্গ গণনাট্য সংঘের নেতৃবৃন্দের চোখে ছিলেন 'মহান সঙ্গীতকার'। কিন্তু ১৯৬৫-তে সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থায় হেমাঙ্গদার সক্রিয়তা, ১৯৬৭-তে নকশালবাড়ী কৃষক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন এবং এই আন্দোলনের ভিত্তিতে রচিত 'তীর' নাটকের সঙ্গীত পরিচালনা, পরবর্তীকালে তাঁর রাশিয়ার বিরুদ্ধে ও চীনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট জমানার বিভিন্ন কার্যকলাপের বিরোধিতা প্রভৃতি তাঁকে সিপিএম-এর চক্ষুশূল করে তুলেছিলো। ফলত শেষ ক'বছরে সিপিএম নেতৃবৃন্দ তাঁকে কোণঠাসা, একঘরে ও অচ্ছুৎ করে রাখার সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এমনও হয়েছে যে, বামফ্রন্ট সরকার বা সিপিএম-এর কোনো গণসংগঠনের অনুষ্ঠানে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান গাওয়া হয়েছে, কিন্তু হেমাঙ্গ নিজে আমন্ত্রিত হন নি। বামফ্রন্ট জমানার প্রথম দিকে তবু কোনো কোনো অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা গেছে, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় বামফ্রন্টের আমলে তাঁকে অনুষ্ঠানে ডাকার প্রায় এক অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গিয়েছিলো। হেমাঙ্গদার মৃত্যুর পর সিপিএম তথা গণনাট্য সংঘ গতানুগতিক শোক প্রকাশ করলেও, তার ১৫ দিনের মধ্যেই 'গণশক্তি'-তে প্রকাশিত হয়েছিলো হেমাঙ্গদার বিরুদ্ধে আশু সেনের পূর্বে উল্লিখিত কুৎসা। এবং গণনাট্য সংঘের সঙ্গে অতীতে সামান্য জড়িত শ্যামল মিত্রের স্মৃতিতে 'গণশক্তি' একটি পুরো পৃষ্ঠা দিতে পারলেও, হেমাঙ্গদার জন্য তাঁরা এক কলমের বেশি বরাদ্দ করতে পারেন নি। এবং এই সব কদর্য ব্যবহারের কারণেই মৃত্যুর মাত্র দু'মাস আগে হেমাঙ্গদা একটি সভায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন: "গণনাট্য সংঘ আমার মা হ'লেও বর্তমান গণনাট্য সংঘ আমার সৎমা!"

মৃত্যুর এক বছর আগে 'আজকাল' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে, সিপিএম কেন তাঁকে অচ্ছুৎ করে রেখেছে, এ প্রশ্নের উত্তরে হেমাঙ্গদা বলেছিলেন : "আমি তাদের দালালি করি না তাই।" এরকম এক কুৎসার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৭-এ তিনি বলিষ্ঠকণ্ঠে জানিয়েছিলেন: তিনি কোনো পার্টিতে নেই বলেই তাঁর কোনো অবস্থান নেই একথা ঠিক নয়— তাঁর অবস্থান একজন কমিউনিস্টের অবস্থান, এবং এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, লেনিনের নেতৃত্বাধীন পার্টি থাকা সত্ত্বেও গোর্কি, বা মাও-এর নেতৃত্বাধীন পার্টি থাকা সত্ত্বেও লু শুন পার্টি সদস্য ছিলেন না। ওই একই মানসিকতা নিয়ে 'আজকাল'-এর ওই সাক্ষাৎকারে দৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন— তবু "একা আমি ফাইট কইর‍্যা যামু।" —শেষ পর্যন্ত দরকার হলে একা ফাইট ক'রে যাবার এই মানসিকতাই হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে বাংলা তথা ভারতের প্রগতি সংস্কৃতিকর্মী ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাছে প্রেরণার উৎস হিসেবে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

úéÅîf ï¸Ü°îûäÍ > ¯ÒNîïÛ‰ Nï¸‰î

নালিয়াপুল

সীমান্তে শান্তির প্রথম প্রহরী
সেতুবন্ধ শোণিত নদীর
রেলমজুরের হাতুড়ি পেটা
ইস্পাতের পুল
নালিয়াপুল।

খবর পাঠানো কত তার-বেতার
রক্তস্রোতে ভেসে গেছ তুমি
ডুবে গেছে ইমারত
ভগ্ন চুরমার।
উল্লাসে নদীর দুই পারে
কর্কশ চীৎকার করে
দেশপ্রেমী মেকী রক্তে নীলাভ শৃগাল
সাথে তার ধরে ঐকতান
বামপন্থী পুচ্ছধারী খলতন্ত্রী দাঁড়কাক,
কিন্তু তারা বিস্ময়ে অবাক!
ভয়ে স্তব্ধবাক!
ঝড়শেষে দিগন্তের দৃপ্ত রামধেনু
পাহাড়চূড়ায় তুঙ্গ বিজয়তোরণ
দাঁড়ায়েছ তুমি
নির্ভীক নির্ভুল
অজেয় নালিয়াপুল!

(২)

তবু জানি কুটিল আঁধার বারে বারে
যূথবাঁধা শ্বাপদেরা হানা দিবে কতো
পড়বে অনেক হিংস্রে
সুতীক্ষ্ণ থাবার দাগ
নখর ও খুর
কিন্তু এই পারঘাটা হবেনা তো পার
যুদ্ধজীবী এযুগের চেঙ্গিস তৈমুর।
ভাঙবে না একটিও খিল
শহীদের পাঁজরায় বাঁধা শক্ত খুঁটি
একটিও হবে না শিথিল।

তারপর আমাদের আসবে মিছিল
অন্তহীন শান্তি ক্যারাভান;
জ্বলন্ত মশাল হাতে হাতে
আততায়ী গোখরার বিষদাঁতগুলি
পায়ে পায়ে দলে
যেদিন পৌঁছাব সবে সীমান্ত সীমায়
সেদিন সগর্বে জানি দোলা খাবে তুমি
আরক্তিম ফেনিল উচ্ছ্বাসে
ভরবে দুকুল
শান্তিসেতু হে নালিয়াপুল!

আজ তাই থাক অগ্নি-আখরে খোদাই
প্রতিষ্ঠা দিবস,
সতের জুলাই,
বর্শাফলা দিক লাল রাস্তার নিশানা
এপারে,
ডিব্রুগড়
ওপারে—
নানকিং সাংহাই।

শিলং : সেপ্টেম্বর ১৯৪৯

নির্ভয়

আমি মহারাজ বেপরোয়া আজ মিছিলে হাঁটি
আপনারে ভাই ভাসায়েছি জন সমুদ্দুরে
পরপদলেহী বন্ধ্যা জীবনে টেনেছি ইতি
পাতি-বুর্জুয়া ময়ূর পক্ষ গিয়েছে পুড়ে।
বেকার বামন চাঁদের স্বপ্ন দেখেছি কতো
ধূমায়িত চাঁয়ে ধোঁয়াটে করেছি রাষ্ট্রনীতি
নিজেরে ঘিরিয়া উর্ণনাভরা বুনে যে জাল
কপট প্রেমের বেসাতি, রচেছি কাব্যগীতি।
নতুন দিনের স্বপ্ন আঁখিতে লেগেছে ঘোর
শত ঝড়ে বাঁকা বুকের পাঁজরা উঁচিয়ে চলি
আত্মরতির সুরার পেয়ালা চূর্ণ আজ
পদাতিক পায়ে ছন্দ পেয়েছে গানের কলি।
বকতপস্বী, চিনেছি এবার মুখোস খোলো
তোমাদের মুখে শুনেছি অনেক শাস্ত্র-কথা
মানবমৃগয়া করিছে যাহারা দিবসরাতি
মানবধর্ম প্রচারিবে তারা সহেনা যে তা।
খনির গর্ভে মরেছে যাহারা পাথর চাপা
তোমরা বলেছ ভুলতে তাদের অনেক ছলে
স্বর্ণশীর্ষ মন্দির দ্বারে ভিখারী সেবা
শানানো ছুরিকা লুকানো দেখেছি বেদীর তলে।
বিশ্ব মোদের জেনেছি এবার পরোয়া কার?
পাথুরে পেশীর হাতুড়ির ঘায়ে বেঁধেছি ঘাঁটি
স্ফীতোদর বাহী পরজীবী সব খবরদার
আমি মহারাজ বেপরোয়া আজ মিছিলে হাঁটি।

শিলং : ১৯৪৩ ইং

কাস্তেটারে দিও জোরে শান

তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান
কিষাণ ভাই রে,
কাস্তেটারে দিও জোরে শান।।

ফসল কাটার সময় হলে কাটবে সোনার ধান
দস্যু যদি লুটতে আসে কাটবে তাহার জান—রে।।

শান দিও, জোরসে দিও, দিও বারে বার
হুঁশিয়ার ভাই, কভু তাহার, যায় না যেন ধার—রে।।

ও কিষাণ তোর ঘরে আগুন, বাইরে যে তুফান
বিদেশী সরকার ঘরে, দুয়ারে জাপান—রে।।

একতায় ভাই চীনের মানুষ হইল বলীয়ান
ছয়টি বছর জাপানীরে করলো যে হয়রান—রে।।

এক হয়ে আজ দাঁড়াও দেখি মজুর কিষাণ
এক নিমেষে আসবে স্বরাজ, ঘুচবে অপমান রে।

রচনাকাল ঃ ১৯৪২

লঙ্গর ছাড়িয়া নাও-এর দে

লঙ্গর ছাড়িয়া নাও-এর দে দুঃখী নাইয়া
বাদাম উড়াইয়া নাও-এর দে
ঢেউ-এর তালে, তালে তালে করতালি দে
— কিরে হে হৈ হৈয়া
নয়া দিনের বইল রে নাও-মরা গাঙে।।

তোর ঘর ভাঙিলো, কুল ভাঙিলো ভাসলি অকূলে
কোন মানুষ-মারা কুম্ভীর আইলো সর্বনাশের খালে-রে
তোর ঘর ভাঙিল, কুল ভাঙিল;
তোর চক্ষের জলে সাঁতার পানি, বইল বারে বারে
—কিরে হে হৈ হৈয়া
খুন দরিয়ায় আইলরে ঢল, জীবন জোয়ারে।।

তোর মরণ কিসের, আজ বাঁচনের বিরাট খেলা
সবহারাদের ঘাটে ঘাটে সবপেয়েছির মেলারে—
আজ বাঁচনের বিরাট খেলা;
তোর ধলা পালে মনপায়রার পাখ্‌না মেলে দে
—কিরে হে হৈ হৈয়া
বদর, বদর, বদর, বদর জয়ধ্বনি দে।।

রচনাকাল ঃ ১৯৪৬

জালিনাবাগের জালালাবাদের

সুর : দেবব্রত বিশ্বাস

জালিনাবাগের জালালাবাদের এসেছে আদেশ
চলো চলো বীর, পরো পরো বীর
সৈনিকের বেশ।।
স্বাধীনতা-সংগ্রাম হয়নি তো আজো শেষ।।
হত্যাকারীর আজো হয়নি বিচার
হয়নি তো শোধ, দু'শতকের রক্তের যতো ধার
শোষণের কারাগার ঘিরে চারিধার
ভ্রাতৃবিরোধে ডুবেছে স্বদেশ।।
চলো চলো বীর...

এ'তো নহে বন্দর
এ যে চোরা বালুচর
দস্যুর ঘাটে তুমি ফেলেছ নোঙর
যাত্রীরা হুঁশিয়ার—
কুচক্রী কালো মেঘ ঘিরে চরাচর
যাত্রীরা হুঁশিয়ার—
ধ্বংসের দানবেরা মিলায়েছে হাত
স্বদেশে, বিদেশে মিলে একসাথ
হানো শেষ আঘাত, হানো শেষ আঘাত
বিষাক্ত নাগিনীরে কর নিঃশেষ।।

রচনাকাল ঃ ১৯৪৮

মাউন্ট ব্যাটেন মঙ্গল কাব্য

মাউন্ট ব্যাটন সাহেব ও
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে
থুইয়া গেলায় ও
তোমার সোনারপুরী আন্ধার কইরা ও ব্যাটন সাহেব
তুমি কই চলিলায়,
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও।

সর্দার কান্দে, পণ্ডিত কান্দে, কান্দে মৌলানায়
কিরে হায়, হায়, হায়।
আর মাথাই এসে মাথা কুটে বলদায় বুক থাপড়ায়।

তোমার শ্যামা চেট্টি ভক্তবৃন্দে ও
তারা ধুলায় গড়াগড়ি যায়।
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও।

কান্দে রাজা মহারাজা তোমার পোষ্য বাছা
ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কান্দে ও
কালা বাজারের প্যাট্‌লা হুতুম প্যাঁচা
তোমার নয়াদিল্লী ডুবু ডুবু ও
বুঝি ভঙ্গবঙ্গ ভেসে যায়
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও।

যেইন তোমার পরবর্তী
আইলা গোপাল রাজ চক্রবর্তী
আইলা গান্ধীভস্ম তিলক মাথায়
ধুতি চাদর গায়
মরি হায় হায়রে—
ক্লাইভ কার্জনের বংশে বাতি বামুনে জ্বালায়
মরি হায় হায়রে
বামুনের খুশী মন, হাপুস নয়ন
তোমার লেডির গাউন কান্দিয়া ভিজায়।
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও।

রাম গেলা বনবাসে—বেউলা হইলা রাঁড়ি
(আর) যুগল ব্যাটন বিলাত গেলা কান্দে গোপালাচারী
দিল্লী হইতে পুষ্পক রথে গেলায় উড়িয়া
করজোরে ভক্তবৃন্দ আসমানে চাইয়া
প্রভু নাই নাই রে।
কান্দিও না সর্দার পণ্ডিত
কাইন্দ না কাইন্দ না।
আমি যাহা দিয়া গেলাম নাই যে তার তুলনা—
(আমি যাই যাই রে)

যাইবায় যদি এটলী বাপার তুমি কইও গিয়া
ডোমিনিয়ন প্রেমের ডোরে রাখে যেন বান্দিয়া।
(হায় নাই নাইরে)
মিছা কেনে ভাবনা কর ভয়ের কিবা আছে
অশরীরী ছায়া আমার আমার থাকবে কাছে কাছে
আমি যাই যাইরে।।

তোমার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গতিক ভালো নয়,
জান সে মোদের খাঁচা ছাড়া কখন কি যে হয়।।
(প্রভু নাই নাই রে)।

আমরা আছি, মার্শাল আছে, আছে আমেরিকা
এই জাহাজের হও গাধা বোট নইলে বিষম ঠেকা।।
(আমি যাই যাইরে)

নয়া দিল্লীতে ঘোর কলিতে
আইলা কল্কি অবতার— কি বাহার
পতিত ভারত করিতে উদ্ধার।
বড় বড় দেশ নেতা দিলা পায়ে ধর্ণা
তপস্যায় লভিলেন বর স্বরাজ অন্নপূর্ণা।
"হবে ধনধান্যে পূর্ণা।"
হবে ধনধান্য পূর্ণা।

শুন শুন শুন সবে শুন দিয়া মন (ভালো বেশ বেশ)
স্বরাজের মাহাত্ম্য আমি করিব বর্ণন।। (ভালো বেশ বেশ)
পনেরো আগস্ট দিনে সাতচল্লিশ সন। (ভালো বেশ বেশ)
দশভুজা স্বরাজ দেবী কৈলা আগমন। (ভালো বেশ বেশ)
সাগর পারের বুড়ো সিংঘী রহিলা বাহন (ভালো....)
দশ হাতে দেখি নূতন দশ প্রহরণ। (ভালো...)
প্রথম হাতেতে ধরেন খড়্গ প্রহরণ। (ভালো...)
অখণ্ড দেশের মুণ্ড করিলেন ছেদন। (ভালো...)
দ্বিতীয় হাতে বরাভয় অহিংস ব্যাটন (ভালো...)
সাধুরে দমন করেন চোরেরে পালন। (ভালো...)
তৃতীয় হাতে করেন দেবী কন্ট্রোল নিধন (ভালো...)
এক দৌড়ে চল্লিশ টাকায় ওঠে চালের মন। (ভালো...)
চতুর্থ হাতেতে করেন বসন হরণ (ভালো...)
ল্যাংটা শিবের ধর্ম দেশে করেন প্রচলন। (ভালো...)
পঞ্চম হাতে বশীকরণ মারণ উচাটন (ভালো...)
ক্ষুধার ভূত কাঁদুনে গ্যাসে করেন বিতাড়ন। (ভালো...)
ষষ্ঠ হাতে বন্ধ করেন জাতীয়করণ (ভালো...)
জাতিভেদ দূর, আসে বিজাতী মূলধন। (ভালো...)
সপ্তম হাতে করেন দেবী দালাল ইউনিয়ন (ভালো...)
কৃষকসভা, মজুর সংঘে পাঠান বিভীষণ। (ভালো...)

অষ্টম হাতে ভক্তজনে বর বিতরণ (ভালো...)
মন্ত্রীগিরি, কন্ট্রাকটারী করিলেন বন্টন। (ভালো...)
নবম হাতে গান্ধীভস্ম ঔষুধ ধারণ (ভালো...)
রাষ্ট্রদ্রোহী সর্বরোগে বিশল্যকরণ। (ভালো...)
দশম হাতে নিরাপত্তার নাগপাশ বন্ধন (ভালো...)
লাল জুজু নিশম্ভুরে করিতে নিধন। (ভালো....)
কণ্ঠে তার গড় সেভ দি কিং জনগণমন।
দেশবাসী কর দেবীর গুণ সংকীর্তন।।
এবার দেশবাসীগণ গাও স্বরাজ ভজন
রঘুপতি রাঘব মাউন্ট ব্যাটন।
জয় জয় রঘুপতি রাঘব মাউন্ট ব্যাটন।
টাটাবিড়লা তেরে নাম
জয় বল্লভ গোপাল রাজা রাম।।
মজুর কিষাণ হ্যায় নিমক হারাম
মুঝকো মুনাফা দে ভগবান।।
যে বাঁশেতে বাজলোরে ভাই স্বরাজের বাঁশরী
সেই বাঁশ যে ডাণ্ডা হইয়া মাথায় মারলো বাড়ি।
(আহা মরি মরি মরি)
মাটি চাইয়া লাঠি পাইলাম দিয়া বুকের খুন
হাসির বদল ফাঁসি পাইলাম দই-এর বদলে চুন।
(আহা মরি মরি মরি)
চাকরী চাইয়া ছাঁটাই পাইলাম কাপড় চাইয়া দড়ি
এখন কলস যে ভাই কিনি হাতে নাইতো এমন কড়ি।
(আহা মরি মরি মরি)
হিন্দুস্তানে শ্বশুরবাড়ি পাকিস্তান ঘর
মধ্যিখানে ভূতের ময়দান বউ যে হইল পর।।
(আহা মরি মরি মরি)
রামরাজ্য চাইয়া পাইলাম হনুমানের বংশ
লেজের আগুন দিয়া সোনার লঙ্কা করে ধ্বংস।।
(আহা মরি মরি)
ঠগের বাড়ি নিমন্ত্রণ, বুঝিলাম আবেলা
রাজভোগ খাওয়াইবো কইয়া খাওয়াইলো কাঁচকলা।।
(আহা মরি মরি)
মাথায় ভাঙলো কাঁঠাল ভাইরে মুখে লাগলো আঠা
স্বরাজের মন্দিরে আমরা হইলাম বলির পাঁঠা।।
(আহা মরি মরি)

মাউন্ট ব্যাটন মঙ্গল কাব্য হেথায় সাঙ্গ হইল
প্রেমানন্দে বাহু তুলে রাম রাম বলো।
এবার দেশবাসীগণন গাও স্বরাজ ভজন
রঘুপতি রাঘব মাউন্ট ব্যাটন।।

রচনাকাল ঃ ১৯৪৮

ভেদি অনশন মৃত্যু

রুশ বিপ্লবের সময়কার রেডগার্ড বাহিনীর গান

ভেদি অনশন মৃত্যু তুষার তুফান
প্রতি নগর হতে গ্রামাঞ্চল
কমরেড লেনিনের আহ্বান
চলে মুক্তি সেনাদল।।

অতিক্রান্ত ওই প্রান্তর গিরিদুর্গম
পূর্ব সীমান্তে ধায় পল্টন
প্রাইমোরিয়ার শেষ দুর্গে
আশ্রয় নিয়েছে দুশমন।।

যুদ্ধলাঞ্ছিত বিবর্ণ লাল পতাকা
মহাগৌরবে উর্ধ্বে উড্ডীন
সদ্যসিক্ত রক্তের রঙে
হলো সহস্রগুণ রঙীন।।

চিরস্মরণীয় ইতিহাসে সেই মহাদিন
নিখিল বিশ্বে যে কাহিনী প্রচার
মহাবিক্রমে লাল পল্টন
শেষ দুর্গ করে অধিকার।।

নিশ্চিহ্ন হলো শত্রু সৈন্য
জাহান্নামে দস্যু বিলীন
প্রশান্ত সাগর তীরে
শ্রমিক পতাকা উড্ডীন।।

অনুবাদকাল ঃ ১৯৪৯

শঙ্খচিল

সুদূর সমুদ্দুর প্রশান্তের বুকে
হিরোশিমা দ্বীপের আমি শঙ্খচিল
আমার দু'ডানায় ঢেউয়ের দোলা
আমার দু'চোখে নীল শুধু নীল;
সাগরের জলে সিনানের শেষে প্রবালের সিঁড়ি বেয়ে
মৎস্যগন্ধা মেয়ে
ঝিনুক নূপুরে রুণু ঝুনু ঝুনু
যেতো সে সাগরিকা
ঝিলিক মিলিক নাচিয়ে গলায় মুক্তার মালিকা।

পূর্বাচলের প্রাঙ্গণে
সাগরিকার অঙ্গনে
দিগবধূরা খেলেরে—
সমুদ্রহিল্লোলে তার দোলে হৃদয় দোলে
শঙ্খচিলের সঙ্গীতে তার স্বপন দুয়ার খোলে
দারুচিনি বনের পাখায় সোহাগ চামর দোলে
দোলে হৃদয় দোলে....।

হঠাৎ সেদিন শুভ্রশরৎ সকালে
মায়াবী রোদের রূপালী ঝালর ছিন্ন ভিন্ন করে
কোন বিষাক্ত বাসুকীর ফণা দিগন্ত দিল ঢেকে।
প্রলয়ংকর নিঃশ্বাসে তার ধ্বংস ছড়াল দিক্‌বিদিক
আণবিক সে, দানবিক সে মৃত্যু-নৃত্য নেচে
ধ্বংস-নৃত্য নেচে।
দারুণ আগুন দহনজ্বালায় দগ্ধ ভস্মীভূতা—
প্রশান্তদুহিতা।

প্রশান্তদুহিতা, মরমিয়া মিতা কোথা সাগরিকা গো
বাতাসে ঝুরিছে বাদল ঝিরঝির আকাশে ঝুরিছে তারা
দিগ্‌বধূরা গুমরি গুমরি কাঁদিছে সঙ্গীহারা
বেলাভূমি বুকে আছাড়ি ঢেউ কাঁদে, কোথা সাগরিকা গো।
আমার এ অঙ্গীকার, আমার এ অঙ্গীকার
আক্রান্ত প্রশান্তের অশান্তবিহঙ্গ দুরন্তদুর্নিবার।
ঝড়ের নিশানা আমার দু'ডানা চির উড্ডীন, অক্লান্ত
প্রশান্ত হতে অতলান্ত
প্রতিরোধ, প্রতিশোধ, চিরক্ষমাহীন চিরক্ষমাহীন।
আমার শান্তিগানে বিদ্রোহবান আনে
আফ্রোএশিয়া আমেরিকায়
আমার ডানায় তোলে আঁধিয়া আকাশতলে
ঝনন ঝনন মরুঝঞ্ঝা সাহারায়,
নদনদী প্রান্তরে অরণ্য অন্তরে-পাহাড় গহ্বরে
রক্তে আদায় করি রক্তের ঋণ
আমিই ভিয়েৎমিন আমিই ভিয়েৎমিন আমি ভিয়েৎমিন।

রচনাকাল : ১৯৬৪

আমার তো ভুলি নাই শহীদ

আমরা তো ভুলি নাই শহীদ একথা ভুলবো না
তোমার কইলজার খুনে রাঙাইলো কে আন্ধার জেলখানা।
যখন গহীন রাতে আন্ধার পথে চমকায় বিজলী
(তোমার) বুকের খুনের দাগে দাগে আমরা পথ চলি;
সেই কাল সাপেরই কুটিল গুহায় আমরা যে দেই হানা
তোমার বহুল বুকে ছোবল দিল যে নাগিনীর ফণা।।

বলো কি করে ভুলি সে কথা
খুন করে গোপনে তোমার জ্বালাইল চিতা,
সেই চিতার আগুন জ্বলে দ্বিগুণ
জ্বলে দিকে দিকে রে বন্ধু
জ্বলে বুকে বুকে রে বন্ধু
জ্বলে চোখে চোখে—
জ্বলে অগ্নিকোণে রক্তমেঘে কালবৈশাখীর ডানা।।

তুমি ছিলায় গরীব কিষাণ এই মাটির সন্তান
হাতে নিলায় তাই তো বন্ধু দুঃখীর এই লাল নিশান
রে সাথী সবহারার নিশান
সেই লাল নিশানের মান রাখিতে দিলায় বন্ধু জান
বন্ধু, লুটাইলায় পরাণ
তোমার রক্তে রাঙা নিশান দিল পথের নিশানা।।

রচনাকাল : ১৯৫০

পুবদিক লাল

মূল গান : চীনা লোকসঙ্গীতকার উ-য়ান

পূবদিক লাল সূর্যের আভায়
বিশ্বের শোষিতের মন রাঙায়
সেই সূর্যের নাম মাও সেতুঙ
হুআর হেইয়া—চিন্তা তার ছড়ায় আগুন।।

মাও সেতুঙ মোদের ত্রাতা
নয়াচীনের রূপকার মহানির্মাতা
সম্মুখ সাগর হতে পার
হুআর হেইয়া—মাও মোদের কর্ণধার।।

কমিউনিস্ট পার্টি আলোর নিশান
বিপ্লবী বিশ্বের দুর্জয় গান
সাম্রাজ্যশাহীর অন্তিমকাল
হুআর হেইয়া—মুক্তির উজ্জ্বল সকাল।।

অনুবাদকাল ঃ ১৯৭১

আমরা করবো জয়

মূল গান : মার্কিন লোকসঙ্গীতশিল্পী পিট সিগার

আমরা করবো জয়
আমার করবো জয় নিশ্চয়
আহা বুকের গভীর আছে প্রত্যয়
আমরা করবো জয় নিশ্চয়।।
আমাদের নেই ভয়(৩) আজ আর
আহা বুকের গভীর আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়।।
আমরা নই একা (৩) আজ আর
আহা বুকের গভীর আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়।।
সত্য যে সাথী, (৩) (মোদের)
আছে মুক্তির পথ বক্ষপাতি
সত্য যে মোদের সাথী।।

অনুবাদকাল ঃ ১৯৬৫

আরো বসন্ত বহু বসন্ত

মাও সেতুঙের মহাপ্রয়াণ

আরো বসন্ত, বহু বসন্ত
তোমার নামে আসুক,
তুমি তো সূর্য অস্তবিহীন
চির জাগরুক।।

ঝড়ের রাতে ক্ষিপ্ত বাতাসে
ঢেউ যদি ওঠে— উঠুক
পূর্ব দিগন্তে জাগরী নাবিকের
দীপ্ত মশাল মুখ।
চির জাগরুক।।

কারাগারে বন্দীর বন্দনা
গভীর অরণ্যে, গেরিলার পথ চলায়
আফ্রো-এশিয়ায়, লাতিন আমেরিকায়
দাবানল জ্বলে—জ্বলুক;
চলমান তব, বিজয়ী সেনাদল
হাতে হাতে বন্দুক।
চির জাগরুক।।

অনুবাদকাল ঃ ১৯৭৬

আজাদী হয়নি আজও তোর

আজাদী হয়নি আজও তোর
নব-বন্ধন শৃংখল ডোর
দুঃখ রাত্রি হয়নি ভোর
আগে কদম কদম চল জোর।।

শত শহীদের আত্মদান
একি তারই প্রতিদান
দেশদ্রোহীর এ বিধান
চূর্ণ কর কর অবসান।।

সাম্রাজ্যশাহীর পাতা ফাঁদ
খুনী ধনিকের এ বনিয়াদ
ভাঙরে ভাঙ শোষণের বাঁধ
শোন তেলেঙ্গানার সংবাদ।।

ওরে ও কিষাণ মজদুর
আর মনজিল নয় নয় দূর
ওরে তবু তো পথ বন্ধুর
ডাকে উত্তাল জলসমুদ্দুর।।

রচনাকাল ঃ ১৯৪৯

জন হেনরী

মূল গান : অজ্ঞাতনামা মার্কিন লোকসঙ্গীত শিল্পী

নাম তাঁর ছিল জন হেনরী
ছিল যেন জীবন্ত ইঞ্জিন
হাতুড়ির তালে তালে গান গেয়ে শিস্ দিয়ে
খুশি মনে কাজ করে রাতদিন।।
হো হো (৪) খুশি মনে কাজ করে রাত দিন।।

কালো পাথরে খোদাই জন হেনরী
গ্র্যানাইটে গড়া পেশী ঝলমল
হাতুড়ির ঘায়ে ঘায়ে পাথরে আগুন ঝরে
হাতুড়ি চালানো তার সম্বল।।
হো হো (৪) হাতুড়ি চালানো তার সম্বল।।

ভার্জিনিয়ার রেল-সুড়ঙ্গে
পাথুরে পাহাড় কেটে কেটে
রেল লাইন পাতা হবে হেনরীর হাতুড়ির
ঘায়ে ঘায়ে রাত যায় কেটে।।
হো হো (৪) ঘায়ে ঘায়ে রাত যায় কেটে।।

জন হেনরীর চির প্রিয় সঙ্গিনী
নাম তার মেরী ম্যাগডেলিন
সুড়ঙ্গের কাছে যেতো কান পেতে শুনতে
হেনরীর হাতুড়ির বীন।।
হো হো (৪) হেনরীর হাতুড়ির বীন।।

সাদা সর্দার কাজ চায় আরো
স্টিম ড্রিল করে আমদানী
আশঙ্কা হেনরীর মেসিনের কাছে বুঝি
পেশী নিবে পরাজয় মানি।।
হো হো (৪) পেশী নিবে পরাজয় মানি।।

আমি মেসিনের হব প্রতিদ্বন্দ্বী
জন হেনরী বলে বুক ঠুকে
স্টিম ড্রিলের সাথে চলে হাতুড়ি পাল্লা
কে আর বলো তাকে রোখে।।
হো হো (৪) কে আর বলো তাকে রোখে।।

সাদা সর্দার বলে হেসে হেসে
কালো নিগারের দেখো দুঃসাহস
তোর যদি জয় হয় হবে না সূর্যোদয়
দুনিয়াটা হবে তোর বশ।।
হো হো (৪) দুনিয়াটা হবে তোর বশ।।

জন হেনরীর হাতুড়ির ঝলকে
চমকায় বিজলীর গতি
মানুষের সৃষ্টি দুরন্ত স্টীম ড্রিল
মানুষেরই কাছে মানে নতি।।
হো হো (৪) মানুষেরই কাছে মানে নতি।।

অগ্নিগিরি হলো রুদ্ধ
থেমে গেলো হাতুড়ির শব্দ
হেনরীর জয়গান চারিদিকে ওঠে যবে
হৃৎপিণ্ড তার স্তব্ধ।।
হায় হায় (৪) হৃৎপিণ্ড তার স্তব্ধ।।

জন হেনরীর কচি ফুল মেয়েটি
পাথরের বুকে যেন ঝর্ণা
মার কোল থেকে সে পথ চেয়ে আছে কার,
বাবা তার আসবে না, আর না
হায়, হায় বাবা তার আসবে না, আর না।

পাখির কাকলি ভরা ভোরে
পূবালী আকাশ যবে রঙীন
হেনরীর বীরগাথা বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে
সিটি দিয়ে চলে যায় ইন্‌জিন্।।

প্রতি মে দিবসের গানে গানে
নীল আকাশের তলে দূর
শ্রমিকের জয়গানে কান পেতে শোনো ঐ
হেনরীর হাতুড়ির সুর।
হো হো (৪) হেনরীর হাতুড়ির সুর।।

অনুবাদকাল : ১৯৭৩

úéÂîf ï¸Ü°îûäÍ Íg£î

গণনাট্য-আন্দোলনে আমার গান

আমার রচিত গানের ইতিবৃত্ত জানতে চেয়েছেন আপনারা। সে তো অনেক দিনের কথা— ১৯৪১ থেকে ১৯৭৬। এবং মনে করবেন না যে আমার গান থেমে গেছে। পুরোনো অনেক গানই দেখছি হারিয়ে গেছে। যা আছে তারও সংখ্যা হবে দু'শোর কাছাকাছি। এসব গান গণআন্দোলনজাত। কাজেই গানের আলোচনায় সমসাময়িক আন্দোলনের ও কমিউনিস্ট রাজনীতির কথা আসবেই। তাছাড়া আমি গোড়া থেকেই গণনাট্যের সংগঠক ছিলাম, সেজন্য গণনাট্য-সংগঠনগত প্রশ্নও আসবে। সাধারণ জনতার ও অগ্রণী কর্মীদের মতামত সব সময়েই আমাকে প্রভাবিত করেছে। আমার অধিকাংশ গানের সুর উৎপাদনকারী, শ্রমজীবী জনগণের সৃষ্টি। আমার গান আমার একার সৃষ্টি নয়, একটা আন্দোলনের সৃষ্টি।...

পটভূমি

ত্রিশের দশকে স্পেনের গৃহযুদ্ধে International Column-এ রাল্‌ফ ফক্স, কডওএল, লরকার মতো শিল্পী বুদ্ধিজীবীর আত্মদান সারা পৃথিবীতে প্রগতিবাদী শিল্পীবুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা নতুন দায়বদ্ধতার প্রেরণা জাগিয়েছিলো। সেই প্রেরণাতেই ১৯৩৫ সালে জন্ম নিয়েছিলো 'প্রগতি লেখকশিল্পী সংঘ'। একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো 'সর্বভারতীয় কৃষকসভা'। লালঝাণ্ডার নিচে সংঘবদ্ধ কৃষকশ্রেণী ঔপনিবেশিক ভূমিব্যবস্থায় কৃষিবিপ্লবের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসে নবসংস্কৃতি আন্দোলনের পশ্চাৎপট সৃষ্টি করেছিলো।

১৯৩৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লখ্‌নউ অধিবেশনের প্যান্ডালে (নেহরু তখন কংগ্রেস সভাপতি), প্রেমচন্দকে প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের প্রথম সভাপতি নির্বাচন করা হয়। এই আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পটভূমিতেই প্রগতি শিল্পসাহিত্য আন্দোলনের সূত্রপাত। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সামন্তবাদবিরোধী সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদী অবক্ষয়ী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নতুন জনগণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার, কমিউনিস্ট শিল্পী সাহিত্যিকদের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার দায়িত্ব এসে গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় '৩৯ সালে। '৪১ সালে হিট্‌লার সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করার পর যুদ্ধের চরিত্র বদলে যায়। তখন আন্তর্জাতিক স্তরে প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ায় ফ্যাসিস্টরা, গড়ে ওঠে ফ্যাসিবিরোধী ফ্রন্ট। এরই মধ্যে ১৯৪৩ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে 'গণনাট্য সংঘের' জন্ম হয়।

প্রগতি লেখকশিল্পী সংঘ থেকে স্বতন্ত্র সংগঠন হিসেবে গণনাট্য সংঘের আত্মপ্রকাশের কারণ ছিল। লেখকদের কারবার লিখিত শব্দ নিয়ে, তাঁদের আবেদন সীমাবদ্ধ শিক্ষিতদের মধ্যে। কিন্তু আমরা যারা গান গাইতাম, নাটক করতাম তাঁদের আবেদন এই নিরক্ষর দেশে অনেক ব্যাপক— জনতার সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের। সুতরাং গণনাট্যসংঘের আলাদা সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন ছিলো।

দেশে তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ওদিকে বর্মা সীমান্তে জাপানী ফ্যাসিস্টরা আগতপ্রায়। আমাদের পার্টির তখনকার 'জনযুদ্ধ' লাইন তত্ত্বগতভাবে ঠিকই ছিলো, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের মারাত্মক ভুল থেকে গেলো। সশস্ত্র গণবাহিনী তৈরি ক'রে নিজেদের স্বতন্ত্র শক্তি বজায় রেখে ফ্যাসীবিরোধী যুদ্ধপ্রয়াসে সহায়তা করার বদলে আমরা বৃটিশের যুদ্ধপ্রয়াসেরই লেজুড় হয়ে উঠলাম। দেশব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অভ্যুত্থান থেকে আমরা দূরে সরে নিষ্ক্রিয় থেকে কেবল সমালোচনা করলাম। কেবল তাই নয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে আমরা পঞ্চম বাহিনীর কাজ বলে চিহ্নিত করলাম।

আমার— আমাদের সবারই— এই সময়কার রচনায় এই সবই প্রতিফলিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা গানে কবিতায় কেবল মজুতদারের কথা, কেবল উৎপাদন বাড়ানোর কথা, কিন্তু যে বৃটিশ সামাজ্যবাদ এ দুর্ভিক্ষ তৈরী করলো, তার বিরুদ্ধে একটা কথাও নেই। সুকান্তর বিখ্যাত 'শোন্‌রে মালিক, শোন্‌রে মজুতদার' কবিতার মধ্যে কি কোথাও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য আছে? বিষোদ্‌গার কেবল মজুতদারের বিরুদ্ধে। এই সবই পার্টি লাইনের প্রতিফলন।

একদিকে বাংলার দুর্ভিক্ষ, অন্যদিকে জাপ-আক্রমণ— এই হলো আমার প্রথম যুগের গান রচনার প্রতিপ্রেক্ষিত।

আমরা পার্টিতে এসেছিলাম গান করার জন্য নয়, বিপ্লব করার জন্য। সত্যি কথা বলতে বিপ্লবের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বাহিনীও যে সশস্ত্র বাহিনীর মতোই প্রয়োজন, মাওয়ের এই তত্ত্ব তখন আমাদের অজানা ছিলো। কাজেই, পার্টি নেতারা যখন বললেন, 'তোমার শরীর খারাপ, মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ানোর কাজ তুমি পারবে না, তুমি বরং গান লেখো' তখন মনটা বেশ খারাপই হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তারপরই যখন শুনতাম যে কৃষকরা আমার গান ''লুফ্যা নিতেছে'' তখন ভারি আনন্দ হতো, মায়াকভস্কির কবিতার একটা কথা মনে হতো— How beautifully ill! আমার গান যে কৃষকদের মধ্যে ছড়াতে পেরেছিলো তার একটা মস্ত বড়ো কারণ এই যে, লোকসংস্কৃতির বিরাট সমুদ্র থেকে কিছুটা জলবিন্দু আমি পান করেছিলাম এবং খানিকটা ব্যবহার করতে পেরেছিলাম। আমার শিল্পচেতনায় লোক-ঐতিহ্যের সঙ্গে একটা যোগ তৈরী হয়ে ছিলো আগে থেকে। এ ব্যাপারটা বোঝাতে গেলে ব্যধ্য হয়েই ব্যক্তিগত

প্রসঙ্গের কিছু অবতারণা করতে হবে।

গণশিল্পীর বিকাশ, প্রস্তুতিপর্ব

আমার বাবা ছিলেন জমিদার। ছোটো জমিদার, কিন্তু শরৎবাবুর 'মহেশ' গল্পে যেমন, জমিদার ছোটো, তবু দাপটে টুঁ শব্দ করার জো নেই। বাড়ীটা ছিলো একেবারে রামগরুড়ের বাসা— পাঁজিপুঁথি, হাঁচি-টিকটিকি, অসংখ্য দেবাদেবীর উৎপীড়ন। প্রজাদের ওপর মারধোর, অত্যাচার এসব ছিলো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। যে জিনিষটা আমার শিশুমনকে সবচেয়ে বেশি আঘাত দিতো সেটা এই যে শিল্পী হিসেবে, ঢুলী হিসেবে, গীতিকার হিসেবে যারা আমাকে মুগ্ধ করতো, তারাই দেখতাম নানাভাবে উৎপীড়িত; সামাজিক দিক থেকে তারা অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য। একবার মনে আছে, ভোরবেলা চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে দেখি, বাড়িতে পুলিশবাহিনী। ১১০ ধারা প্রয়োগ ক'রে 'ডাকাত' ধ'রে এনেছে, এবং স্বভাবতঃই আমার জমিদার পিতার লাঠিয়ালদের সাহায্য নিয়েছে, তাঁরই বাড়িতে উঠেছে। এইটাই তো ছিলো রেওয়াজ। দোতলা থেকে নিচে নেমে দেখি, অন্যান্যদের সঙ্গে সে তল্লাটের নামকরা *গগন ঢুলীকেও* ধ'রে এনেছে। যার ঢোলের কাজ আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করতো তাকেই এই ভাবে 'ডাকাত'-রূপে লাঞ্ছিত হতে দেখে আমার শিশুমনে বড়ো আঘাত লেগেছিলো ঃ লোকটা কিনা ডাকাত! আর একজন ছিলো *কৈলাস*, ঢোলক-বাদক। আমরা বলতাম তার ঢোলক বাজে না, কথা কয়। বাউল গানে সে ছিলো অপরিহার্য। সেই *কৈলাস* আমাদের বাড়িতে বেগার খাটতো। *সুবল* নামে এক 'মাছিমল' অর্থাৎ মুসলমান জেলে গান গাইতো পূর্ববাংলার শ্রেষ্ঠ কবিয়াল *হরি আচার্যের* দলে। আমাদের বাড়িতে সে এসেছিলো। কী অপূর্ব তার গান। এই কবিগানের অন্তরা গাইবার ঢং আমার কণ্ঠকে তৈরি করেছিলো। এইসব গান গেয়ে গেয়ে মাঠ পেরিয়ে ইস্কুল যেতাম আমি।

কত নামই তো মনে পড়ে। একজন ছিলো *মীর্ধা*— গ্রামের বাঁশের ঘরের স্থপতি, architect। বাঁশের ঘরের ছক (plan) তৈরিতে সে ছিলো ওস্তাদ লোক। সেই মীর্ধা গাইতো মনসামঙ্গল। কাহিনী তো সবারই জানা, কিন্তু সে যখন গাইতো : বিপুলায় (বেহুলার) রন্ধন করে/নিদ্রা যায় লখিন্দরে রে/মরি হায় হায় রে— তখন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকতো উঠোন ভর্তি শ্রোতা। গানে নাটক করতো সে। আমাদের গ্রামের *প্রমোদ মেস্তরী* যেমন ভালো গান গাইতো, তেমনি রচনা করতো। গাঁয়ের উপর দিয়ে প্রথম এরোপ্লেন যাওয়াকে সে গানে ধরে রেখেছিলো ঃ এংরাজের কারিগরি— শূন্যেতে যায় হুরুপ্লেন গাড়ি। হবিগঞ্জের এক খঞ্জ মুসলমান ভিক্ষুক গাইতো ঃ এমন ভাবের নদীতে সইগো, ডুব দিলাম না।/আমি মনে করি ডুবি ডুবি/ডুবার ভয়ে ডুবলাম না.../কালো ভ্রমর বুঝে মধুর মর্ম, গোবরা পুকায় বুঝেনা।

হঠাৎ কোনোদিন আলখাল্লা পরে, উপরে পিতলের অর্ধচন্দ্র-গাঁথা লাঠি হাতে কোনো গাজীর-গীত গাইয়ের, বা হাতে 'লাউয়া' নিয়ে মাথায় তিলক আঁকা কোনো বৈষ্ণবীর, কিংবা চোত মাসে শিঙা বাজিয়ে গাজনের গান গাইতে গাইতে হরগৌরীর প্রবেশ ঘটতো আমাদের অচলায়তনে।

গানের প্রতি আমার এই আকর্ষণ কিন্তু বাবার মোটেই মনঃপূত ছিলো না। তাই ইস্কুল যাওয়ার পথে মাঠ ঘাট ছিলো আমার গাইবার ক্ষেত্র। ক্ষেতের কৃষকরা আমার গান শুনতে খুব ভালোবাসতো। এমন ক'রে মাঠের সঙ্গে হাওয়ার সঙ্গে আমার গানের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেলো।

এছাড়া আরো কতকগুলো সাংগীতিক প্রভাব ছিলো। আমার মা খুবই ভালো গান গাইতেন। বিভিন্ন ধরনের মেয়েলী গান, রজনীকান্তের গান, শ্যামাসংগীত তাঁর গলায় শুনেছি। মামার বাড়িতে ওস্তাদি গানের চর্চাও ছিলো পুরুষানুক্রমিক। দাদামশাই রামমোহন চৌধুরী ছিলেন নামকরা ওস্তাদ— আফ্‌তাবউদ্দীন, আলাউদ্দীন মাঝে মাঝে আসতেন তাঁর বাড়ি। মার কাছে এঁদের গল্প শুনেছি ছোটোবেলায়। আফতাউদ্দীন 'আউলিয়া' হয়ে গাছতলায় থাকতেন। শিষ্য মনমোহন দত্ত গান রচতেন, আফতাবউদ্দীন দিতেন সুর। মার কাছে সেসব গানও শুনেছি। এ গানগুলি রাগসংগীতে বাঁধা থাকতো।

আমাদের "ভদ্র" গানগুলিতে ইতিমধ্যে রবীন্দ্রসংগীত প্রচলিত হয়ে গেছে। আমার ইস্কুলের হেডমাষ্টার দ্বারিকা চক্রবর্তী মশায়ের পরিচালনায় স্কুলে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ' গেয়ে পুরস্কার পেয়েছিলাম মনে আছে। আর একটু বেশি বয়সে হিমাংশু দত্ত, শচীন দেববর্মন, অজয় ভট্টাচার্য প্রমুখের দ্বারা বিশেষভাবেই প্রভাবিত হয়েছিলাম। অজয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে পত্রালাপ চলতো আমার। আঙুরবালা, ইন্দুবালা, কে মল্লিক, প্রমুখের গ্রামাফোন রেকর্ড তখন আমাদের মধ্যে খুব চালু। তবে আমার বিশেষ প্রিয় ছিলো জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর গাওয়া বাংলা রাগসংগীতগুলি। এছাড়া নজরুলের গজল ও উদ্দীপক গান তো ছিলোই।

১৯২৯ সালের কথা। হবিগঞ্জে হরি মোক্তারের গান গেয়ে মিছিল বেরোতো তখন ঃ 'ছিন্নমস্তা আয় দেখি মা / বিভীষণা মূর্তি নিয়ে / রাঙিয়ে দেব রাঙা চরণ / মোদের গায়ের রক্ত দিয়ে।' গোষ্ঠবিহারী দাসচৌধুরী ও আমি ছিলাম মূল গায়ক। তখন আমরা গান্ধী-আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবান্বিত, আবার সন্ত্রাসবাদীদের শৌর্যের দ্বারাও গভীরভাবে আকৃষ্ট। বিশেষ ক'রে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে। আমাদের গানের মধ্যে এই দুই পথের দ্বন্দ্ব বেশ ধরা পড়ে।

নজরুলের 'বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ', কালীপ্রসন্ন বিদ্যা-বিশারদের সেই বিখ্যাত গান : 'বেত মেরে কি মা ভুলাবে / আমরা কি আর সেই ছেলে? / দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি / কে পালাবে মা ফেলে' ঃ রবীন্দ্রনাথের 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক'— এ সব গান তখন খুব গাইতাম। শেষোক্ত

গানটির দুটি লাইন আমার বড়ো প্রিয় ছিলো ঃ 'সেদিন প্রভাতে নতুন তপন নূতন জীবন করিবে বপন/এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে রে।' গোবিন্দ দাসের 'স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে, এদেশ তোমার নয়।...ঐযে ক্ষেত শস্যে ভরা, তোমার নয় গো একটি ছড়া/তুমি শুধু চাষের মালিক, গ্রামের মালিক নয়'— ছিলো আরেকটি অতিপ্রিয় গান। হবিগঞ্জে মুকুন্দদাসের তিনটি যাত্রা দেখেছিলাম মনে পড়ে। গান যে কীভাবে মানুষকে জাগিয়ে তুলতে পারে, সেই প্রথম দেখেছিলাম। এরপর ১৯৩০-৩২ সালে— তখনো আমি কমিউনিস্ট রাজনীতিতে আসিনি— আসামের জেলে থাকতে শিখেছিলাম অসমীয়া 'বনগীত'। শিখেছিলাম বিমলাপ্রসাদ চলিহার কাছে যিনি পরে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। বেশ মিষ্টি গলা ছিলো তাঁর। ওই জেলেই জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার কিছু দেশাত্মবোধক গান শিখি। এগুলি বেশির ভাগই অসমীয়া লোকসংগীত অবলম্বনে রচিত।

এই বিচিত্র ধরনের প্রভাব মিলে মিশে একটা সাংগীতিক শিল্প-চেতনা বোধ হয় তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। নইলে আমি গণসংগীত রচনা করতে পারতাম না। ১৯৩৮-৩৯ সালে আমার গানে মজুর-কিষাণের কথা এসে গেছে। সুরে এবং কথার স্পষ্ট নজরুলী ছাপ নিয়ে লিখেছিলাম ঃ 'আগে চল্ আগে চল্ মজুর কিষাণ/সমর শিবিরে শোন্ হাঁকিছে বিষাণ।' শিলঙের মিলিটারী ব্যান্ডে ব্যাগ-পাইপে একটা সুন্দর স্কটিশ সুর বাজতো। সেই সুরে নেপালী সৈন্যদের দিয়ে আবার গান গাওয়াতো বৃটিশরা ঃ 'না রো না রো কাঞ্ছী নানি, হামি যাঞ্ছম্ ধাওয়া'---কেঁদো না কেঁদো না মেয়ে, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। সুরটা আমার এত ভালো লেগে গেলো যে ঐ সুরে ছন্দে লিখলাম ঃ 'ইনক্লাবী হাঁকে ওই, শোন্ পেতে কান/আসুক দুর্দিন, সাথী রুশ চীন/উর্ধ্বে উড্ডীন হের রক্তনিশান।' সে সময়কার অতি জনপ্রিয় ফিল্মের গান 'চল্ চল্‌রে নওজোয়ান'-এর সুরে লিখেছিলাম 'চল্ চল্‌রে কমরেড চল/মুক্তি নেশায় মন উতল।' তখন সুরে বেসুরে সব কমরেড মিলে গান গাওয়াই ছিলো রেওয়াজ। সবাই গাইতে পারে, এরকম সহজ সুরে গান লেখার তাগিদ ছিলো। সেই তাগিদে কয়েকটি গান লিখেছিলাম ঃ

আমরা দিব না দিব না দিব না
দস্যুকে পথ ছেড়ে দিব না।
ঐ দস্যুর দল আসে হুঁশিয়ার
মুসোলিনি তোজো আর হিটলার
ধরো ধরো হাতিয়ার, ক্ষুরধার তলোয়ার---
মুক্তি সেনানায়ক স্তালিন
বেপরোয়া চল বাধাহীন
উদ্যত সঙ্গীন সাথে আছে রুশচীন,
পরাধীন ররনা রবনা।

শেষ লাইনটা প্রথম লিখেছিলাম, 'পরাধীন **হব না হব না**।' তখন ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের কল্যাণে আমরা বৃটিশকে শক্ত বলে ভাবতে তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তারপর লোকের সমালোচনা শুনে বদ্‌লেছিলাম কথাগুলো। আমাদের তখনকার গানে 'তলোয়ার', 'রাইফেলে'র ছড়াছড়ি দেখে ভাববেন না যে সত্যিই কেউ রাইফেল হাতে নিয়েছিলো। পার্টির লাইন থাকলে অবশ্য নেবার মানুষের অভাব ছিলো না।

তখন একটা দুটো ভালো কণ্ঠের অভাব বোধ করছিলাম, যাদের নেতৃত্বে একটা ভালো গানের স্কোয়াড তৈরি করা সম্ভব হবে। আমার এই দাবি পূরণ করতে গিয়ে কৃষকনেতা রোহিনী দাস একদিন একটি তরুণ ছেলেকে এনে বললেন, 'গলাটা পরীক্ষা করে দেখতো।' গলা শুনেই আমি লাফিয়ে উঠেছিলাম। তখন মাইক চোখেও দেখিনি আমরা। কাজেই দরকার ছিলো যেমন সুরেলা, তেমনি জোরালো, তেমনি মেঠো গলার। ছেলেটি সেই দাবি পূরণ করেছিলো। তার নাম নির্মলেন্দু চৌধুরী। তাকে তখনই শিখিয়েছিলাম 'চল্ চল্‌রে কমরেড চল'।

এই সময় লোকসুরে ভাটিয়ালীতে রচনা করেছিলাম একটি গান, যা আমার ধারণায় অতি সফল সুর সংযোজনার কল্যাণে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিলো। নির্মল এ গান বহু জায়গায় গেয়েছিলো, কলকাতাতেও তার গলায় এ গান বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলো। গানটি ছিলো ঃ

ও চাষী ভাই---
তোর সোনার ধানে বর্গী নামে দেখরে চাহিয়া।
তোর লুঠে নেয় ফসল
দেশবিদেশী ধনিক, বণিক ফ্যাসীদস্যুদল।
পঙ্গপালে দলে দলে ছাইলো দুনিয়া।...
জাপানের হাওয়াই জাহাজ
আসমান হতে মোদের বুকে হানছে কলের বাজ।
তারা জোর জুলুমে কুলের বধূ নেয়রে হরিয়া।

এরপরেই আমি রচনা করেছিলাম 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান', যে গান অভূতপূর্ব জনপ্রীতি লাভ করেছিলো। এ গানটি সম্পর্কে কিছু কথা বলার আছে।

'কাস্তেটারে দিও জোরে শান'

১৯৪২ সালের ঘটনা। বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে আমি তখন পঞ্চখণ্ডে মাসির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। সেখানে লুলা নদীতে মাঝির গলায় এক সারিগান শুনেছিলাম ঃ 'সাবধানে গুরুজীর নাম লইও রে সাধু ভাই।' সেই সুরে লিখলাম গান ঃ 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষাণ ভাইরে।'

বেহেলি কৃষক সম্মেলনে গানটি নিয়ে গিয়েছিলো সুরথ পালচৌধুরী, গেয়েছিলো নির্মলেন্দু চৌধুরী, অসুস্থ থাকায় আমি নিজে যেতে পারিনি। সম্মেলনে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিলো এ গান। কৃষকদের কণ্ঠে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অতি দ্রুত ছড়িয়ে গিয়েছিলো। এই বিরাট সাফল্য আমাকে একটা ব্যাপারে সুনিশ্চিত করেছিলো যে জনগণের চেনাজানা পরিচিত আঙ্গিকে

বিপ্লবী বিষয়বস্তু পৌঁছে দেওয়াই হলো সঠিক রাস্তা।

কিন্তু, কেবল পরিচিত আঙ্গিক নয়, সহজবোধ্য ভাষাও একটা অপরিহার্য জিনিষ। 'ফসল কাটার সময় এলে কাটবে সোনার ধান/দস্যু যদি লুঠতে আসে কাটবে তাহার জান'; কিংবা 'একতায় ভাই চীনের মানুষ হয় যে বলীয়ান/ছয়টি বছর জাপানীরে করলে রে হয়রান'— এ ভাষা বুঝতে কোনো কৃষকের অসুবিধে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে তার শ্রেণীসংগ্রামের প্রেরণাও তাতে পেয়েছিলো।

বাংলার বাইরে বিভিন্ন ভাষায় এ গান অনুবাদ হয়েছে, এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। এমনকি মণিপুরী ভাষায় এ গানের চন্দ্রকলা দেবীর গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড 'থাঙ্গুলাদু মাইয়া থাঙ্গু থৌনা হে লৌবা' বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিলো। অনুবাদ করেছিলেন স্বয়ং ইরাবৎ সিং।*

তখন পার্টিতে 'জনযুদ্ধের' লাইন চলছে। ফ্যাসিবিরোধিতাই তখন প্রথমতম কর্তব্য, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চেয়েও বড়ো শত্রু হলো সীমান্তে আগতপ্রায় জাপানী ফ্যাসিস্টরা। কিন্তু 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান'-এর মধ্যে এই রকম লাইন আছে ঃ 'ও কিষাণ তোর ঘরে আগুন বাইরে যে তুফান/বিদেশী সরকার ঘরে দুয়ারে জাপান।' অর্থাৎ কিনা, জাপানী ফ্যাসিস্টদের সাথে সাথে বৃটিশ সামাজ্যবাদকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তখন কিন্তু এর উল্টোটাই ছিলো রেওয়াজ। 'জনযুদ্ধে'র সঠিক তত্ত্বকে বিকৃতভাবে প্রয়োগ করার ফলে পার্টি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করার পর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের চরিত্রে যে পরিবর্তন আসে, তার পরিপ্রেক্ষিতে, তত্ত্বগতভাবে 'জনযুদ্ধ' ছিলো এক সঠিক লাইন। কিন্তু সশস্ত্র গণবাহিনী তৈরি করে, নিজেদের উদ্যোগ সম্পূর্ণ বজায় রেখে ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ-প্রয়াসের সহায়তা করার বদলে আমরা পুরো উদ্যোগ তুলে দিলাম বৃটিশদের হাতে, আর নিজেরা হয়ে পড়লাম ওদের লেজুড়। সে সময় সারা ভারতব্যাপী যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জোয়ার এসেছিলো, আমরা তা থেকে দূরে সরে তো থাকলামই, উপরন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে 'পঞ্চম বাহিনীর কাজ' বলে চিহ্নিত করলাম। সাধারণ ভাবে, আমাদের এই সময়কার গানে কবিতায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা থাকতো না।

প্রধানত যা থাকতো তা হচ্ছে একদিকে জাপবিরোধিতা, অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ নিয়ে আমরা প্রচুর কান্নাকাটি করেছিলাম। কোনো সংগ্রামের কথা থাকতো না সেই গানে, আর সমাধানের পথ হিসেবে থাকতো ধর্মগোলা তৈরির আর মজুতদার বয়কটের কথা। ঐটাইতো পার্টির লাইন তখন। ময়মনসিংহের শরৎকালের অতি চমৎকার গান 'আইলরে চৈতন্যের গাড়ি সোনার নদীয়ায়'-এর সুরে আমি লিখেছিলাম ঃ 'ঘোর কলিকাল আইল আকাল/সোনার বাংলায়। হায় হায়/ক্ষুধার অনল ধিকিধিকি দিকে দিকে ধায়/ক্ষুধায় পাগল মানুষ ঘুরে ফিরে/মায়ের বুকে দুধের ছাওয়াল মরে অনাহারে/মৃত সন্তান বুকে লইয়া কান্দে বাপ মায়। হায় হায়।।' 'ঘোর কলিকাল' এ কথা কোনো কমিউনিস্ট বলতে পারে? দুর্ভিক্ষটা কি দৈবের ব্যাপার নাকি।

আপনারা বিশেষ ক'রে আমার গানের কথাই জানতে চেয়েছেন, তাই আমার গানের কথাই প্রধানতঃ বলছি। কিন্তু আমার গানের মধ্যে যে-প্রবণতা ছিলো, সেটাই তখনকার সাধারণ প্রবণতা। সবার গানের মধ্যেই সেটা প্রকাশ পেয়েছে। বিনয় রায়ের যে-গান সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিলো সেই 'শুনো হিন্দকে রহ্‌নে ওয়ালো'-র মধ্যে এইরকম লাইন ছিলো ঃ 'তুম্ হিন্দু হো ইয়া মুস্‌লিম হো/অওরৎ-মরদ আমির-ফকির সভি, তুম্ শুনো শুনো।' দুর্ভিক্ষের মোকাবিলায় আমির-ফকির সবাইকে এক করতে হবে?

তখন দুটো শব্দ চালু হয়ে গিয়েছিলো ঃ Link-up আর way out! যা কিছু লিখি না কেন, তাকে 'link' করতে হবে জাপানী ফ্যাসিবাদের সঙ্গে ; যা কিছু লিখিনা কেন, দুর্ভিক্ষের হাত থেকে মুক্তির উপায়, 'way out' হিসেবে বলতে হবে উৎপাদন বাড়ানোর কথা। আমার একটা গানের উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। সাঁওতালী লোকসুর ভেঙে এ-গানটা রচনা করেছিলাম :

'লাঙ্গল চালাই আমরা কোদাল চালাই/নাচের তালে তালে ফসল বাড়াই/আমরা জাপানী তাড়াই/অনাহারে ঘরে ঘরে উঠলো হাহাকার/বাংলা মায়ের বুকের পাঁজর ভেঙে চুরমার/ লাঙ্গলে মঙ্গল, দেশের অন্য উপায় নাই।' ঢাকার সত্যেন সেন গান লিখেছিলেন ঃ 'কংগ্রেস লীগ এক হও/হাতে হাত বেঁধে রও।' এটাও তো পার্টির লাইন ছিলো। চরকা কাটা নিয়েও গান লিখেছিলাম আমি। এই ভাবে পার্টির শ্রেণী-সহযোগিতার লাইন আমাদের রচনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিলো।

এই 'link-up' এবং 'way out' প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনার উল্লেখ করি। আমাদের গানে তখন কেবল থাকতো দুঃখের বর্ণনা। এই রকম এক গান রচনা করেছিলাম গাজীর সুরে :

দেশে উঠলো দারুণ হাহাকার
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কি আইল দেশে পুনর্বার।।
জিনিসের দর হইল চতুর্গুণ
চারপয়সার দিয়াশলাইয়ে জ্বলেনা আগুন
কেরাসিনের অভাবে আজ ঘরে ঘরে অন্ধকার।।
লজ্জাবারণ হইল বিষম দায়

* ইরাবৎ সিং মণিপুরের এক কিংবদন্তীর পুরুষ। তেলেঙ্গানা-আন্দোলনের সময় তিনি বর্মা-সীমান্তে মারা যান। বর্মার কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর মৃত্যুসংবাদ জানান। মণিপুরীরা এখনো বিশ্বাস করেন ইরাবৎ বেঁচে আছেন এবং ফিরে আসবেন।

ল্যাংটা হইয়া ফিরবো কিরে আদিম যুগের প্রায়
খুচরা নাই, হায়রে হায় ক্যামনে করি হাটবাজার।।

গানটি শেষ করেছিলাম এইভাবে ঃ

দেশের চাষী মরছে উপবাসী
মরার উপর খাঁড়ার আইন জাপান সর্বনাশী,
মোদের হাত পা বাইন্ধ্যা রাখলে আজও বিদেশী সরকার।।

কিন্তু নেতারা মাথা নাড়লেন ঃ 'way-out দিলেন না কমরেড!' অমনি আমিও জুড়ে দিলাম ঃ

জনরক্ষা কমিটি আজ গড়ো
জনরক্ষা কমিটি আজ লড়ো
সরকাররে চাপ দিয়া মাল আমদানী করো
চোরাই মাল বাহির করো গুপ্তঘরে আছে যার।।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা একটা গান খুব চলেছিলো ঃ 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ/রুখবো দস্যুদলকে আজ,... / আমরা নইকো ভীরুর জাত/দেবোনাকো হতে দেশ বেহাত...', বুঝুন ব্যাপারটা, যেন বৃটিশ-অধিকৃত ভারতবর্ষ তখনো বেহাত হয়নি! সে সময় বিনয় রায়ের উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় কৃষক গেরিলা গড়ার গানের মধ্যে একটা চমৎকারিত্ব ছিল ঃ 'হৈ, হৈ, হৈ / জাপান ঐ/আইসে বুঝি/হামার টারিত/বাইরাও গাঁয়ের গেরিলা জোয়ান...', কিন্তু 'গেরিলা জোয়ান' তৈরির কাজ শুরু হতে না হতেই সারা হয়ে গেলো।

তবে, একটা কথা ঠিক, এই শ্রেণীসহযোগিতার লাইন থাকা সত্ত্বেও আমাদের কোনো কোনো গানের মধ্যে ইতিবাচক প্রবণতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার কারণ দুটো। প্রথমতঃ, পার্টির মধ্যে দু'লাইনের সংগ্রাম বরাবরই ছিলো। ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতায় নামে শ্রেণীসহযোগিতা করার বিরুদ্ধে একটা বক্তব্য বরাবরই ছিলো। সেটার প্রভাব আমাদের ওপর খানিকটা পড়তো বৈকি। নইলে, 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান' লিখলাম কী ক'রে? দ্বিতীয়তঃ, আমরা নিজেরাও তো নিতান্ত হাবাগোবা ছিলাম না। মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ নিয়ে কিছু কিছু পড়াশুনো করছি, সারা পৃথিবীর বিপ্লবী সংগ্রামের সংবাদও আমাদের উদ্দীপ্ত করছে। সেই '৪২-'৪৩ সালেই লিখেছিলাম : 'ধন্য রে ধন্য মহাচীন/তোমাদের পণ স্বাধীনতারণ/জগতে তুলনাহীন/ভারত চীনের মৈত্রী সে যে শতেক যুগের কথা/ভারত চীনের ভাগ্য যে ভাই একই সুরে গাঁথা'। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের পর লিখেছিলাম : 'সাবাস ভাই, সাবাস ভাই/লাল পল্টন, সাবাস ভাই।' একই উপলক্ষ্যে কলকাতার একজন ডক-শ্রমিক সুরে এবং কথায় এক অসাধারণ জোরালো গান রচনা করেছিলেন। সে গান তখন আমাদের মুখে মুখে ফিরতো। গানটি ছিলো: 'লাল ফৌজ নে সুরু কিয়া হ্যায়/লাল ক্রান্তি কা জং দেখো!/ইস্ কা জীৎসে জনতা জাগে/লাল ফড়িয়াড়া লে বড়ে আগে/আজাদশাহী দুনিয়া হোগী/আজাদীকা রং— দেখো আজাদীকা রং।' সুতরাং পার্টির শ্রেণীসহযোগিতার লাইন সত্ত্বেও আমাদের গানের মধ্যে জঙ্গী শ্রেণীসংগ্রামের কথা এসে গিয়েছে।

তাই, একটা কথা আমার মনে হয়। সংস্কৃতি-আন্দোলনকে খুব ধরাবাঁধা ভাবে পার্টি-লাইন দিয়ে বিচার করলে এক ধরনের অতিসরলীকরণ এসে পড়তে পারে, যদিও একথা ঠিক যে শেষ বিচারে পার্টিলাইনকে গুরুত্ব দিতেই হবে।

কলকাতা

আমি মফঃস্বলের লোক, কলকাতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কমই হতো। ১৯৪৩ সালে 'ফ্যাসিবিরোধী লেখকশিল্পী সম্মেলনে' যোগ দেবার জন্য নির্মল চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে আমি কলকাতায় আসি। ৪৬ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট তখন জমজমাট। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আমাদের বিরাট অনুষ্ঠান হ'লো মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষভাবে মনে আছে পানু পাল ও রেবা রায়ের 'ভুখা নৃত্য', বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'জবানবন্দী', বিনয় রায়ের গান 'ম্যায় ভুখা হুঁ'। খুব বেশি ক'রে মনে পড়ে হরিপদ কুশারীর গান: 'মরণশিয়রে দলাদলি ক'রে কেমনে বাঁচিব বল'— যা তখন লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে গিয়েছিলো। নির্মল চৌধুরীর নেতৃত্বে 'কাস্তেটার দিও জোরে শান' প্রভৃতি গান গেয়েছিলাম আমরা।

রাত্রে, যতদূর মনে পড়ে, মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিলো 'নবান্ন'। তার আগে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, রেবা রায়, সাধনা রায়চৌধুরী, ভূপতি নন্দী সবাই মিলে আমার 'লাঙল চালাই আমরা ফসল বাড়াই' গানটি গেয়ে একটি নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেছিলেন। নির্মল lead দিয়ে যে সারিগানটা গেয়েছিলো সেটা হলো ঃ

তোরা আয়, আয়রে ছুটে আয়---
এ ভারতের হিন্দুমুসলিম কে আছে কোথায়।
স্বাধীন হাওয়া লাগলো পালে স্বরাজের নৌকায়---
কংগ্রেস-লীগ এক হয়ে ভাই সেই তরণী বায়।

পরে অবশ্য এই শেষ লাইনটা বদল ক'রে লিখেছিলাম: 'মজুর-কিষাণ এক হয়ে ভাই...।' তখন তো একদিকে আমরা কংগ্রেস-লীগ এক হবার দাবি তুলছি, পার্টি-অফিসে লেনিন-স্তালিনের পাশে গান্ধী-জিন্নার ফটো ঝোলাচ্ছি, আবার অন্যদিকে আগস্ট আন্দোলনকে পঞ্চম বাহিনীর কাজ বলে ধিক্কার জানাচ্ছি! আমার এই সারি গানটির মধ্যেই তো ছিলো ঃ 'পঞ্চমবাহিনী-কুম্ভীর পানিতে লুকায়/তোরা আয় ছুটে আয়।'

'নবান্ন' নাটকের মধ্যেও পার্টির ঐ বন্ধ্যা লাইনের ছাপ পুরোপুরি রয়েছে। শুধু দুঃখ, শুধু কান্না, আর শত্রু বলতে কেবল মজুতদার। যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দুর্ভিক্ষ তৈরি করলো, তার বিরুদ্ধে একটা কথাও নেই। একথা ঠিক, তখনকার পৌরাণিক ও অন্তঃসারশূন্য নাটক-অধ্যুষিত বাংলা মঞ্চের কথা বিবেচনা করলে 'নবান্ন' নাটকের অগ্রসর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে তার মূল্য কতটুকু? দীনবন্ধু মিত্র অন্তত

একটা তোরাপ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, এখানে কোথায় তেমন চরিত্র?

৪৬নং ধর্মতলা ষ্ট্রীটের অনেক ঘটনা মনে পড়ে। একটা বলছি। আমাদের সিলেটে মেয়েলী গান ধামাইল্ প্রচলিত আছে। সেই ঢঙে আমি মেয়েদের গাইবার কিছু গান লিখেছিলাম। যেমন,

তোরা বল্ সখী বল্ আমারে
ওকে ঘরের বার কুলের বার করলো নারীরে, বল্ আমারে।
ছিলো বাংলা বধূ অমৃতের খনি
আন্ধার ঘর উজল করা নীলকান্ত মণি।
ওগো, সেই বুকে কে গরল দিলো,
দংশিল কোন্ বিষধরে, তোরা বল্ আমারে।

এসব গান সিলেটের গ্রামে গ্রামে মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিলো। এই রকম আর একটা ধামাইল্ ছিলো ঃ

কী শুনি কী শুনি সইলো, কী শুনি কী শুনি
হরিতে রমণীর মান আইল রে জাপানী, দেশে আইল জাপানী।

এসব গান নেচে নেচে গাইতে হয়। ৪৬ নম্বরের চত্বরে নির্মল মেয়েদের নাচটা শেখাচ্ছে, এমন সময় হীরেন মুখোপাধ্যায় হঠাৎ আমার কাছে এসে তাঁর পরিশীলিত নিম্নস্বরে, মার্জিত বাচনভঙ্গিতে আমায় বললেন, 'হেমাঙ্গবাবু, একটা কথা বলতে পারি?' কী কথা? 'ঐ কথাগুলো বদলে দিলে হয় না?' আমি প্রথমে বুঝতেই পারছি না কোন্ কথা। হীরেনবাবুর আবার শব্দগুলো উচ্চারণ করতেও বাধছে। তারপর বুঝলাম 'হরিতে রমণীর মান' এই কথাগুলোর কথা বলছেন তিনি। কলকাতার রাবীন্দ্রিক মানসিকতার সঙ্গে আমাদের গেঁয়ো মানসিকতার তফাৎ বোঝার পক্ষে এই একটা ঘটনা বোধহয় যথেষ্ট।

একথা ঠিক যে আমাদের তখনকার গানগুলিতে কাব্যগুণের যথেষ্টই অভাব ছিলো। তখনকার পার্টি-সেক্রেটারী পূরণচাঁদ যোশী আবার এই ব্যাপারগুলোতে খুব সংবেদনশীল ছিলেন। তিনি বললেন, এ যা হচ্ছে এ তো সব ছন্দে-বাঁধা স্লোগান--- Versification of Party slogans ! কথাটার মধ্যে সত্যি ছিলো বৈকি! এই ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনাসভা ডাকা হয়েছিলো, তাতে প্রধান আলোচক ছিলেন ভবানী সেন। আমার মনে আছে রংপুর স্কোয়াড থেকে কমরেডরা সে অঞ্চলের সুবিখ্যাত লোকসংগীত 'ডাঙ্গর বধূয়ারে'-র অনুসরণে রচিত একটা গান নিয়ে এসেছিলেন: 'গরীব দেশবাসী, গরীব কিষাণ ভাই/ তুই খেতৎ করলিরে ফসল/সেই ফসল কাড়িয়া নিল মজুতদার শয়তানে।' এ গান ভবানী সেন 'অত্যন্ত স্থূল' ব'লে মন্তব্য করেছিলেন।

গানের রচনাসৌকর্য সম্বন্ধে পার্টি সচেতন হওয়ায় একটা উপকার হয়েছিলো, আমরা ঐ link-up আর way-out-এর যন্ত্রণা থেকে খানিকটা বেঁচেছিলাম। কিন্তু আরেক সর্বনাশ ঘটলো। 'স্থূল' রচনার সমালোচনা করতে গিয়ে formalism-কে আস্কারা দেওয়া হলো। কেবল form-কে উন্নত করলেই যে চলবে না, মূল প্রশ্নটা যে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু সংক্রান্ত, রাজনৈতিক বিষয়বস্তুই যে form-কে নিয়ন্ত্রণ করবে, এ কথাটা ভবানী সেন বললেন না। আসল গলদ যে যোশীর রাজনীতিতেই, সে কথাটা স্বীকার করা হলো না। কলকাতায় মহিলা-নেত্রী কনক মুখোপাধ্যায় সেসময় পার্টির 'কোটা' পূরণ আন্দোলনের জন্য একটি গান লিখেছিলেন ঃ 'কোটা পূরণ করো রে ভাই, কোটা পূরণ করো'। এ নিয়ে পার্টির বিদগ্ধ শিল্পীসাহিত্যিক মহলে প্রচুর হাসাহাসি হয়েছিলো। কিন্তু গলদটা যে কেবল দুর্বল রচনাভঙ্গিতে নয়, মূল রাজনীতিতেই, সে কথাটা কেউ বলতেন না। অর্থাৎ এঁদের দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিলো আঙ্গিক সর্বস্ব।

১৯৫৭ সালে চীনে গিয়ে একটা ঘটনা লক্ষ্য করেছিলাম, সেটা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের mass-line অনুযায়ী সারা দেশে, তখন ইঁদুর-নিধন যজ্ঞ চলছে— খাদ্য বাঁচানো অভিযানের অঙ্গ হিসেবে। তাই নিয়ে প্রায় ইঁদুর নিধন করো' গোছের একটা গান প্রচলিত ছিলো। আমি ভাবতাম তাহলে আমরা আর কী অপরাধ করেছি স্লোগান সর্বস্ব গান লিখে? কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয়, আসল কথাটা হলো রাজনীতি। একটা সত্যিকারের প্রলেটারীয় পার্টির সমাজতান্ত্রিক সমাজকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করার বৈপ্লবিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গ হিসেবে এমনকি ইঁদুর মারাও একটা বিপ্লবী কাজ। আঙ্গিকের প্রশ্ন নিশ্চয়ই ওঠে, কিন্তু সেটা কখনোই মূল প্রশ্ন নয়।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান' সুর এবং রচনা উভয় দিক থেকে এক অসাধারণ সৃষ্টি। নাগরিক সংস্কৃতিতে রূপান্তর আনার কাজটা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে করা হয়েছিলো তাতে। বিশেষ করে রাগসংগীতকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছিলো, তা অপূর্ব। কিন্তু, এসব কিছু স্বীকার করেও মূল প্রশ্ন করতে হয়: এর রাজনৈতিক বিষয়বস্তুটা কী? পল্লীর 'হতাশায় নেবা চোখের' সামনে তিনি নবজীবনের স্বপ্ন রচনা করলেন। 'জেলেরা বুনবে নতুন জাল, মাছের রূপায় ঝলসে উঠবে, তাঁতের তালিতে করতালি দেবে এ আকাশ'— এর মধ্যে কোথায় শ্রেণীচেতনা? এখানে প্রতিরোধ নেই, আছে কেবল প্রতিবাদ। জ্যোতিরিন্দ্র এর পর লিখেছিলেন 'মিছিলের গান'। এমন দুরূহ প্রতীকের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন যে আমি অন্ততঃ তার কিছুই অর্থ করতে পারিনি। ভবানী সেনের রাজনীতি-বর্জিত formalistic সমালোচনা যে কত ভুল তার আর একটি প্রমাণ হলো এই যে ঐ সমালোচনার পরেই ঢাকার সত্যেন সেন এক ''পরিশীলিত'' গান লিখলেন, যাঁর বিষয় হলো কারারুদ্ধ জওহরলাল নেহরুর মুক্তির দাবি 'হে দুর্গম পথচারী বন্ধু,/বন্ধন করো করো জয়'। এই তো কাব্যময় গানের উদাহরণ।

ফিরে আসি আমার গানের কথায়। কলকাতায় থাকাকালীন

প্রগতি লেখকশিল্পী সংঘের কমরেডদের অনুরোধে ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে একটি গান লিখেছিলাম, তাতে নির্মল ও আমি দু'জনে মিলে সুর দিয়েছিলাম। ইমন রাগে রচিত এ গানটি কলকাতায় বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলো, সারা কলকাতায় এ গান গেয়ে প্রভাতফেরী বেরিয়েছিলো ঃ

জাগো! দুখের রাতের ঘোর তমসা ভেদি
স্বাধীনতা দিবস এলো যে ফিরে।
শহীদের মৃত প্রাণ শোন করে আহ্বান
করাঘাত হানে তব দ্বারে...
ভারত জাতির যত স্বপ্নকামনা
অর্ধশতকের মুক্তিসাধনা
শ্মশানচিতায় হয় যে বিলীন
ক্ষুধিতের ক্রন্দন হাহাকারে।

মাঝে মাঝে পার্টি-লাইনে ও গানে বড়ো বিসম্বাদ বাধতো। ১৯৪৬ সালে আসাম প্রাদেশিক বিধানসভার নির্বাচনে আমাদের সিলেটে এক কমিউনিস্ট নেতাকে দাঁড় করানো হয়েছিলো। গ্রামের নির্বাচনী মিটিঙে তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতার শেষে এক কংগ্রেসপন্থী গ্রাম্য মোড়ল তাঁকে প্রশ্ন করেছিলো ঃ 'আপনারা তো পাকিস্তান মানেন?' তখন মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন খুব ছড়িয়ে পড়েছিলো। আমাদের নেতা জোরের সঙ্গে মোড়লকে বললেন, 'না, কিছুতেই না।' মোড়ল মশাই তখন ভালোমানুষের মতো পার্টির নামে প্রকাশিত আমার একটা গানের বই বার করে তা থেকে পড়তে থাকলো ঃ 'দেশের ভাব দেখিয়া মরি/ভাবের অভাব হৈল দেশে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করি।/...শোন কংগ্রেস নেতাগণ/মুসলমানের আত্মশাসন/না মানিলে হয় না মিলন/দেখ চিন্তা করি।' নেতার তখন নাজেহাল অবস্থা। গ্রাম্য মোড়ল, সে ঐ সব ভুঁইফোড় নেতাদের চেয়ে ঢের বুদ্ধি রাখে।

সভা থেকে ফেরার পথে এক খেয়াঘাটে, আমার দলবল শুদ্ধ আমাকে পেয়েই বিশুদ্ধ সিলেটী ভাষায় ফেটে পড়লেন নেতামহাশয়। যেন দোষটা শুধু আমার। লেনিন-স্তালিনের নীতিকে বরবাদ করে পণ্ডিতপ্রবর ডঃ অধিকারী তত্ত্ব দিয়েছিলেন 'মুসলিম আত্মনিয়ন্ত্রণে'র। সেই তত্ত্ব পার্টি গ্রহণ করেছিলো, সেই তত্ত্ব অনুসারেই আমি ঐ গান লিখেছিলাম মুকুন্দদাসী সুরে।

সে সময় মুসলিম যুবলীগের ছেলেরা তাদের গানের দল সংগঠিত করতে আমার সাহায্য চেয়েছিলো। নেতা বললেন, 'আপনি ওদের জন্য গান লিখলে তবেই তো প্রভাবান্বিত করতে পারবেন।' আমিও লিখলাম গান ঃ

দিন্ ইসলামের নিদ্ মহলে হাঁকে ভোরের আজান, জাগ
জাগরে মুসলমান

লীগপন্থী মুসলমান তরুণদের মুখে মুখে এ গান ফিরতো। ভ্রান্ত রাজনীতি থেকে আমরা কোথায় যে নেমেছিলাম, তাই ভাবি।

সিলেট মুসলমান-প্রধান অঞ্চল। দেশভাগের পর সিলেট আসামে থাকবে, না পূর্বপাকিস্তান যাবে, তাই নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা এক গণভোটের আয়োজন করেছিলো। সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়ে জনগণকে বুঝিয়ে বলার বদলে পার্টি-নেতৃত্ব সিলেটের আসামভুক্তির স্বপক্ষে নেমে পড়লেন। তাঁদের যুক্তি, ভারতে হিন্দু-মুসলিম জনতার গণতান্ত্রিক অধিকার পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি থাকবে, পাকিস্তান তো একটা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র। এই সুবিধাবাদী পার্টি-নীতির অনুগামী হয়ে আমিও গান লিখলাম : 'ভাঙনের স্রোতে ভাঙিতে চাও কি সোনার সুর্মা ভূমি / স্বদেশদরদী হিন্দুমুসলমান জাগো জাগো আজ তুমি।' এ গানের কথা বা সুর কিছুই আমার ভালো মনে নেই। তবে শ্রীচৈতন্য, শাহ্ জালাল প্রভৃতির প্রসঙ্গ এনে সিলেটের ধর্মীয় মিলনের আহ্বান ছিলো, এটুকু মনে আছে।

এই সময় এক গানের গুঁতো খেয়েছিলাম, যা আমি জীবনে কখনো ভুলিনি। তখন মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলমান জনতার যে সব সমাবেশ হতো, সে দেখবার মতো। আমি আমার স্কোয়াড নিয়ে এক নির্বাচন কেন্দ্রে ঐ 'ভাঙনের স্রোতে' গানটা গাইছি, এমন সময় অন্ততঃ হাজার তিনেক বুড়ো বুড়ো মোল্লা, মৌলানা মিছিল করে এসে, দাড়ি নেড়ে নেড়ে মাত্রা ঠুকে সুরে বেসুরে একসঙ্গে গাইতে শুরু করে দিলো: 'আমরা তো আসামে থাকবো না/হাতী দিয়া ঘর ভাঙ্গাইল/নমাজেতে গুলি কৈল্ল/জীবন থাকতে ভুলবো না।' আমাদের ও অঞ্চলে যাকে বলে জালালুদ্দীনের সুর, সেই সুরে তারা গাইছিলো। আমাদের গানের ছোট্টো দল সেই গানের ধাক্কায় একেবারে ভেসে গেলো। এমন গানের গুঁতো জীবনে কখনো খাইনি।

পরে ঐ গানের ঢঙে ১৯৫২ সালের নির্বাচনে আমি একটা গান লিখেছিলাম: 'ভোটতো আর কংগ্রেসে দিব না/ক্ষুধার জ্বালায় গরম সীসার গুলি খেয়ে মরবো না!' ভোট পর্ব সমাধা হবার পর প্রথম লাইনটা বদলে লিখেছিলাম: 'আমরাতো আকালে মরবো না।' যা হোক সে সব পরের কথা।

এই পর্বের, অর্থাৎ পার্টির 'জনযুদ্ধ'-লাইন চলাকালীন গণনাট্য আন্দোলনের বিচারে দুটো কথা মনে রাখা উচিত। এ পর্বের ইতিবাচক দিক ছিলো ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা, আর নেতিবাচক দিক ছিলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় বুর্জোয়ার লেজুড়বৃত্তি।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ স্বর্ণযুগ

তখনো কিন্তু পার্টির 'জনযুদ্ধ' পর্ব চলছে। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, হিট্‌লার মুসোলিনি তোজো পরাজিত হয়েছে, অথচ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব তখনো বৃটিশের সহযোগিতার লাইন আঁকড়ে রয়েছে, তখনো গান্ধী-জিন্নার মিলন তার প্রধান দাবি।

সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষক বারবার এই লাইন অস্বীকার করে বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু স্বভাবতঃই নেতৃত্বহীন অবস্থায় বেশিদূর

এগোতে পারে নি। আমাদের গানের মধ্যেও এই বিদ্রোহের রণধ্বনি শোনা গেছে।

১৯৪৬-৪৭-এ তেভাগা আন্দোলনের সময় সলিল লিখেছিলো তার বিখ্যাত 'হেই সামালো হেই সামালো' গানটি। কাকদ্বীপের কৃষক-বিদ্রোহ নিয়ে বিনয় রায় তাঁর সেই অসামান্য গানটি রচনা করে ছিলেন: 'অহল্যা মা, তোমার সন্তান জন্ম নিলোনা।' এই সময় আমি লিখেছিলাম: 'তোর মরাগাঙে আইল এবার বান/ওরে ও কিষাণ,/তোর মরাগাঙে আইল এবার বাণ।.../ও তুই হাতে নে একতার শক্তিশেল/ও তোর পাকা ধানে পড়লো এসে/পাগল হাতির মেল রে/একতার শক্তিশেল।' তেভাগার শহীদ শিবরাম, সমীরুদ্দীনকে স্মরণ করে এ গানের মধ্যে এক জায়গায় ছিলো: 'কত শিবরাম সমীরুদ্দিন মরলো দেশের তরে,/চাষীর ছেলে শহীদ হইলো প্রতি ঘরে ঘরে রে,/মরলো দেশের তরে/তারা নিজে মরে মরার-দেশে আনলো প্রাণের বান—/আপন রক্ত দিয়া মিল করিল মজুর কিসান রে।' এই তেভাগার আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব পার্টি দিতে পারলো না।

এই সময়কার ভারত-কাঁপানো ঘটনা হলো বোম্বাইয়ের নাবিক বিদ্রোহ। এখানেও একদিকে বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী মানসিকতা, এবং অন্যদিকে পার্টি-নেতৃত্বের সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা লক্ষ্য করবার মতো। পার্টিকে নেতৃত্ব দিতে অনুরোধ করেছিলেন নাবিকরা; উত্তরে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতারা তাঁদের গান্ধী ও জিন্নার ঠিকানা দেখিয়ে দেন (তখন গান্ধী-জিন্নার মিলনই তো পার্টির প্রধান দাবি!)। স্থানীয় শ্রমিকরা কিন্তু নাবিকদের সঙ্গে এক ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিয়ে নতুন অধ্যায় রচনা করলেন। পার্টির মধ্যেকার দু-লাইনের দ্বন্দ্ব গণনাট্যের মধ্যেও ছিলো। কাজেই একদিকে যেমন শ্রেণী সহযোগিতার, গান্ধী-জিন্নার মিলনের গান লেখা হচ্ছে, অন্যদিকে নাবিক-বিদ্রোহ নিয়ে বোম্বাইয়ের আন্ধেরীতে গণনাট্যের এক ব্যালে অনুষ্ঠান হয়। তা এত জঙ্গী চরিত্রের ছিলো যে বোম্বাই সরকার তা বন্ধ করে দেয়। আসামে 'রক্তের ঋণ' নামে একটি ব্যালে প্রযোজনা হয়েছিলো। প্রধান পরিকল্পনার ছিলেন পানু পাল আর উষা দত্ত। গানের ও নাচের দিকে মায়া, শান্তা, সন্ধ্যা, পূরবী, আরতি প্রমুখ অনেক ভালো ভালো শিল্পী অংশ নিয়েছিলো। এই ব্যালেতে আমার কয়েকটি গান ছিলো। একটি গানের কথাগুলি এই রকম: 'অন্ধ কারার বন্দী আলোকমল, তোমাদের ভুলি নাই/তোমাদের যত শৃংখলভার/মোদের গলায় হলো মণিহার/অগ্নিবীণায় যে গান গাহিলে/সে গান আজিও গাই।' যে গানটি বিশেষভাবে ছড়িয়েছিলো সেটি হলো:

মহানগরীর রাজপথে যত রক্তের স্বাক্ষর
অগ্নিশিখায় অঙ্কিত হলো লক্ষ বুকের পর ..
ভুলবো না ভুলবো না ভুলবো না।।
হাতে শহীদের সমাধি ফলক
ললাটে পড়েছি রক্ততিলক
রক্তের ঋণ রক্তে শুধবো শপথ ভয়ংকর।

ধর্মতলার গুলিচালনা, কদম রসুল, রামেশ্বরের মৃত্যু, বোম্বাইয়ের নাবিক-বিদ্রোহ, সবকিছু মিলে একটা প্রচণ্ড আবেগ ফেটে বেরিয়ে ছিলো আমার এই গানটিতে:

ডাকে ঐ; ডাকে ঐ
ডাকে রামেশ্বর ডাকে মনোরঞ্জন
কদম রসুল ডাকে, ডাকে ধীররঞ্জন —
ভুলো না ভুলো না ভুলো না
রাজপথে যত রক্তের লিখন।
নীল সমুদ্র লাল করে গেল
নাবিকের রক্তধারা
তারাও তো শুনেছে আমাদের ডাক,
তারাও তো দিয়েছে সাড়া,
খুনীদের সাথে কে চায় আপোষ,
জাগ্রত জাতি নয় কাপুরুষ,
লক্ষ প্রাণের গুঞ্জিত রোষ
চায় সে যে অন্তিম রণ।

ভারতের শ্রমজীবী জনতার রুদ্র রূপ দেখে সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগিরা সংকিত হয়ে পড়লো। আপোষে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ খুঁজলো তারা। ক্রীপ্স্ মিশন ক্যাবিনেট মিশন ইত্যাদি সেই প্রয়াসেরই নিদর্শন।

এই ক্রীপস্ মিশনকে নিয়ে সিলেটী ভাষায় আমার একটা ব্যঙ্গগীতি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। এর ইতিহাসটা বেশ মজার। ক্রীপস্ মিশন আসায় সব বড়ো বড়ো নেতারা তখন দিল্লীতে। এদিকে আমাদের সিলেটে তখন সরষের তেল প্রায় উধাও। একদিন এক কৃষক কমরেড ধুলোমাখা পায়ে এসে আমাকে অনুরোধ জানালেন, 'হৈরর তেল' (সরষের তেল) নিয়ে একটা গান লিখতে। আমি তো প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিলাম: হৈরর তেল নিয়ে আবার গান হয় নাকি? কিন্তু কমরেডটি উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কার জন্য তোমার গান?' সাধারণ লোকের একটা এত বড়ো সমস্যা নিয়ে তুমি গান লিখবে না?' বলে তিনি তো চলে গেলেন। কথাটা আমার মাথায় ঘুরতে লাগলো। তারপরে হঠাৎই মনে হলো ক্রীপস্ মিশন ও ক্যাবিনেট মিশন আর এই তেল সংকটকে মিলিয়ে ব্যঙ্গ গীতি লিখলে কেমন হয়? আমাদের অঞ্চলের 'মারিফতি' ঢঙে স্থানীয় ভাষায় গানটি রচনা করেছিলাম:

আজব দেশের আজব কথা কোনো যুগে শুনছনি (সজনি!)
হৈরব তেল কোন্ দেশে গেল খবর জাননি।।

দিল্লীসরের ধলা বাদশা ফরমান করিলা
দরবেশী নাচ নাচবা তাইন্ হক্কল্রে জানাইলা
কত দাওয়াৎ ভেজিল।
মরি হায়...
হাজার মন তেল পুড়িব দেখতে রাধার নাচুনি।।...

ফেরেঙ্গীর খেল শেষ হইলো না আরেক নতুন ঢং
বিলাত থনে আইলা উড়ি তিন বিলাতী সং
মুখে কতই রং চং
মরি হায়...
যেন শ্রীদাম সুদাম লইয়া আইলা যদুকুলমণি।।...

স্বরাজের গাড়ি তৈয়ার হইলো জুড়িল বলদ
চাক্কা তো চলে না দাদা বিস্মিলায় গলদ
হায়রে হায় কি আপদ
মরি হায়...
গাড়োয়ান যত তেল ঢালে ততই চাক্কার কেচ্‌কেচানি।।

একটা কথা মনে রাখবেন। আপনারা এখানে আমার কথাই শুনতে চেয়েছেন, তাই আমার গানের কথাই বলছি। কিন্তু এ সময়ে প্রচুর ভালো গান তৈরি হয়েছে। ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী যে অভূতপূর্ব ধর্মঘটের মাধ্যমে তার শেষ প্রস্তুতির ফরমান জানিয়েছিলো, এবং যে ধর্মঘট পার্টি নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতায় অবশেষে ব্যর্থ হলো বলেই শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচররা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধতে পারলো, সেই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করেই সলিল লিখেছিলো তার সেই বিখ্যাত গান ঃ 'লাখো লাখো করতালে হরতাল হেঁকেছে — হরতাল হরতাল হরতাল।' কাকদ্বীপকে নিয়ে লেখা সলিলের 'শপথ' কবিতাটিও অবশ্য-উল্লেখ্য।

একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামী চেতনাসম্পন্ন এই সব গান রচিত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি পার্টির লাইন-অনুসারী কাঁদুনির গানও লেখা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতার একমাত্র প্রতিষেধক যে শ্রমিক-কৃষকের সংঘবদ্ধ সংগ্রাম, সে কথা না বলে পার্টি-নেতৃত্ব গান্ধীবাদী পথে হিন্দু-মুসলিম একতার প্রচারে নামলো। ১৯৪৭ সালে গণনাট্যসংঘের ৫ম সর্বভারতীয় সম্মেলনে ওমর শেখের মতো শ্রমিক শিল্পী 'ভারতসংঘ কি দুর্জয় বিজয়ী আত্মা/তুঝে প্রণাম, নেতা, তুঝে প্রণাম' গান গেয়েছিলেন। গণনাট্যের মধ্যে এই দুটো লাইনই ছিলো।

এক বছরের মধ্যে কিন্তু গণনাট্যের পট সম্পূর্ণ বদলে গেলো। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পিছুটান উপেক্ষা করেই স্থানীয় নেতৃত্বে তেলেঙ্গানার বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়ে গেলো। ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারীতে কলকাতায় পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে স্লোগান উঠলো: তেলেঙ্গানার পথই আমাদের পথ! ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়! মনে রাখতে হবে, তেলেঙ্গানার কমরেডরাই ভারতে প্রথম মাও-নির্দেশিত নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলেছিলেন। সলিলের সেই সময়কার এই বিখ্যাত গানটিতে ঐ লাইনের প্রেরণা ছিলো:

মহাচীন আর বার্মার পথে পথে মুক্তির কদম বাড়াও
চিয়াঙের দোস্তের রাস্তা তো প্রস্তুত, ঘরে ঘরে প্রস্তুত মাও।

এই সময় থেকে পার্টি ও গণনাট্য আন্দোলন যতই জঙ্গী চেহারা নিতে থাকে, ততই কিন্তু কিছু কিছু সংস্কৃতিকর্মী এ থেকে সরে যেতে থাকেন। বিজন ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, এঁরা বরাবরই রাজনৈতিক ব্যাপারে অনীহ ছিলেন। ১৯৪৬-এর পর থেকেই এঁরা খানিকটা নিষ্প্রভ হয়ে আসেন, এবং ১৯৪৮ এর দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পর বস্তুতঃ এঁদের আর কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। রাজনীতি-বিচ্ছিন্নতার পরিণতিতে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র— যিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার বন্ধু মানুষ— শেষ পর্যন্ত 'লম্বকর্ণপালা', 'রামচরিত মানস' ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। ১৯৬৭ সালে বিহারের দুর্ভিক্ষ নিয়ে তিনি এক গান লিখেছিলেন: 'এসো এই প্রতিজ্ঞা করি/অন্নবস্ত্রে ঝুলি ভরি ভাইরে/এই অন্নবস্ত্র না জোগালে/(এদেশ) রসাতলে যায়রে...।' মন্তব্য বোধহয় নিষ্প্রয়োজন!

তবে আমার কাছে সবচেয়ে বেদনাদায়ক মনে হয়েছিলো বিনয় রায়ের ভূমিকা। সংস্কৃতি-আন্দোলনের নতুন বিপ্লবী লাইন নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। কথায় কথায় তিনি তখন জানিয়েছিলেন যে আসন্ন অতি-গুরুত্বপূর্ণ এলাহাবাদ অধিবেশনে তিনি যেতে পারবেন না, তাঁকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। কোথায় যেতে হবে, সেটা তিনি বলেননি, এবং বলেছিলেন ব্যাপারটা গোপন। স্বভাবতই আমি আর জিজ্ঞসা করিনি। পরে জেনেছিলাম তিনি গিয়েছিলেন মস্কোতে— মস্কো রেডিওর ঘোষক হয়ে। আমার আজও জানতে ইচ্ছে করে, বিনয়ের মতো গণনাট্যের প্রথম সারির একজন নেতাকে ঐ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে সুদূর মস্কোয় পাঠানোর সিদ্ধান্তটি পার্টির কোন্ নেতা নিয়েছিলেন। মস্কো থেকে ফিরে এসে বিনয়— জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন— দিল্লীতে হোলী উৎসবের মিছিলে হোলী গানে প্রগতিশীল বিষয় ঢোকাবার কাজ করেছিলেন। এর চেয়ে হাস্যকর আর কী হতে পারে?

এলাহাবাদ অধিবেশন

১৯৪৯ এর ফেব্রুয়ারীতে এলাহাবাদে বসলো গণনাট্য সংঘের ষষ্ঠ অধিবেশন। এলাহাবাদে গৃহীত প্রস্তাবেই প্রথম নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের উল্লেখ করা হয়: 'কৃষক-মজুর ও নিম্নমধ্যবিত্তের নয়া-গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সঙ্গে পা মিলিয়ে... সাংস্কৃতিক হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করতে হবে।' আমাদের সামনে তখন রয়েছে একদিকে তেলেঙ্গানার সংগ্রাম, অন্যদিকে শিল্পসাহিত্য ক্ষেত্রে স্তালিনের দক্ষিণ হস্ত ঝ্দানভের সংশোধনবাদ বিরোধী বক্তৃতা। তবে, মূলতঃ সঠিক হলেও এলাহাবাদ প্রস্তাবের একটা বড়ো দুর্বলতা ছিলো সাংস্কৃতিক যুক্তফ্রন্ট গড়ার দায়িত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা।

এলাহাবাদে যেসব প্রযোজনা হয়েছিলো, তা অসাধারণ। ওমর শেখ গান গেয়েছিলেন: 'হাম ক্যা জানে, কি ভারতমে আয়া হ্যায় স্বরাজ,/আজভি হাম ভুখা নাঙ্গা হ্যায়, আজ ভি হ্যায় মহ্‌তাজ। 'যাদু কা খুরশি'তে বলরাজ সাহনীর অভিনয় আমার

আজও চোখে লেগে রয়েছে। অনিল ঘোষের 'নয়ানপুর' নাটকও হয়েছিলো চমৎকার। আমার ব্যঙ্গগীতি 'মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য' এখানে উপস্থাপিত করেছিলাম।

এই উপলক্ষ্যে এ গানটি রচনার পটভূমি সম্পর্কে দু একটি কথা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের সিলেটের লাউতা-বাহাদুরপুরের সোনাউল্লা নামক এক জাহাজ-কর্মী অসাধারণ ব্যঙ্গাত্মক বক্তৃতা দিতেন। দশটা গুরুগম্ভীর বক্তৃতায় যে কাজ হতো না, সোনাউল্লার একটা ব্যঙ্গাত্মক বক্তৃতায় তার চর্তুগুণ কাজ হতো। জাহাজী সোনাউল্লা সাংহাই বন্দরে চীনা শ্রমিকদের বিরাট ধর্মঘট দেখে এসেছিলেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো স্বচ্ছ। ব্যঙ্গাত্মক ফর্মের এই অসাধারণ সার্থকতা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলো, 'মাউন্টব্যাটেন' লিখতে। অবশ্য তার আগেই 'হৈরর তেল' লিখেছি।

গানের মুখটা আমি নিয়েছিলাম অনেক আগে শোনা একটি গ্রাম্যগীতি থেকে। গ্রামের বড়ো জমিদারের মৃত্যুতে সে গানে বলা হচ্ছে: 'বাবু গোপীচান্দ রায়/সোনারপুরী আন্ধার কইরা লুকাইলা কোথায়?/পুয়াই (ছেলে) কান্দে, পুড়িয়ে (মেয়ে) কান্দে, কান্দে বাবুর মায়—/দুই তালার উপরে কান্দে রাসমণি বেশ্যায়।' আমি লিখলাম:

মাউন্টব্যাটেন সাহেব ও
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও।
তোমার সোনার পুরী আন্ধার কইরা ও প্রভু কই চলিলায়।।....
সর্দার কান্দে, পণ্ডিত কান্দে, কান্দে মৌলানায় (কিরে হায় হায় রে)
তোমার নয়াদিল্লী ডুবি ডুবু ও, বুঝি ভঙ্গ বঙ্গ ভেসে যায়।।
যেইন তোমার পরবর্তী, আইলা গোপাল রাজচক্রবর্তী
আইলা গান্ধী-ভস্মতিলক মাথায় ধুতিচাদর গায় (মরি হায় হায় রে)।
ক্লাইভ-কার্জনের বংশে বাতি বামুনে জ্বালায় (মরি হায় হায় রে)।
বামুনের খুসী মন, জলভরা নয়ন, তোমার লেডির গাউন
কাইন্দা ভিজায়।।

শুনে মাউন্টব্যাটেন অভয় দিচ্ছেন ঃ
মিছা ক্যানে ভাবনা কর, ভয়ের কিবা আছে,
অশরীরি ছায়া আমার থাকবে কাছে কাছে।। (আমি যাই যাই রে)
আমরা আছি, মার্শাল আছে, আছে আমেরিকা,
এই জাহাজের হও গাধাবোট, নইলে ভীষণ ঠ্যাকা।।
(আমি যাই যাই রে)

সারা দেশে ছড়িয়ে গিয়েছিলো এ গান— কী শহরের বিদগ্ধ মহলে, কী গ্রামের কৃষকসমাজে। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটা সফল পদক্ষেপ হিসেবে এ গান স্বীকৃত হয়েছে। শহরে এ গানটি জনপ্রিয় করার মূলে যাঁর ভূমিকা সবচেয়ে সক্রিয় তিনি হলেন দেবব্রত বিশ্বাস। সে সময় কেবল গণনাট্য নয়, এমনকি বহু রবীন্দ্রসংগীতের আসরেও জর্জদা এ গান গেয়ে অনুষ্ঠান শুরু করতেন। ঋত্বিক আজ নেই, তার মন্তব্য আমার মনে পড়ছে: 'বাংলা ভাষায় এমন satire দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পর আর হয়নি, হবেও না।' গানটি যথেষ্ট দীর্ঘ, কিন্তু মূল রচনা ছিলো দীর্ঘতর। বিনয় রায়ের কথাতে তাকে ছোটো করি। শেষাংশে কীর্তনাঙ্গ সুর ব্যবহারের পরামর্শটি তারই। 'মাউন্টব্যাটেন' যে আমাকে কীভাবে পরিচিত করেছিলো তার একটা প্রমাণ পেয়েছিলাম হাড়ে হাড়ে। ১৯৫১ সালে আমাকে গ্রেপ্তার করে লর্ড সিন্হা রোডের পুলিশ অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দেখি গোয়েন্দা এক অফিসারের কাছে আমার পরিচয় দিচ্ছেন: 'উনিই স্যার 'মাউন্টব্যাটেনে'র লেখক!'

আবার বলছি, আপনারা প্রধানতঃ আমার গানের কথাই জানতে চেয়েছেন, তাই আমার কথাই বারবার বলছি। কিন্তু এই সময়, গণনাট্যের এই দ্বিতীয় পর্বে, প্রচুর ভালো গান রচিত হয়েছে, সেসবের কথা এখানে আলোচনা করছি না। বস্তুত একটা মোটামুটি সঠিক রাজনীতি সামনে থাকলে যে গণ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কী বিরাট সাফল্য অর্জন করা যায়, এই পর্বের গানগুলি তার নিদর্শন। আমার নিজের একটা প্রিয় গানের কথা বলি। বাংলাদেশে পার্টি তখন বেআইনি হয়ে গেছে। আমি জয়ন্তিয়া পাহাড় (আজকের 'মেঘালয়ে') আত্মগোপন করে আছি। জয়ন্তিয়াদের একটা চমৎকার সংগীত ঐতিহ্য আছে। স্প্যানিশ গীটার বা ইয়াকুলুলু বাজিয়ে ঘরে ঘরে গান করে তারা। জ্যেৎস্নারাতে পুরুষরা দল বেঁধে গান করতে বেরোয়। কোনো বাড়িতে গেলে, মেয়েরা বেরিয়ে আসে, 'কোয়াই-পান' দিয়ে আপ্যায়ন করে, গানে যোগ দেয়, তারপর গায়করা আবার গাইতে গাইতে চলে যায়।

প্রভাত পাল নামে আমাদের গণনাট্যেরই এক বন্ধুর বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার সময় একটা অদ্ভুত সুন্দর গান শুনি। গানের বিষয় হলো এই যে দূর বিদেশে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে গায়ক এক 'থানিয়াম' ফুল আবিষ্কার করেছে। সেই সুরটাকে কাজে লাগিয়ে আমি লিখলাম:

আজাদী হয়নি আজো তোর, নববন্ধনশৃংখলডোর
দুখরাত্রি হয়নি ভোর, আগে কদম-কদম চলো জোর।

এর শেষ অংশটা এই রকমঃ

সাম্রাজ্য শাহীর পাতা ফাঁদ, খুনি ধনিকের এ-বনিয়াদ।
ভাঙ্ রে ভাঙ্ শোষণের বাঁধ, শোন্ মহাচীনের সংবাদ।

এই শেষের তিনটি শব্দকে ঘুরিয়ে আবার গাইতাম ঃ 'শোন্ তেলেঙ্গানার সংবাদ'।

১৯৫০-এর শেষ অথবা ১৯৫১-র গোড়ার দিকে— তখনো আমি খাসিয়া পাহাড়ে আত্মগোপন করে আছি— শিলচর জেলের মধ্যে আমাদের এক কৃষক-কমরেড মাধবনাথ শহীদ হন। এক কমরেডের চিঠি পেলাম, ঐ ঘটনা নিয়ে আমি যেন গান লিখি। প্রচণ্ড একটা নাড়া দিলো এই দাবি। এদিকে তখন আমি অসুখে শয্যাশায়ী, গলা দিয়ে স্বর বেরোয়না। সেই অবস্থায় সুরটাকে মনের মধ্যে রেখে বহু কষ্টে আবেগপ্রধান, অলঙ্কারবহুল বিলম্বিত ভাটিয়ালীর একটি বিশেষ ঢঙে লিখেছিলাম—

আমরা তো ভুলি নাই শহীদ, সে কথা ভুলবো না—
তোমার কইল্‌জার খুনে রাঙাইলো যে আন্ধার জেলখানা।

এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা জানানো প্রয়োজন। সোমেন চন্দ্রের মৃত্যুতে সাধন দাশগুপ্তের লেখা একটি গানের কিছু অংশ আমায় অচেতনভাবে প্রভাবিত করেছিলো গানটি রচনার সময়— অবশ্যই কথার প্রভাব, সুরের নয়। 'অচেতনভাবে' এই জন্যে বলছি যে তখন এই প্রভাবের কথা আমার খেয়ালই হয়নি, বহুকাল পরে তা বুঝতে পারি।

তৃতীয় পর্ব ঃ ভাঙা বন্দরের যুগ

গণনাট্য আন্দোলনের এই স্বর্ণযুগ কিন্তু মোটেই দীর্ঘস্থায়ী হলো না। রণদিভে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে একই সঙ্গে সমাধা করার ভ্রান্ত হঠকারী অতিবামপন্থী লাইন দিয়ে তেলেঙ্গানার সঠিক লাইনকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিলেন। তারপরই এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দিলো অজয় ঘোষের দক্ষিণপন্থী শোধনবাদী লাইন। আসলে ও দুটো লাইন তো টাকার এপিঠ আর ওপিঠ ছাড়া আর কিছু নয়। 'Lasting Peace'এ এক সম্পাদকীয় বেরোলো, সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেলো মতটা। জ্যোতিবাবু ময়দানে দাঁড়িয়ে যাকে বলে গলায় গামছা দিয়ে ঘোষণা করলেন: আমরা ভুল করেছিলাম। সবই ভুল? তেলেঙ্গানার অতবড়ো সংগ্রাম, তাও কি ছিলো ভুল?

আবার শুরু হলো শোধনবাদের পথে যাত্রা। পার্টি নামলো '৫২ সালের নির্বাচনে। এই সময়কার গান নাটক ইত্যাদি প্রধানতঃ নির্বাচন কেন্দ্রিক। স্বভাবতঃই সেসব রচনার মান এর আগের পর্বের রচনাদির সঙ্গে কোনভাবেই তুলনীয় নয়। এই সময় আমি প্রচুর 'ভোটের গান' লিখেছি, সেগুলো জনপ্রিয়ও হয়েছিলো। যেমন, 'কংগ্রেসের ভাঙা নাও দে ডুবাইয়া দে/পাঁচ বছরের পাপের সওদায় বোঝাই হইয়াছে।' শুধু কি আমি, নিবারণ পণ্ডিত, গুরুদাস পালের মতো শিল্পীরাও এ সময়ে প্রচুর নির্বাচনের গান লিখেছেন।

এই সময় থেকেই গণনাট্য সংঘ তার চরিত্র হারাতে থাকে। ভাঙনের মুখে যা হয় নোঙরহীন নৌকার মতো যে যেদিকে পারলো ভেসে গেলো। শিল্পে শ্রেণীসংগ্রামকে অস্বীকার করে 'সৎনাট্য', 'নবনাট্য' নামের নাট্য আন্দোলন গড়ে উঠলো। এর জন্য আমাদের লাইনই তো দায়ী। এলাহাবাদে সাংস্কৃতিক যুক্তফ্রন্ট গঠনের উপর আমরা গুরুত্ব দিইনি; এখন আবার অজয় ঘোষের লাইন অনুযায়ী যুক্তফ্রন্ট করতে গিয়ে আমরা যা করলাম তাতে শ্রেণীভিত্তিটাই ধ্বসে গেলো। এককথায় গণনাট্য সংঘ undefined হয়ে গেলো।

তখন আমাদের বিহ্বল করে রেখেছে দেশবিভাগের ঘটনা, এবং পূর্ববাংলা থেকে আগত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু মানুষের অসহায়তা। বিশেষ করে আমরা যারা পূর্ববাংলার মানুষ, তাদের কাছে এটা একটা বিরাট যন্ত্রণার উৎস উঠেছিলো। এই সময়ে লেখা 'মন কান্দে পদ্মার চরের লাইগ্যা' গানটি আমার নিজের বিশেষ প্রিয়।

প্রধানতঃ বাংলার 'বারমাস্যা' রীতিতে ভাটিয়ালি আঙ্গিকে রচিত এ গানটির কিছু অংশ:

আমার মন কান্দে রে পদ্মার চরের লাইগা দরদী রে
মন কান্দে পদ্মার পারের লাইগা।
আমার শান্তির গৃহ সুখের স্বপন রে— দরদী—
কে দিল ভাঙিয়া।...
দরদীরে, আশ্বিন মাসে কত খুসীতে,
ভাই বন আইত নাইওর নিতে—
ভরা গাঙে রঙ্গিলা নাও বাইয়া।
আইজ কোলে আমার লক্ষীন্দর
বিষে অঙ্গ জর জর
আমি বেহুলা চলছি ভেলায় ভাসিয়া...

এইরকম একটা হতাশার সময়ে একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২তে পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের ওপর চললো গুলি। প্রাণ দিলেন মুসলমান বাঙালিরা। 'মুসলমান' কথাটা সচেতনভাবেই ব্যবহার করছি। বাংলা-বিভাগের ঠিক পরবর্তী সেই সময়টাতে পশ্চিম বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বেশ খানিকটা ছড়িয়ে ছিলো। দেশবিভাগের জন্য মুসলমানরাই দায়ী, এরকম একটা মনোভাব ছিলো ব্যাপক। সেইরকম আবহাওয়ায় পূর্ববাংলা থেকে ভেসে এলো সংবাদ— বাংলা ভাষার মর্যাদা দাবি করে শহীদ হয়েছে আবুল বরকত, রফিকুল। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিমূলে এ একটা মস্ত আঘাত।

প্রচণ্ড একটা নাড়া লাগলো মনে। ঠিক করলাম, পালাগান লিখব। কিন্তু এত বড়ো ঘটনাকে ধরি কোন্ সুরে? গুণগুণ করতে করতে মনে হলো ঐতিহাসিক ঘটনাকে ব্যালাডের সুরেই বোধহয় ধরা যাবে। মনে পড়লো, নেত্রকোণার নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলনের রসিদউদ্দীনের ও জামসেদউদ্দীনের কথা। সেদিন সমাগত শ্রোতাদের মধ্যে থেকে এই দুই গায়ক অনাহূত এগিয়ে এসেছিলেন গান গাইতে: 'আমার দুঃখের অন্ত নাই/দুঃখ কার কাছে জানাই।/সুখের স্বপন ভাঙলোরে, চুরাই বাজারে'। জনতার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিধ্বনি জাগিয়েছিলো তাঁদের এগান। সেই সুরেই রচলাম 'ঢাকার ডাক'—

...ও ভাইরে ভাই —
ছিল বুড়ি গঙ্গার মরাপানি
তার বুকে কে আনলো জোয়ানীরে
কার কইল্ জার খুনে বয় উজানী
শুকনা বালুর চরে।
ও ভাইরে ভাই —
একুশে ফেব্রয়ারী দিনে
খুশির মধু নয়া ফাগুনে রে
হঠাৎ দিন দুপুরে অমানিশায়
ঢাকলো অন্ধকার।....

ভাইরে ভাই —
(সেদিন) চাক্কা বন্ধ হইল রেলে
নারায়ণগঞ্জের সূতা কলে রে
সেদিন উঠল না ঢেউ পদ্মার জলে
সুজন নাইয়ার সুরে।
ভাইরে ভাই —
লাল ফাগুনে আগুনের ফুল
শহীদ আবুল, বরকত রফিকুল রে,
মেঘনার দুইকুল হইল আকুল
জীবনের জোয়ারে।।....

গান রচনা করতে করতে এমনি অভিভূত হয়ে পড়িনি কোনো দিন। জানি এখানে সুরহীন কথাগুলি দিয়ে তা প্রকাশ করা যাবে না।

সংস্কৃতি আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালেই পার্ক সার্কাসে Peace Cultural Conference-এর এক বিরাট অনুষ্ঠান হয়। তাতে সারা ভারত থেকে শিল্পীরা এসেছিলেন। ওমর শেখ সেই প্রথম কলকাতায় জনসমক্ষে গান করেন। এই অনুষ্ঠানে দশহাজার লোকের সামনে 'ঢাকার ডাক' বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয়েছিলো। মনে আছে পৃথ্বিরাজ কাপুর— তিনি বাংলা বুঝতেন খুবই ভালো— অনুষ্ঠান শেষে আমায় জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'Undoubtedly the best production from West Bengal'। এভাবে অভিনন্দিত হওয়ার কারণ ছিলো। কিছু অসাধারণ ভালো গায়কের ও বাদকের সমাবেশ হয়েছিলো মঞ্চে। মহানন্দ দাস— যিনি রাস্তায় গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন— তাঁর মতো মিষ্টি মেঠো গলা আমি জীবনে কমই শুনেছি। ঠিক তেমনি পেয়েছিলাম উত্তরবঙ্গের একটি ভাওয়াইয়া কণ্ঠ— আলপনা দেবী। অন্ধ টগর অধিকারী বাজিয়েছিলেন দোতারা, আর পরেশ ধর নিজে বাজিয়ে ছিলেন বাঁশি। সে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

১৯৫১ সাল থেকে আমাদের আন্দোলনের আর এক মুখ্য ধারা ছিলো শান্তি আন্দোলন, যা শ্রেণী চরিত্র হারিয়ে কার্যতঃ ওঁ শান্তি আন্দোলনে পরিণত হয়েছিলো। ১৯৫২ সালে শান্তি আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে স্তালিন বলেছিলেন 'যতদিন সাম্রাজ্যবাদ আছে, ততদিন যুদ্ধ অনিবার্য' এই লেনিনবাদী thesis আজও কার্যকরী। কিন্তু ক্রুশ্চেভ করলেন কী, লেনিনের নীতির বিকৃত ব্যাখ্যা করে ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধ, বিপ্লবী ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে একাকার করে দিলেন। আমাদের গানগুলিতেও তাই "শ্বেতকপোতেরা" হাস্যকরভাবে মার্কিনী শকুনির রক্তাক্ত চঞ্চুতে চুম্বন করতে গেছে।

বিমল ঘোষের লেখা সলিলের সুর দেওয়া সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের রেকর্ড করা 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা' "নিঃসীম নীলিমায়" শান্তি ছড়াতে লাগলো আমাদের কণ্ঠে ভর করে। সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিলো পরেশ ধরের গান: 'শ্বেতকপোত আঁকা, শান্তিপতাকা/এই পতাকা হাতে নিয়ে যুদ্ধ দানবে হটাবো/চলবে না তো ভয় করে থাকা।' আমার কিছু গানেও 'শ্বেতকপোত' punch করে ঢুকিয়ে ছিলাম। যেমন আমার 'লঙর ছাড়িয়া নাও-এর দে দুঃখী নাইয়া/বাদাম উড়াইয়া নাও এর দে'— এই বহুপ্রচলিত সারি গানটিতে শান্তির তাগিদে ঢুকিয়ে ছিলাম ঃ 'তোর ধলা পালে শান্তি পায়রার পাখনা মেইলা দে।' নখদন্তহীন এই শান্তির সঙ্গে উপনিষদীয় শান্তির আর কোনো তফাৎ রইলো না। ১৯৫৩ সালে গণনাট্য সংঘের বোম্বাই অধিবেশনে উদ্বোধনী গীত গাইলেন পশ্চিমবাংলার স্কোয়াড। কী গান গাইলেন তাঁরা? রবীন্দ্রনাথের 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অম্বর মাঝে/দিকে দিগন্তরে ভুবনমন্দিরে শান্তি সংগীত বাজে।' একে রবীন্দ্রনাথ, তায় 'শান্তি সঙ্গীত', অতএব এর চেয়ে উপযুক্ত গান আর তখন কী হতে পারে!

বোম্বাই অধিবেশন বিতর্ক

বোম্বাই অধিবেশনে মিউজিক কমিশনে আমাদের গণসংগীতের বিভিন্ন ধারার উপর আমি একটা paper পড়েছিলাম। গণসংগীতের আঙ্গিকের প্রশ্নে সলিলের সঙ্গে আমার এক তীব্র বিতর্ক দেখা দেয়। সভাপতিত্ব করেছিলেন চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট সংগীতকার অনিল বিশ্বাস। বিতর্ক এমন তীব্র ও আকর্ষণীয় হয়েছিলো যে Times of India তা নিয়ে মন্তব্য করেছিলো। সেই দীর্ঘ আলোচনায় না গিয়ে এখানে দু'একটা মূল কথা বলবো।

তেভাগা, নৌবিদ্রোহ, ২৯শে জুলাইয়ের ধর্মঘট থেকে এলাহাবাদ সম্মেলনের অব্যবহিত পরে অবধি সলিলের গানের বিষয়বস্তু ও সুরারোপের মধ্যে যে vigour ছিলো, তেলেঙ্গানার পরাজয় এবং পার্টির অতিবাম শোধনবাদের প্রভাবে তা স্তিমিত হয়ে আসে। সলিল সংগীতে formalism-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে। পাশ্চাত্য orchestration-এর জ্ঞান ছিলো তার, প্রথম থেকেই তার গানে এই ঝোঁক ছিলো। কিন্তু সলিলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পশ্চিমবাংলার নতুন গীতিকাররা তারই ব্যর্থ অনুকরণ করতে শুরু করে দিলেন। এই formalism-কে তীব্র আক্রমণ করে আমি বলেছিলাম যে সলিল গণসংগীতে জাতীয় ঐতিহ্য হারিয়ে Cosmpolitanism-এর পানে ধাওয়া করেছে। স্তালিনের সেই বক্তব্য ঃ 'International in content, national in form'— এই ছিলো আমার তাত্ত্বিক ভিত্তি।

জবাবে সলিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদের উদাহরণ দিয়ে বিদেশী সুর ও সুরসংগতির স্বপক্ষে যুক্তি দেয়। সে বলেছিলো, আমরা যদি গরুর গাড়ি ছেড়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অবদান রেলগাড়িকে গ্রহণ করে থাকি, তবে পাশ্চাত্য সংগীত কী দোষ করলো? বিজ্ঞান ও আর্টের পরিবর্তন যে একই ভাবে হতে পারে না, সেটা ভুলে গিয়ে সলিল আন্তর্জাতিকতার নামে যা বলেছিলো তা ছিলো পুরোপুরি মার্কসবাদ বিরোধী

'কাদের জন্য আমাদের শিল্পসাহিত্য?'— মাওয়ের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে সেই বিতর্কে আমি জনতার আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে লৌকিক মাধ্যমের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার বক্তব্যেও বিশ্লেষণের মধ্যে একপেশেমি এসে গিয়েছিলো। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিতে কেবল লোকসংগীত নয়, রাগসংগীতেরও যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, আমাদের স্বদেশী গানের মধ্যে রাগসংগীতের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে, এমন কি লোকসংগীতের সুরের মধ্যেও যে রাগসংগীতের উপাদান মিশে আছে, সে সম্পর্কে আমার বিশ্লেষণ খুবই অস্পষ্ট ছিলো। দ্বিতীয়তঃ, লোকসংগীত বলতে শুধুই আঞ্চলিক না সারা ভারতের লোকসংগীত, এ ব্যাপারটাও আলোচিত হয়নি। পূর্ব বাংলার সারি-গানের ঢঙে রচিত 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান' মণিপুরের কৃষক তো ঠিকই গায়। উত্তরচীনের শেন্‌শি-প্রদেশের লোকসংগীতের ঢঙে রচিত 'তুং ফাং হোং' ('পূর্ব দিক লাল') কি আমার দেশে কৃষককে শেখাবো না?

কিন্তু, বিষয়বস্তুর আলোচনাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে এভাবে শুধু লোক-আঙ্গিক নিয়ে বিতর্ক চালনো, এটাও তো এক ধরনের সলিলের formalism-এর সমালোচনা করতে গিয়ে আমি নিজেও এক ধরনের formalism-এর শিকার হয়েছিলাম। লড়াইটা হয়েছিলো form-এর। সলিলের 'ও মাঝি ভাই ও' গানটির সমালোচনা করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে এই মাঝির গান' মাঝি কখনো গায় না। এ গানটি তখন হারমোনাইজ্ করে গাওয়া হতো। এ গানের সঙ্গে সলিলের আগের কোরাস গান 'ঢেউ উঠছে কারা টুটছে'-র সার্থক হারমনির পার্থক্য আমি তুলে ধরতে পারিনি। গণনাট্যই গণসংগীতে প্রথম সার্থক কোরাস্ গান উপস্থিত করেছিলো। তার আগে অবধি যা হতো সে হচ্ছে যাকে বলে— একই স্বরে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়ে সবাই গাইতো। কিন্তু সলিলের নেতৃত্বে হারমোনাইজ করে যখন কোরাস্ গান গাওয়া হতো, তার মধ্যে বিপ্লবী চেতনায় উদ্দীপিত চলমান গণমানসিকতায় একটা বহুমুখী dimension সার্থকভাবে ধরা পড়তো গণসংগীতে; আর 'ও মাঝি ভাই ও' গানটিতে বিমূর্ত সাংগীতিক পলায়নপরতা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। প্রশ্নটিকে এইভাবে আলোচনা করতে পারিনি বলেই আমাদের বিতর্ক শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো লোক-আঙ্গিক না নাগরিক-আঙ্গিক, এই প্রশ্নে।

আর, লৌকিক ঐতিহ্য ও লোকসংগীত তো এক কথা নয়। আমাদের গ্রাম জীবনেও ব্যান্ডপার্টি এসেছিলো অনেক আগেই। আমাদের গগন ঢুলি এক ব্যান্ডপার্টি তৈরি করেছিলো। যাত্রা কনসার্টে গানের ট্রাম্পেট, ট্রম্বোন ও ক্লারিওনেট এসেছে। কাজেই বর্তমানে একতারা বা দোতারার আধিপত্য স্বীকার করে নিলেও তার পাশে কোনোদিন বিপ্লবী কোরাসের প্রয়োজনে স্প্যানিশ গীটার বা অ্যাকর্ডিয়ান দেখলে আঁৎকে ওঠার কোনো কারণ নেই। তবে কথা হচ্ছে, জনতা থেকে বা গণসংগ্রাম থেকে দূরে সরে থেকে যতই তর্কবিতর্ক জনতা থেকে বা গণসংগ্রাম থেকে দূরে সরে থেকে যতই তর্কবিতর্ক বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি না কেন, তা বিপথগামী হতে বাধ্য।

বোম্বাই অধিবেশনে পূর্ববর্তী এলাহাবাদ অধিবেশনের সব কিছুকেই ''বামপন্থী হঠকারিতা'' বলে বিপ্লবী ঐতিহ্যকে নাকচ করার প্রবণতা খুবই প্রবল ছিলো। এই দক্ষিণপন্থী প্রবণতা ছিলো বলেই অবশেষে সংগীত-নাটক একাডেমির affiliation চাইতেও বাধেনি আমাদের। আমি নিজেও এই সংক্রান্ত খসড়া কমিটির মধ্যে ছিলাম। ১৯৫৮-র দিল্লী অধিবেশনে এর পূর্ণাহুতি দিলাম আমরা। ভারত সরকারের মন্ত্রী মহোদয়ের পদধূলি পড়লো আমাদের অনুষ্ঠান মণ্ডপে। এই আমাদের চরম পতনের যুগ শুরু হ'লো।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা বলি। মৃত্যুর কিছুদিন আগে বলরাজ সাহনী আমায় একটা চিঠি লিখেছিলেন। সম্ভবতঃ বিবেক তাড়িত হয়ে গণনাট্য আন্দোলনের পতন নিয়ে অনেক আক্ষেপ করেছিলেন সে চিঠিতে। মজার ব্যাপার যেটা তা এই যে তাঁর মতে এলাহাবাদে আমরা যে ''বামপন্থী'' হঠকারিতা করেছিলাম, তারই পরিণতিতে নাকি গণনাট্য আন্দোলনের এই দুর্দশা। একথা অবশ্য স্মরণীয় যে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় বলরাজ চীনবিরোধী স্রোতেই গা ভাসিয়েছিলেন, চীনবিরোধী 'হকীকৎ' ছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন।

দিল্লী অধিবেশনের সময় আমি চীনে। নিরঞ্জনের চিঠিতে সব খবর পাচ্ছি আমি। চীনে থাকাকালীন ঐতিহাসিক ক্যান্টন কমিউনের (১৯২৭) ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ক্যান্টনের সেই নয়নাভিরাম সুবিশাল শহীদ সৌধে মাল্যদান করার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। সেই উপলক্ষ্যে গান লিখেছিলাম ঃ

এই সমাধি তলে কত প্রাণ প্রদীপ জ্বলে,
এই সমাধিতলে হাজার প্রদীপ উজলে।
মৃত্যু হেথায় মহান হলো জীবন অনুরাগে,
নিগৃহীত স্বপ্ন হেথায় সত্য হয়ে জাগে।

চীন থেকে ফিরে আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাধলো আসামের ভাষাদাঙ্গা। ১৯৬০ সালের সেই ভাষা দাঙ্গার কথা নিশ্চয়ই অনেকেরই মনে আছে। আসামে তখন বাংলার কথা বলা, বাংলা গান গাওয়া প্রায় বন্ধ। চারদিকে কারফিউ। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত, বিভক্ত। সেই অবস্থায় ভূপেন হাজারিকা ও আমি এক দাঙ্গা-বিরোধী গীতি-আলেখ্য 'হারাধন-রঙমন কথা' গেয়ে সারা আসাম ঘুরেছি। আমাদের গানের দলে অসমীয়া, বাঙালী, নেপালী, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া সব ছিলো। অসমীয়া কৃষক রঙমনের ভূমিকায় ভূপেন বিহু সুরে গাইতো:

লুইতর চাপরিত চাকৈয়ে কান্দিলে মানুহর নাওখন চাই।
মানুহর দুখতে মানুষ বুঝিব আনকছোন দোষিবর নাই।
(চখা কাঁদে চখী কাঁদে ব্রহ্মপুত্র চরে

নিজের হাতে ডুবিয়ে 'নাও' মানুষ ডুবে মরে)

পদ্মার উজান ঠেলে আসা উদ্বাস্তু বাঙালি কৃষক হারাধনের ভূমিকায় আমি গাইতাম, ভাটিয়ালীতে:

আমার ভাঙা নাওয়ে বন্ধু তুমি দিলায় পাল।
আমি ধরলাম বৈঠা বন্ধু তুমি ধরলায় হাল।
ঐ মিলন গাঙ্গে আনলো বলো কে বিভেদের বান
চর ভাঙ্গিল ঘর ভাঙিল ডুবলো সোনার ধান।

শেষ হতো উভয়ের সম্মিলিত গানে ঃ

তুমি নাচ বিহু নাচ আমি দিব তালি
ঐক্যতানে মিলে যাবে বিহু-ভাটিয়ালি।

শহরে শহরে এ গান গেয়ে আমরা আসামে দাঙ্গাবিরোধী এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিলাম। অনেক তো ভাবনা ছিলো। কিন্তু অপ্রীতিকর ঘটনা দূরে থাকুক, জনসাধারণের উদ্বেল অভিনন্দন অভিভূত করেছিলো আমাদের। অসমীয়া-বাঙালী নির্বিশেষে কত লোক কেঁদেছে গান শুনে, বলেছে, আপনারা আর কিছুদিন আগে এলেননা কেন! আসামের ইতিহাসে এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে আছে।

১৯৬২ এবং তারপর

১৯৫৮ সালের দিল্লীর অধিবেশনে যে প্রক্রিয়ার শুরু, তার চূড়ান্ত পরিণতি অবশেষে দেখা গেলো ১৯৬২-তে। বুর্জোয়া উগ্র জাতীয়তাবাদের বন্যায় ভেসে গেলেন প্রগতিবাদীরা, সবাই নাম লেখালেন প্যাট্রিয়টের খাতায়। ৪৬নং ধর্মতলার বংশে বাতি দিতে কেউ রইলো না। গণনাট্য সংঘ বহু প্রদেশেই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের হাতে পড়লো। পশ্চিমবাংলার গণনাট্যসংঘ খানিকটা সুস্থ চেতনার পরিচয় দিলেও একেবারে নীরব হয়ে পড়লেন।

সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার ধারা এক সময়ে আমাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রবল ছিলো। এখন তা একেবারে স্তিমিত হয়ে পড়লো। এই সময় থেকে আমি কিছু আন্তর্জাতিক গানের অনুবাদ ও প্রচারে মন দিই। সে প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি। তার আগে একটা কথা বলা খুবই দরকার।

'৬২-র পরবর্তী মুহ্যমান অবস্থার মোড় ফিরেছিলো 'কল্লোল' নাটকে। 'কল্লোল' আমাদের নাট্যআন্দোলনের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিলো। সেই নাটকে সংগীতকার হিসেবে যুক্ত ছিলাম ভেবে আমি গর্ব অনুভব করি। মহারাষ্ট্রের 'পোয়াডা' ঢঙে রচিত (ঘটনাটাও মহারাষ্ট্রের) 'কল্লোল'-এর প্রস্তাবনা-গীতটি এখন খুবই জনপ্রিয়। এই 'পোয়াডা' সুরকে আগে আরো সার্থকভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন বিনয় রায়, তাঁর 'সপ্তকোটি জনরঙ্গভূমি' গানটিতে। কিন্তু তখনকার যোশী-লাইন অনুযায়ী সেখানে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী মনোভাব আত্মপ্রকাশ করেছিলো। আমি শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নাবিকবিদ্রোহকে দেখাবার চেষ্টা করেছিলাম আমার গানে।

'কল্লোল' যখন কলকাতাকে কাঁপিয়ে তুলেছে, সেই সময় ১৯৬৭-তে ঘটলো নকশালবাড়ির ঘটনা। একটা ঢেউ জাগলো। শুরু হলো 'তীর' নাটক।, এ নাটকেও আমি ছিলাম সংগীত পরিচালক। শুক্রা ওঁরাওয়ের কণ্ঠে মূল গান 'সর্ সর্ সর্ সর্ হাওয়া আয়ি' সংগ্রহ ক'রে এনে বাজানো হয়েছিলো এ নাটকে। নেপালী গান 'বীর প্রধানো'-র সুরকে কাজে লাগিয়েছিলাম আমি কালু সিংহের সাহায্যে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে, 'কল্লোল' বা তার পরবর্তী এই সব প্রযোজনার বিরোধিতায় কেবল ঝানু প্রতিক্রিয়াশীলরাই কোমর বাঁধেনি, আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে পশ্চিমবাংলার 'গণনাট্য সংঘ' পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলো। গণনাট্য আন্দোলন আর 'গণনাট্য সংঘ' যে এক কথা নয়, সেটা বোধহয় আগেই বলেছি, কিন্তু এই সময় থেকে গণনাট্য আন্দোলনের ধারা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই 'গণনাট্য সংঘ'কে অতিক্রম ক'রে যায়। তবে, 'গণনাট্য সংঘে'র মধ্যেও যে সঠিক প্রবণতা ছিলো তার প্রমাণ হিসেবে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'লং মার্চ' নাটকটি উল্লেখ্য।

লিট্‌ল থিয়েটারের সেই সময়কার নাটকগুলির অভিঘাত এক নতুন সংস্কৃতি-আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। তৈরি হয় 'প্রগতিশীল গণশিল্পী সংস্থা'। কিন্তু আন্দোলন একটা সুসম্পূর্ণ রূপ পাবার আগেই সব ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। একদিকে অতিবামপন্থী হঠকারিতা, যা শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালো মূর্তিভাঙার চরম নেতিবাচকপন্থায়, অন্যদিকে নাট্য-আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আত্মসমর্পণ— এই দুই মিলে সংস্কৃতি আন্দোলনের সর্বনাশ হলো। এর ফলে লাভ যদি কিছুর হয়ে থাকে, সে অপসংস্কৃতির।

সর্বহারা আন্তর্জাতিক স্তিমিত ধারাকে খানিকটা চাঙ্গা করার প্রয়াসে আমি এই সময় কিছু কিছু বিখ্যাত আন্তর্জাতিক গানের অনুবাদে মনোযোগী হই। 'ভেদি অনশন মৃত্যু তুষার তুফান' গানটি তেলেঙ্গানার যুগেই অনুবাদ করেছিলাম, কিন্তু তখন গানটি চালু হয়নি। কিছু অদলবদল ক'রে গানটি আবার চালু করি। লেনিন শতবার্ষিকীতে লেনিনের অতি প্রিয় গান 'ভার্শাভিয়াংকা' অনুবাদ করলাম— 'ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু ঘিরে আজ চারিদিকে অন্ধকারের চক্রান্ত কঠিন'। ল্যাংস্টন হিউজের 'Comrade Lenin of Russia'র অনুবাদ করেছিলেন বিষ্ণু দে ঃ 'রুশদেশের কমরেড লেনিন'। এতে সুর সংযোজনা আমি করলাম। আমেরিকার নিগ্রো মুক্তি আন্দোলনের প্রথম শ্বেতাঙ্গ শহীদ জন ব্রাউনকে নিয়ে রচিত, আমেরিকার সর্বজনপ্রিয় 'John Brown's body lies a'mouldring in the grave'-এর আমার করা বাংলা রূপান্তর আজকাল বেশ জনপ্রিয় হয়েছে ঃ 'জন ব্রাউনের দেহ শুয়ে সমাধিতলে'। আমেরিকার আরেকটি বিখ্যাত ব্যালাড 'জন হেনরি'র আমার করা বাংলা অনুবাদ আজকাল বেশ পরিচিত এখানে।

এছাড়া চীনের 'তুং ফাং হোং'-এর বাংলা 'পূব দিক লাল'

তো বিশেষ ভাবেই পরিচিত। মাও-সেতুঙের উদ্দেশ্যে একটি গান লিখেছিলাম: 'আমাদের ফুলবাগিচার তুমি মালাকর/ পূর্বাচলের রাঙা উষার তুমি চিত্রকর'। চীনের আশি কোটি মানুষের প্রিয় গান 'তা হায় হান্ শিং'-এর বাংলা করেছি বলে আমি বোধহয় খানিকটা সংগত গর্ব অনুভব করতে পারি: 'সাগরযাত্রা নাবিক নির্ভর মাটির ফুল ফল সূর্য-নির্ভর।' চীনের কিছু লোকসংগীত, বিপ্লবী গানের অনুবাদ করেছি আমি, স্থানাভাবে সেগুলির আর উল্লেখ করছি না। চারণদল প্রযোজিত 'লাল লণ্ঠন' অপেরাতেও কিছু চীনা সুর কাজে লাগিয়েছিলাম। গানগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলো। মাও সেতুঙের ৮০ তম জন্মদিনে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলাম কেদারা রাগ অবলম্বনে রচিত আমার নিজের এই প্রিয় গানটিতে: 'আরো বসন্ত, বহু বসন্ত, তোমার জীবনে আসুক/সেই তো মোদের কামনা দিশারী, সেই তো মোদের সুখ।'

এ প্রসঙ্গে আর একটি মাত্র গানের উল্লেখ করবো। সেটি ডঃ দ্বারকানাথ কোটনীসের উপর রচিত: 'ভারতের হিমালয়ের এক শিশু দেবদারু/মহাচীনের থাইহাং পাহাড়ে হয়েছে সে মহীরুহ/আহা, কী মহান মহীরুহ।' কলকাতায় চীনা টেবল টেনিস দলের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে এ গানটি গাওয়া হয়েছিলো।

শঙ্খচিল

এই পর্বে আমার সবচেয়ে প্রশংসিত, এবং একই সঙ্গে সর্বাধিক সমালোচিত গান হলো 'শঙ্খচিলের গান'। এ গানটির canvas বহুদূরবিস্তৃত। এখানে 'সাগরিকা' হলো হিরোশিমা এবং তার ধ্বংসের একমাত্র সাক্ষী শঙ্খচিল হলো সংগ্রামী জনতার প্রতীক, যে অপরাজেয়, যাকে পারমাণবিক বোমা ধ্বংস করতে পারেনা। গানটি চিত্রধর্মী। সুরের মধ্যে দিয়ে যে ছবি আঁকার ও মুড তৈরি করার চেষ্টা করেছি তা বহু লোকের কাছেই অভিনন্দিত হয়েছে। অন্যদিকে, কেউ কেউ আবার গানটিকে আক্রমণ করেছেন। যেমন, অক্টোবর ১৯৭৩-এর 'গণনাট্য' পত্রিকায় ঠাট্টা করা হয়েছে এই বলে ঃ '...মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্যের হেমাঙ্গদা কেনই বা শঙ্খচিলের রঙের বাহারে সুরের কারিকুরির আর উপমা-প্রতীকের ধাঁধা নিয়ে "সুদূর সমুদ্দরে" হারিয়ে গেলেন। কেন এমনটি হলো?' আর একটু সৎ হলে সমালোচক দেখতে পেতেন যে "সুদূর সমুদ্দুরের" শঙ্খচিল প্রশান্ত থেকে অতলান্তে বিদ্রোহের ঝড় তোলে, বাসা বাঁধে ভিয়েৎনামের ত্রুয়ংশং পাহাড়ের গেরিলাদের সঙ্গে। আসলে, এঁদের কাছে আজ আন্তর্জাতিকতার অর্থ হলো দেশের মাটি থেকে পলায়ন। সাগরিকা যে হিরোশিমা, এবং শঙ্খচিল যে সংগ্রামী জনতার প্রতীক তা গানের কথাতেই স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে, সুতরাং উপমা প্রতীকের "ধাঁধাঁ" ব্যাপারটা বোঝা গেলো না।

'শঙ্খচিলে'র সুরারোপে যে-আঙ্গিকের ব্যবহার করেছি, তা নিয়ে কোনো বিতর্ক উঠলে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনবো। একথা তো ঠিক, একদিন সংগ্রামী জনতার যে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছিলাম, আজ আর তা আমার নেই। তাই জনতার সত্যিকারের কোনো প্রতিনিধির সমালোচনা আমার শিরোধার্য। তবে, 'সুরের কারিকুরি' নিয়ে আমার একটা বক্তব্য আছে। জনগণের জন্য সরল সহজবোধ্য রচনার কথা বলে মাও সেতুং ক্যাডারদের জন্য— যাঁরা জনগণের অগ্রণী অংশ— অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতির অপরিহার্যতার কথাও বলেছেন। শুধু বলেছেন নয়, এই দায়িত্বকে অবহেলা করাটা ভুল বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করা এবং মান উন্নয়ন করা, এই দুটো কাজ পরস্পরসম্পর্কিত বলে তিনি মন্তব্য করেছেন ('ইয়েনান ফোরাম' এবং 'নয়াগণতন্ত্র প্রসঙ্গে' দ্রষ্টব্য)। সেদিক থেকে 'শঙ্খচিলে'র কোনো গুরুত্ব আছে কিনা ভেবে দেখতে বলি।

উপসংহার

একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠতে পারে ঃ এত যে গান, এর প্রচার কোথায়? আগে আন্দোলনের ঢেউয়ে ঢেউয়ে গান ছড়াতো লোকের মুখে মুখে। গণনাট্যসংঘ একটা বিরাট সর্বভারতীয় মাধ্যম ছিলো। আজ সে আন্দোলনও নেই, সে মাধ্যমও নেই। সমস্ত গণমাধ্যম আজ একচেটিয়ার হাতে, গানের প্রচার হবে কী করে? গত খাদ্য আন্দোলনের সময় একটা গান লিখেছিলাম: 'গুলিবিদ্ধ গান যে আমার খুঁজে খুঁজে মরে/কোন্ অভাগিনী মায়ের সন্তান ফেরেনি ঘরে/সান্ধ্য আইনের কুটিল অন্ধকার/কৃষনগর হতে সে যায় কোন্নগরে। ঘুরে আউলি হয়ে বসিরহাটে ইচ্ছামতীর চরে'। কিন্তু, এ গান গাইবার মাধ্যম নেই, আমি নিজেও যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন।

আজকে পশ্চিমবাংলার যে "গণনাট্য সংঘ", সংস্কৃতি-আন্দোলনে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা তার আছে বলে তো মনে হয় না। গণনাট্য আন্দোলন আজকের 'গণনাট্য সংঘে'র পরিধি ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। 'গণনাট্য সংঘে' talent-এর অভাব নেই, অভাব যে জিনিসটার তা হলো সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের। আজো এর নেতৃত্ব সোভিয়েতকে সামাজিক সাম্রাজ্য-বাদী বলে চিহ্নিত করতে রাজি নন। চীনের সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তাৎপর্যও তাঁরা বোঝেন বলে মনে হয় না। অথচ আজকের দিনে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে বুঝতে না পারলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া অসম্ভব।

অন্যদিকে যাঁরা সঠিক রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে এগোচ্ছেন, তাঁরা আবার যথেষ্ট সংগঠিত নন। 'ওপেন থিয়েটার' নামক তরুণ গোষ্ঠীটি তাঁদের 'নয়া জার' 'গাজীর গানের' মাধ্যমে তাঁদের সঠিক রাজনীতি চেতনার ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। বিচ্ছিন্নভাবে আরো বেশ কিছু ভালো গান তৈরি হয়েছে। নিবারণবাবু আজ আবার গান লিখছেন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে। পরেশ ধর এই বয়সে আবার গানের দল করে সক্রিয় হয়েছেন। পশ্চিমবাংলার 'গণনাট্য সংঘে'র নেতৃত্ব যতই ভ্রান্ত হোক, তাঁদেরই সংগঠনের শ্রীজীব গোস্বামী বা দিলীপ সেনগুপ্তর মতো রচয়িতারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল রচনা কিছু

করেছেন। 'পথিকৃৎ'-এর গানের দলে শক্তিশালী গায়ক ও রচয়িতা আছেন। সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে মেদিনীপুর জেলের বিপ্লবী বন্দীরা কিছু গান লিখেছেন যা কথা সুরারোপ উভয় দিক থেকে সার্থক, এবং বক্তব্যের দিক থেকেও অগ্রসর। সর্বোপরি রয়েছে এ যুগের আদর্শ বিপ্লবী কবি সুব্বারাও পাণিগ্রাহীর বিপ্লবী গানের সংগ্রহ। এই বুড়ো বয়সে ভাঙা গলায় আমিও গণসংগীত সংস্থায় কিছু নতুন সুকণ্ঠ শিল্পীকে নিয়ে গান গাইছি। কিন্তু আজকের অপসংস্কৃতির প্লাবনের মুখে একটা মজবুত সংগঠন তৈরি হওয়াটা একান্ত প্রয়োজন, প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বাধীনে একটা গণতান্ত্রিক মোর্চা তৈরি। অপসংস্কৃতি বলতে তো কেবল ক্যাবারে আর হিন্দী ছবি বোঝায় না, যা কিছু আমাদের সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদবিরোধী সংগ্রাম থেকে সরিয়ে রাখে তাই অপসংস্কৃতি। এই প্রসঙ্গে সাংস্কৃতিক মহলে সোভিয়েতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কথাটাও বিশেষভাবেই ভাববার।

আসল কথা, আমাদের সব প্রচেষ্টাকে একটা শক্ত সুতোয় বাঁধতে হবে। সঠিক রাজনীতি ও মতাদর্শই হলো সেই শক্ত সুতো। আর মূল সমস্যা হলো, যারা আমাদের আসল শ্রোতা— কৃষক ও মজুর— তাদের কাছে যাওয়া। আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে আমাদের নিরক্ষর জনতার জন্যে গানের অবাধ অধিকার। কোনো প্রহরীই গানকে আটকাতে পারে না। গানের পাসপোর্ট লাগে না। ঝরাপাতায় আজ সবুজ ঘাস যতই আচ্ছন্ন হোক, বৈশাখী ঝড়ে ঝরাপাতার পাহাড় উড়ে গেলেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে ঘাসের অঙ্কুর। আমাদের আবার তুলতে হবে প্রগতি সংস্কৃতির ঝড়।

☐ *প্রথম প্রকাশ : প্রস্তুতিপর্ব (অক্টোবর ১৯৭৬)*

লোকসঙ্গীতের দৃষ্টিকোণ

কিছুদিন যাবৎ লোকসংগীত সম্বন্ধে কিছু কথা একক ভাবে হলেও বলে আসছি। বারবার একটা কথা বলা শ্লোগানের মতো শোনালেও বলার প্রয়োজন আছে। মর্মবাণী যদি সত্য হয়— তবে শ্লোগান হয় পথের দিশারী।

আমার বক্তব্যের নির্যাস হল : লোকসংগীত 'সুগম সংগীত' নয় দুর্গম সংগীত। 'সুগম সংগীত' কথাটা চালু করে আকাশবাণী। লোকগীতিকেও তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সহরের বাগিচায় দাদ্‌রা-কাহারবায় হারমোনিয়ম ও তবলা লহরায় চাষ করা কয়েকটা বিক্ষিপ্ত লোকগীতি শিখেই আকাশবাণীর অডিশনে পাশ করে শিল্পীর খাতায় নাম লেখানো যায়। তাই বলা হয়— যার নাই কোনো গতি, সে গায় পল্লীগীতি।

লোকসংগীত একটি জীবনচর্যা

লোকসংগীত আয়ত্ত করার সমস্যাটা মূলত একাত্ম হওয়ার সমস্যা। লোকসংগীত গুরুমুখী নয়, জনতামুখী। উৎপাদক গতরে-খাটা মানুষের সৃষ্টি— সেই মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েই শিখতে হয়।

সেইজন্যই বলি লোকসংগীতে কোনো ঘরানা নেই, আছে বাহিরানা, অর্থাৎ আঞ্চলিকতা। গায়কির মূল স্টাইলটি সেই আঞ্চলিকতাতেই বিধৃত। ভৌগোলিক প্রকৃতি, উপভাষা, উচ্চারণ, Phonetics— এ সবকে নিয়েই শ্রমপ্রক্রিয়ায় সেই স্টাইলের জন্ম।

তারই যোগফল হল গলার গ্রাম্যতা। গলার গ্রাম্যতা বা folk-timbre হল লোকসংগীতের আসল কথা। Folk style ও folk-timbre-টির উৎস হল মূলত ethnic। বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে, বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতির সূত্রে গাঁথা বিশেষ উপভাষাভাষী আদিবাসী বা খণ্ডজাতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ কণ্ঠস্বরের timbre ও style জন্ম নেয়— যা অন্যদের পক্ষে আয়ত্ত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, অনেক সময় প্রায় অসাধ্য— যা শহুরে রেওয়াজে শেখানো যায় না। একেই আমি বলি গলার গ্রাম্যতা। এ ছাড়া লোকগীতি রাম ছাড়া রামায়ণ। অথচ শহরের সংগীতশাস্ত্রজ্ঞ কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন— শহরে পরিবেশনের সময় 'গ্রাম্যতা দোষ' বর্জন করতে হবে। সেই যুক্তির ফাঁকে শহরের রেওয়াজী সুকণ্ঠ ও সুকণ্ঠীদের দ্বারা পরিবেশন শুনতে পাই যাতে তোর্ষা নদীর ঘোলাজল— পরিশোধিত হতে হতে 'ডিস্টিল্‌ড ওয়াটার' হয়ে পরিবেশিত হয়।

শ্রমজীবন থেকে আসে ছন্দ

দুই আর তিন-এর টানাপোড়েনে পৃথিবীর সমস্ত তাল। কিন্তু ছন্দের বৈচিত্র্য অসীম। পাশ্চাত্যের ফক্সট্রট, ওয়ালজ্‌ বা ট্যাঙ্গো ইত্যাদির মতো আমাদের লোকসংগীতেরও আছে অসংখ্য ছন্দবৈচিত্র্য। একে তব্‌লার শাস্ত্রীয় বোলবাণীতে দাদ্‌রা ও কাহারবায় ফেলে নিত্য হত্যা করা হচ্ছে। আবার লোক-সংগীতের শ্রুতির কাজকে হত্যা করছে হারমোনিয়াম। সেজন্য লোকগীতি লৌকিক বাদ্যযন্ত্রেই গাইতে হবে। অন্যবিহনে শুধু একটি একতারা হলেও চলে। 'লাউয়া'র তো ছন্দই আছে। দোতারারও আছে তাল ও ছন্দ। ঢোলক বা ডপ্‌কীর স্থান দরবারী তব্‌লা কখনোই নিতে পারে না। লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের উৎপত্তি একদিনে হয়নি। লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের একটা বহুকালাশ্রয়ী সামাজিক ভাবানুষঙ্গ আছে— যা লোকসংগীতের পরিবেশ সৃষ্টি করে— যে পরিবেশহীন কোনো গান— জলছাড়া মীনের মতো।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ ছাড়া একাত্ম হওয়া যায় না

যারা হাল চযে, দাঁড় টানে, তাঁত বোনে, তাদের কণ্ঠে গান কিন্তু

পেটে ক্ষুধার টান। গ্রামের জমিদার, জোতদার, ধনী কৃষক, মহাজন এবং নানারকম ফড়েরা কীভাবে তাদের শ্রম শোষণ করে নিচ্ছে— সে অনুসন্ধান ও অনুভূতিটা একান্ত হওয়ার প্রাথমিক করণীয়। শোষকের বিরুদ্ধে এদের প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন সংগ্রামের ইতিহাসটা জানতেই হবে। এই দৃষ্টিকোণের টেলিস্কোপটা হল মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ। এটাই একমাত্র ঐতিহাসিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ যার আলোতে আমরা সব দেখতে পাব। শোষক শোষিতের এই সংঘাতটা প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিফলিত লোকগীতির জীবনদর্শনে, এমনকি তার সুরের ক্ষেত্রেও।

কর্মনিঃসৃত লোকসংগীতের দর্শন হল জীবনবাদী— কিন্তু শোষণকারীর দর্শন হল জীবনবিমুখী। শোষণকারী সমাজের পুরোহিতরা প্রচার করে শ্মশানের বৈরাগ্য। তাদের গান হল:

গৌর মাঝি ডেকে যায়,
ভবপারে কে যাবি আয়।
কিংবা
হরি বল মন-রসনা,
মানবদেহার গৈরব কইর না।

কখনো-বা আদিবাসীর আদিরসাত্মক শস্যোৎসবের যৌথগীতিকে সামন্তীয় প্রভাবে ভক্তিরসে আপ্লুত কীর্তনীয়া ঢঙে তার চরিত্র হারাতে পর্যন্ত দেখা যায়।

সংগ্রাহককে শুধু নয়, লোকসংগীত গায়ককেও এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। শ্রেণীসংঘাতে শোষিত পক্ষভুক্তি বা partisanship থেকে আসবে তার কণ্ঠে আবেগ ও আবেদন। আবার তা থেকেই আসবে পরিবেশনের বেলায় নির্বাচন। শ্রমজীবনের জীবনবাদী স্বাক্ষর থাকা কিংবা সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়া গানগুলোই আমরা তুলে ধরব। জীবন-বৈরাগ্য প্রচার করা গান বর্জন করব— শুধু সংগ্রহশালায় তা তুলে রাখব বা তুলনামূলক আলোচনায় ব্যবহার করব।

বলা বাহুল্য উপরের এ সব কথাই, আজ যে সব লোকসংগীত শিল্পী এই মহানগরে এসে স্থায়ী বাসা বেঁধেছেন এবং যাঁরা তাঁদের ছাত্রছাত্রী-রূপী নবাগত বা নবাগতা তাঁদের অনেককে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে। তাঁদের অবজ্ঞা করার উপায় নেই। এই মহানগরীর একচেটিয়া গান-প্রচার-মাধ্যম রেডিও, রেকর্ড, চলচ্চিত্র— সবই এঁদের অধিকারে। গ্রামজীবন আজ সর্ববিষয়ে কলকাতা দ্বারা প্রভাবিত।

একদা পূর্ববঙ্গ থেকে যাঁরা সংগৃহীত গান খাতাবন্দী করে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের পুঁজিপাটা ফুরিয়ে এসেছে অনেকদিন। যে জীবনস্রোত তা পূরণ করবে সে স্রোতে সাঁতার কাটাবার প্রেরণা আর কারো নেই। লোকসংগীত এখন পুরোমাত্রায় commodity বা পণ্য— social value হারিয়েছে, আছে কেবল commercial value। এখন 'পপ্' গীতের ব্যবসায়িক বাজার— কাজেই 'ফোক্‌সঙ' 'পপ্‌সঙ' হলে যদি বেশি পয়সা আসে বা বিকৃত দর্শকের বাহবা পাওয়া যায় তবে তাকে তাই হতে হবে।

কিন্তু এই মহানগরীতে যাঁরা লোকসংগীত করে থাকেন তাঁরা সমাজের কোন্ শ্রেণীর? নবাগতদের কথা বলছি না, 'গুরুজী'দের কথা বলছি। আমরা অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের গ্রামের সুবিধাভোগী পরগাছা শ্রেণীর লোক। আমাদের ধমনীতে, শিরা-উপশিরায় শোষক শ্রেণীর নীলরক্ত প্রবাহিত। আমরা গতরে খেটে কেউ খেতাম না। তাই অবলীলাক্রমে লোকগীতিকে ব্যবসায়ের মূলধন করে নিতে পারি। আবার শহরে বসেই নিজেরা ঐতিহ্যবাহী গানের কথার হেরফের করে নিজেরাই রচয়িতা ও সুরকার হয়ে উঠতে পারছি। আমাদের গলায় যে folk-timbre প্রথমে ছিল তাও পরিমার্জিত হতে হতে একেবারে মসৃণ হয়ে এসেছে।

লোকসংগীত সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষ অধ্যয়ন বা ভাবনা চিন্তা করেন না। অন্যদিকে যাঁরা পণ্ডিত গবেষক ডক্টরেট, তাঁরা গানের সুর বোঝেন না, তা নিয়ে মাথাও ঘামান না। তাছাড়া তাঁদের অধিকাংশই এস্টাব্লিশমেন্টকে চটাতে চান না। ব্যবসায়িক বিকৃতির বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার হতে স্বভাবতই দ্বিধা বোধ করেন। এই সুযোগে সুরের রাজ্যে অসুরের উৎপাত ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে।

❑ 'এথনিক সংস্ অফ ইন্ডিয়া' (জানুয়ারি '৭৭)-এর স্যুভেনির থেকে পুনর্মুদ্রিত

গণসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত

অনেকেই 'গণসংগীত' ও 'লোকসংগীত' এই দুটি কথা গুলিয়ে ফেলেন। গণসংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ লোকসংগীতের ধারাটি গণসংগীতেরই অন্তর্গত, কিন্তু গণসংগীত মাত্রই লোকসংগীত নয়। গণসংগীত কথাটা অনেক বেশি ব্যাপক। স্বদেশী সংগীত বা দেশাত্মবোধক গীত বলতে আমরা যা বুঝি, তার সাথে ভাবে ও ভঙ্গিতে একটা পার্থক্য বুঝবার জন্যই গণগীতি বা গণসংগীত শব্দটার উৎপত্তি। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম স্বদেশ-চেতনা এবং পরাধীনতার বেদনাবোধে যে গীতের জন্ম, তাকে আমরা স্বদেশী সংগীত কিংবা দেশাত্মবোধক সংগীত বলে থাকি। সেই স্বদেশী সংগীতের একটা বড় অংশ ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল, অনেক সময় আবার জাতীয় চেতনা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের আদর্শে প্রভাবান্বিত ছিল। সে সব গান দেশাত্মবোধের আবেগ ও বেদনা থাকলেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের চেতনা ছিল না। দেশের মুক্তির সঙ্গে

শোষণমুক্তির চিন্তার মিলন ঘটেনি। শ্রমজীবী জনতাই দেশ, তাদের মুক্তি ছাড়া দেশের মুক্তি অর্থহীন, একথা সেদিনের গানে ব্যক্ত হয়নি। স্বদেশচেতনা যেখানে গণচেতনায় মিলিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার ভাবাদর্শের সাগরে মিশলো সেই মোহনাতেই গণসংগীতের জন্ম।

ভাবে বা বক্তব্যে এক হলেও, ভঙ্গিতে বা আঙ্গিকে গণসংগীতেও বিভিন্ন ধারা আছে। শ্রমজীবী জনতার ভাবপ্রকাশের প্রধান মাধ্যমটি লোকসংস্কৃতি। স্বভাবতই লোকসংগীতের প্রবহমান ধারা নতুন গণচেতনায় নতুন জীবনবোধে উজ্জীবিত হলো। এই বিষয়ে প্রথমে আলোচনা করেছি। গণসংগীত অন্যান্য আঙ্গিককে অবলম্বন করেও নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল প্রমুখ গীতিকারদের দেশাত্মবোধক ভঙ্গি অনুসরণ করে বহু সার্থক গণসংগীত রচিত হয়েছে। তাছাড়া পাশ্চাত্য বৃন্দগীতের বা স্বর-সঙ্গতির আঙ্গিকেও গণনাট্য আন্দোলন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় গণসংগীতকে সমৃদ্ধ করেছে। শ্রমিকদের হরতাল বা কৃষকের তেভাগা আন্দোলনের বিষয়বস্তু নিয়ে —

ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে, আলো ফুটছে, প্রাণ জাগছে —
লাখে লাখ করতালে হরতাল হেঁকেছে —
হরতাল—হরতাল—হরতাল—
আজ হরতাল, আজ চাক্কা বন্ধ
গুরু গুরু গুরু গুরু ডম্বরু পিনাকীর
বেজেছে বেজেছে বেজেছে
মরাবন্দরে আজ জোয়ার জাগানো ঢেউ
তরণী ভাসানো ঢেউ উঠছে...।

গানের মতো অনেক সার্থক বিপ্লবী গণগীত রচিত হয়েছে। এগুলির সুরের বিন্যাস আধুনিক সৃষ্টিশীল পরীক্ষামূলক। এসব গণসংগীত কোনো অবস্থাতেই লোকসংগীতের শ্রেণীতে পড়ে না (একজন বিশিষ্ট সংগীত সমালোচক এই গণসংগীতকে লোক-সংগীত বলে মারাত্মক ভুল করেছেন)।

লোকসংগীত সুরে ভঙ্গিতে ও বাক্যবিন্যাসে আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য সীমাবদ্ধ। শ্রমজীবী জনতার মধ্যে কোনো গান জনপ্রিয় হলেই তা লোকসংগীত হয়ে ওঠে না।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'লোকসংগীত সমীক্ষা' গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত

Warm Greetings
to
ANEEK and its Readers

A Well Wisher

Áîí‰: ï¸Ü°îÌû£Í ˜ñA ˜ÛN

ক্রোড়পত্র

úéÅîf ï¸Ü°îä

ঘটনাপ্রবাহ q কবিতা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] p [illegible]

ই - মেল : arunodaya1945@yahoo.co.in

POSTAL REGN. NO. : WB / BRS / RNP-105 / 2007-09 R.N.I REGN. NO. : 12026/65

ANEEK q 48TH YEAR : 7-8TH ISSUE q JANUARY-FEBRUARY 2012 q RUPEES FORTY ONLY

অনীক

মার্চ ২০১২ সংখ্যা

j¤ÉÚ‰¸ûßÎ

ú˜¸¸Ð‰ ï¸Ü°îä q újËþï‰äÍ¬ üÅê q äñ¢ð ¯Ò¢î£

প্রকাশিত হবে মার্চ-এর দ্বিতীয় সপ্তাহে

v পত্রিকা সংক্রান্ত ঘোষণা v

q অনীক প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

q সাধারণ সংখ্যার দাম ১৫ টাকা।

q গ্রাহক চাঁদার হার ১৫০ টাকা। যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

q গ্রাহক চাঁদা পাঠালেই গ্রাহক করে নেওয়া হয় এবং বুকপোস্টে পত্রিকা পাঠানো হয়।

q পিপলস বুক সোসাইটি-র প্রযত্নে মানি অর্ডারে/হাতে টাকা পাঠাতে পারেন। চেক হলে তা 'Aneek' নামে হবে।

q গ্রাহক চাঁদা নবীকরণের ক্ষেত্রে, চাঁদা সময়মতো পরিশোধ না করলে, চাঁদা শেষ হবার পরের সংখ্যা গ্রাহক চাঁদা (১৫০ টাকা) + ভিপি ডাক খরচ (২৫ টাকা) ধরে ভিপি-তে পাঠানো হয়।

অনীক : পুরোনো যে সব সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে

- ভারতে 'মাওবাদ' - ৫০
- বিশ্ব বামপন্থী আন্দোলন/পরিবেশ : অর্থনীতি রাজনীতি বিজ্ঞান/উন্নয়নের বামপন্থা/জাতপাত, মৌলবাদ ও ভারত — প্রতিটি ৪৫
- উন্নয়নের বামপন্থী ধারা ও পশ্চিমবঙ্গ — ৪০
- বিশ্বায়ন ও প্রতিরোধের বিশ্বময়তা/নেপালের বিপ্লবী আন্দোলন/জাতীয়তাবাদ ও মৌলবাদ — প্রতিটি ৩৬
- পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন কোন্ পথে?—প্রতিটি ৩০
- জন্মশতবর্ষে (জীবনানন্দ, নজরুল, তারাশংকর, আইজেনস্টাইন, ব্রেশ্‌ট, আব্বাসউদ্দিন)/গৈরিক ফ্যাসিবাদ/সিপিআইএম কোন্ পথে?/নন্দীগ্রাম গণহত্যা/নাগরিক সমাজ ও পশ্চিমবঙ্গ/বিশ্বায়ন/ইরাক যুদ্ধ/ভারত, ভালো আছো? (*ক্রোড়পত্র : পল সুইজি*)—২৫
- সিঙ্গুর:লড়াই চলছে/পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস (১+২)/আজকের নেপাল (১+২)— প্রতিটি ২০
- সাম্রাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদ/ ওয়ার্ল্ড সোস্যাল ফোরাম/ জল সমস্যা/আজকের চীন — প্রতিটি ১৫
- ভারতের অধিকার আন্দোলনের দিশা//ভারতের চীন-যুদ্ধ / অরণ্যের লড়াই/ আরব দুনিয়ায় ঝড় /পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ও বামপন্থা/ উচ্চশিক্ষার বানিজ্যিকরণ/সন্ত্রাস এখন/কেন সমাজতন্ত্র ?/ভাসানি প্রসঙ্গে/নয়াচর/ লালগড়ে সামরিক অভিযান/আদিবাসী অঞ্চলে পুঁজি/গোর্খাল্যান্ড /কেন আমরা পরমাণু চুক্তি-বিরোধী/খাদ্যসংকট/লালগড় আন্দোলন/শতবর্ষে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দে/অ্যামনেস্টির চোখে পশ্চিমবঙ্গে মানবিক অধিকার/ পারমাণবিক বিপর্যয়/পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা/ সাঁওতাল বিদ্রোহ ১৫০/ ভারতে আর্থিক উদারীকরণ/সিপিআই(এম)-এর মাও চর্চা— প্রতিটি ১০

â ডাকযোগে নিতে হলে পত্রিকার মোট দাম ও রেজিসট্রেশনের খরচ বাবদ ২০ টাকা অতিরিক্ত পাঠাতে হবে।

â হাতে নিতে হলে পিপল্‌স বুক সোসাইটিতে মোট দাম জমা দিয়ে এক সপ্তাহ পরে সেখান থেকেই পত্রিকা নিতে হবে

দীপংকর চক্রবর্তী (স্বত্বাধিকারী) কর্তৃক প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি, ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ, গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী